অ্যাড্‌ভেন্‌চ্যার
অম্‌নিবাস
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ADVENTURE OMNIBUS Vol.-1

[A collection of adventure stories for Juvenile readers]

Sri Dhirendralal Dhar

প্রকাশক

সাহিত্য বিহার

১বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পরিবেশক

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ ঝুলন পূর্ণিমা, ১৯৫৬

ছবি ঃ শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য, মানস ভট্টাচার্য ও শ্রীঅশোককুমার ধর

সাহিত্য বিহার-এর পক্ষে শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য এম. এ. কর্তৃক
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, থেকে
প্রকাশিত এবং রঘুনাথ প্রিন্টার্সের পক্ষে
শ্রীনিরঞ্জনকুমার ঘোষ কর্তৃক
১৫০/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

পঁচিশ টাকা

মৃত্যুর পশ্চাতে

—বুম্ বুম্ বুম্ !

সরোজ চমকে উঠলো। পিছনে তিনদিক থেকে তিনখানি ফাইটিং প্লেন থেকে মেশিন-গানের গর্জন তাকে চমকে দিলে। পাইলট প্লেনের গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিলে।

পিছনের প্লেন তিনখানিও বেশ বেগবান। তাদের গতিকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। তিনখানি প্লেন থেকেই মেশিন-গানের গুলি চলছে। একটি গুলি প্লেনের গায়ে ঠিক জায়গা-মাফিক্ লাগলেই দেড় হাজার ফুট উঁচু থেকে সরোজরা আছড়ে পড়বে মাটির উপর, তাদের অস্তিত্বও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাঁ-দিকের প্লেনখানি বোধ হয় একটু বেশী এগিয়ে আসছে। সরোজদের পাইলট ডানদিকে প্লেনের মুখ ফেরালো।

এমন অসুবিধায় সরোজ কখনও পড়েনি। দেশের স্বাধীনতার জন্য আজাদ-হিন্দ-ফৌজে সে যোগ দিয়েছিল। নেতাজী 'খুন' চেয়েছিলেন, ইম্ফল সীমান্তে খুন দিতেও সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নেতাজী তাকে ছাড়েননি। সহসা যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে দুটি এটম্ বোমা পড়তেই জাপান আত্মসমর্পণ করলো। নেতাজী জাপান যাওয়াই স্থির করলেন, তাদেরও জাপান যাবারই ব্যবস্থা হলো। যাবার পথে এই বিপত্তি। উন্মুক্ত আকাশে সাধারণ বিমান, মুখোমুখি শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার কোন উপায় নেই, দ্রুত পলায়ন করা ছাড়া আর কিছুই করা চলে না।

ঝড়ের মত প্লেন ছুটছে। পাইলট চেষ্টা করছে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দেবার জন্য। মেঘের উপর দিয়ে উড়ছে, নীচে নামছে, ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার আকাশে পেঁজা তুলার মত ফিকা মেঘ, কিছুতেই আর আত্মগোপন করা যাচ্ছে না। সরোজদের প্লেন ছুটছে প্রতি মিনিটে পাঁচ মাইল বেগে।

সহসা বাঁ-পাশের প্লেনখানি একেবারে মাথার উপর এসে পড়লো। আকাশে যে উপরে থাকে তারই সুবিধা। উপর থেকে শট্‌শট্ করে ছুটতে লাগলো

মেশিন-গানের গুলি। সেই গুলির ঝাঁককে পাশ কাটাবার জন্য সরোজদের প্লেন নেমে এল আরো নীচে, ছুটলো এঁকেবেঁকে এলোমেলো। কিন্তু সহসা কোথায় যেন কি একটা ভুল হয়ে গেল, শত্রুপক্ষের অব্যর্থ লক্ষ্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। পর পর তিনটি গুলি এসে লাগলো সরোজদের প্লেনের মেশিনের উপর। তৎক্ষণাৎ মেশিন বন্ধ হয়ে গেল, পরক্ষণেই মুখ নীচু করে প্লেনখানি পূর্ণবেগে নামতে সুরু করলো নীচের দিকে। তারপরেই দেখা গেল, মেশিনের একপাশে আগুন ধরে গেছে।

সরোজ 'সীটে'র সঙ্গে বেল্ট দিয়ে বাঁধা ছিল। ত্বরিত গতিতে সে চেষ্টা করলো বেল্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য। কিন্তু প্লেনখানি তখন কল-ছেঁড়া ঘুড়ির মত লট্‌পট্ করছে। কোনমতেই হাত-পা স্থির রাখা যায় না। সরোজ বেল্ট খুলতে খুলতে, মহাশূন্যের দেড় হাজার ফুট উচ্চতা কমে আসতে লাগলো। ঠিক যে মুহূর্তে সরোজ বেল্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে! সেই মুহূর্তে প্লেনখানি নীচে এসে আছড়ে পড়লো।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, তারপরেই জল আর জল। ক্ষণেকের জন্যে সরোজ শুধু বুঝতে পারলো যে সে পড়েছে জলে। তারপরেই সব অন্ধকার।

জ্ঞান হলে, চোখ মেলে সরোজ কম বিস্মিত হলো না। প্লেনের বসবার আসনের পাশে সে পড়ে আছে। জলে ভিজে জামা-কাপড় সপ্‌সপ্ করছে। কিন্তু প্লেনখানি ডোবেনি। প্লেনখানি সী-প্লেন, জলে ভাসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অতখানি উঁচু থেকে জলের উপর আছড়ে পড়ে যে ডোবেনি, সে নেহাৎ অদৃষ্ট বলতে হবে। তবে জলে না ডুবলেও ভিতরে জল ঢুকেছে প্রচুর।

সরোজ উঠে বসলো। জানালার কাচ দিয়ে বাইরের পানে তাকালো। সামনেই সমুদ্রের তট, নারিকেল গাছের সারি, নীচে ঘন জঙ্গল। ইস্! অল্পের জন্যে তারা রক্ষা পেয়েছে। একটু ওদিকে পড়লেই, তাদের অস্থি অবধি চূর্ণ হয়ে যেত!

কিছুক্ষণ সরোজ নারিকেল গাছের সারির পানে তাকিয়ে রইল. তারপর সহযাত্রী পাইলটের কথা তার মনে পড়লো। সরোজ উঠে গিয়ে কক্‌পিটের পানে তাকালো। জাপানী পাইলট, কক্‌পিটের সঙ্গে রবারের বেল্ট দিয়ে বাঁধা আছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। সরোজ এগিয়ে এসে তার কপালে হাত দিলে। নাঃ, মরেনি, অচেতন হয়ে পড়েছে। হাত বাড়ালেই সমুদ্রের জল, সরোজ জলে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে পাইলটের চোখে-মুখে দিলে। অল্পক্ষণ চেষ্টা করতেই, পাইলট চোখ মেলে চাইল। প্লেনখানি জলে পড়বার জন্য কারও কোন আঘাত লাগেনি।

সরোজ জানতো পাইলট জাপানী। কিন্তু লোকটি নিজের পরিচয় দিলো: ভারতীয় কৃশ্চান, দুপুরুষ রেঙ্গুনে তারা বাস করেছে, যুদ্ধের সময় বৃটিশ-বিমান-বাহিনীতে সে যোগ দিয়েছিল, তার নাম ডেভিড ফ্রিগার্ড।

প্লেনখানি অগভীর জলে আটকে পড়েছিল। কথা উঠলো, তীরে গিয়ে উঠতে হবে। ডেভিড বললো—সী-প্লেন, জলে ভাসার ব্যবস্থা আছে।

কক্‌পিটের পাশ থেকে ভাঁজ করা ছোট একখানি রবার-বোট সে বের করলো। বোটে বাতাস ভরে দেখা গেল, দু'জন যাত্রীর কোন রকমে তাতে স্থান হতে পারে। দু'জনে সেই বোটে ভেসে পড়লো।

সমুদ্রের চরায় খানকয়েক নৌকা বাঁধা ছিল। সেই নৌকাগুলিকে পাশ কাটিয়ে তারা বোট ভেড়ালো। সামনেই নারিকেল গাছের সারি, মাঝ দিয়ে একটি পায়ে-চলা পথ চলে গেছে। বোট ছেড়ে সবেমাত্র পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল। শুকনো পাতার উপর দিয়ে কারা যেন চলেছে। দু'জনেই সতর্ক হলো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তুললো, দাঁড়িয়ে পড়লো থম্‌কে।

আবার খস্‌ খস্‌ শব্দ। এবার সরোজের চোখে পড়লো, কয়েকটি নারিকেল গাছের আড়ালে একজন লোক হাতে একটি বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোন জামা-কাপড় নেই, মাথায় একটি পাখীর শাদা পালক বাঁধা আছে। সরোজদের পানে সে ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করে তাকিয়ে ছিল। সরোজ দেখতে পেয়েছে দেখেই সে তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে সরে গেল।

সরোজ বললো—এগিয়ে যাওয়া তো সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এরা প্রথমেই যে রকম শত্রুভাবে দেখতে সুরু করেছে।

ডেভিড বললো—ফিরে যাওয়াই ভাল বলে মনে হয়।

দু'জনে তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে সরে এল। নৌকায় উঠে বসতে যাবে, সেই সময় শট্‌ শট্‌ করে দুটি বল্লম তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সৈনিকের সহজাত অভ্যাসবশতঃ দু'জনেই কোমর-বন্ধে বাঁধা পিস্তলের খাপের উপর হাত দিলে। কিন্তু পিছনে নারিকেল-বীথির আড়ালে একজনকেও দেখা গেল না।

দু'জনে আবার রবারের নৌকায় উঠে বসলো। ছোট ছোট চারখানি দাঁড় ছিল, বাইতে শুরু করলো।

কয়েক গজ মাত্র গেছে, এমন সময় এক ঝাঁক বল্লম,—একেবারে পাঁচ সাতটা। সরোজ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, হাতের দাঁড় দিয়ে একটি বল্লমকে সে ফিরিয়ে দিল, নাহলে সেটি তার বাহুতে এসে বিঁধতো। অন্য বল্লমগুলি তেমন অব্যর্থ নয়, আশে-পাশে জলে গিয়ে পড়লো। ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় টেনে নৌকাখানিকে তারা একটু দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

এবার নারিকেল-বীথির আড়াল থেকে কয়েকজন লোক বেরুলো। এদের জংলী বলাই ভালো। তামাটে গায়ের রং, কোমরে গাছের পাতার মত কি একটা পরণে, বাকী সারা দেহ নগ্ন। মাথার উপর একটা সাদা পাখীর পালক, হাতে বল্লম। তীরে একটা খাঁজের আড়াল থেকে কয়েকখানি নৌকা তারা জলে ভাসিয়ে দিল, তারপর তেড়ে এলো সরোজদের দিকে। সরোজ ও ডেভিড দু'জনেই এবার বিপদ গণলো।

সরোজ বললো—ওরা সহজে আমাদের নিষ্কৃতি দেবে না দেখছি।

ডেভিড বললো—লড়তে গেলে আত্মরক্ষার জন্য একটা আড়াল চাই। ওই প্লেনখানির পিছন দিকে চল।।

প্লেনখানি অগভীর জলে আটকে পড়েছিল। রবার বোটখানি দুজনে নিয়ে গেল প্লেনের পিছনে। এবার আত্মরক্ষার সুবিধা হলো। কিন্তু জংলীগুলিও তখন তাড়াতাড়ি নৌকা করে ছুটে আসছে। সরোজদের মতলব বোধ হয় তারা বুঝতে পেরেছিল। এক ঝাঁক বল্লম তারা ছুঁড়ে মারলো এদের দিকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তারা প্লেনের আড়ালে গিয়ে পড়েছে, প্লেনের গায়ে কয়েকটি বল্লম লেগে ঠন্ ঠন্ করে শব্দ তুললো শুধু।

প্লেনের গায়ে নৌকাখানি লাগিয়ে সরোজ ও ডেভিড এবার কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল বের করলো। কোল্টের পিস্তল, একসঙ্গে সাতটি গুলি চলে। তারা পিস্তল 'রেডি' করলো, তারপরেই চললো গুলি।

একখানি নৌকা একেবারে দশ-পনেরো হাতের মধ্যে এসে পড়েছিল। দু'টি জংলী তাতে বসেছিল। দু'জনে চীৎকার করে ঘুরে জলে পড়ে গেল। পিছনে আর যারা আসছিল তারা এবার থমকে দাঁড়ালো।

জংলীদের আরো কয়েকখানি নৌকা এগিয়ে আসছিল, সেগুলি এবার পিছিয়ে গেল, সব ক'খানি নৌকা একত্র হয়ে কি যেন তারা বলাবলি করলো। তারপর সকলে ফিরে গেল তীরের দিকে।

সরোজ বললো—যাক্, গুলিতে তাহলে কাজ হয়েছে।

ডেভিড বললো—উপস্থিত করণীয়, প্লেনের মধ্যে যে দু'টিন বিস্কুট আছে সেইটে নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়া।

সরোজ উড়ো-জাহাজের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। দু'টিন বিস্কুট ছাড়া গ্রহণীয় আর কিছুই ছিল না। দু'টিন বিস্কুট মাত্র সম্বল করে দু'জনে ভেসে পড়লো অনন্ত সমুদ্রে।

ডেভিড বললো—একেবারে মাঝ্‌দরিয়ায় ভেসে পড়া ঠিক হবে না। শেষে দিশাহারা হয়ে অনাহারে মারা পড়বো। ডাঙ্গার দিকে নজর রেখে চলাই ভালো।

সরোজ হেসে বললো—যদি ওটা একটা দ্বীপ হয়, তাহলে তো ওরই চারিপাশে ঘুরে বেড়াবো, এগিয়ে যাওয়া হবে না।

ডেভিড বললো—তাহলে এক কাজ করা যাক। চীনদেশের পূর্বে সমুদ্র, আমরা চীনদেশ পার হয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছি, আমরা যদি এই দ্বীপটিকে পাশ কাটিয়ে বরাবর পশ্চিমদিকে যাই তাহলে চীনদেশে গিয়ে পৌঁছাব।

—কিন্তু চীনদেশ এখান থেকে কতদূর তাতো জানা নেই—সরোজ বললো—এইভাবে দাঁড় টেনে কত দিনে গিয়ে পৌঁছাব—শেষ অবধি পৌঁছাব কি না তাই বা কে জানে।

কিন্তু ওই ছাড়া তখন অন্য পথ নেই। দ্বীপটিকে পাশ কাটাবার জন্য দু'জনে দাঁড় বাইতে সুরু করলো।

একপাশে নীল জলরাশি, প্রাণের স্পন্দনে দোল খাচ্ছে। আরেক পাশে নারিকেল বীথির শ্যামলিমা দিগ্বলয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁছেচে। মাথার উপর সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ। সমুদ্রের জলরাশির ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাওয়া ছাড়া কোথাও আর প্রাণের স্পন্দন নেই। একখানি রবারের নৌকায় দুটি মাত্র মানুষ জীবনের সাড়া তুলে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে এগিয়ে চলেছে।

আধঘণ্টা পুরোদমে দাঁড় টানার পর দেখা গেল সাগর তটে এক জায়গায় নারিকেল গাছের সারি আর নেই, আলোক-স্তম্ভের মত একটা গম্বুজ আছে মাথা উঁচু করে। সরোজ বললো—দেখ তো ওটা কি? লাইট-হাউস না কি?

ডেভিড বললো লাইট-হাউস হলে তো আরও উঁচু হতো। পিছনে তো একটা কেল্লার মত দেখছি, ওটা বোধ হয় পর্যবেক্ষণ-তোরণ। যারা আমাদের আক্রমণ করেছিল, ওটা তাদের একটা কেল্লাও হতে পারে।

সরোজ বললো—কাছাকাছি গেলেই তো বোঝা যায়, সামনে আর জঙ্গল নেই যে কেউ লুকিয়ে থাকবে।

দু'জনে তীরের দিকে দাঁড় বাইতে সুরু করলো।

তীরের কাছাকাছি যখন এসেছে, তখন গম্বুজের ছাদে একটি লোককে দেখা গেল ঃ পরণে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, মাথায় কান-চাপা টুপি—হিন্দু ব্রহ্মচারীর মত। প্রথম নজরেই মনে হয় যে তিনি বেশ সভ্যভব্য ধার্মিক লোক। ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ তাদের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথার উপর হাত তুলে তাদের থামতে ইশারা করে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—নৌকা তীরে ভেড়ান। নেমে আসুন, ভয় নেই।

সরোজ বললো— ওরা বন্ধুভাবেই ডাকছে। চলো, তীরে নৌকা লাগাই।

গম্বুজের নীচে এসে নৌকা লাগলো। গম্বুজের একটি দরজা ছিল সমুদ্রের দিকে, সেই দরজা খুলে ব্রহ্মচারী জলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে কয়েক জন লোক, তবে তাদের কারও হাতেই ঢাল বা বল্লম নেই।

সরোজ ও ডেভিড নৌকা থেকে নেমে, টিউব খুলে নৌকার হাওয়াটুকু বের করে দিয়ে রবারের নৌকাখানিকে পাট করে তুলে ফেললো। দাঁড় দু'খানিও তার মধ্যে মুড়ে নিল।

ব্রহ্মচারী সরোজের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখছিলেন, এবার ইংরাজীতে বললেন—আপনাদের দেখে মনে হয়, আপনারা ভারতীয়।

সরোজ বললো—আমি বাঙালী, আর ইনি ভারতীয় কৃশ্চান।

ব্রহ্মচারী বললেন—আমিও ভারতীয়, ভালই হলো। আপনারা এখানে এলেন কি করে?

—প্লেন দুর্ঘটনা।

—একটু আগে একখানি প্লেনকে আমরা সমুদ্রে পড়তে দেখলাম বটে। সে তাহলে আপনাদেরই প্লেন? তা প্লেনে কি আপনারা দু'জনেই ছিলেন মাত্র?

সরোজ বললো—হ্যাঁ।

—আপনারা তো সৈনিক দেখছি; যুদ্ধের খবর কি ?

—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

—কে জিতলো ?

—রাশিয়া, ইংরাজ ও আমেরিকা।

—হিটলার হেরে গেছে ?

—রুশ সৈন্য বার্লিনের অর্ধেক দখল করেছে, হিটলারকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন।

—হিটলার আত্মহত্যা করেছেন ! আর মুসোলিনী ?

—মুসোলিনী অনেক আগেই নিহত হয়েছেন।

—জাপান কি করলো ?

—আমেরিকা জাপানের দুটি সহর—নাগাসাকি ও হিরোসিমা এটম্ বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। জাপান ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

—আশ্চর্য ! আমরা যা ভাবতেও পারিনি, তাই ঘটে গেল ? নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর অবস্থা কি ? তিনি আসাম অঞ্চল কি জয় করতে পেরেছেন ?

—না। জাপানীরা তাঁকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করেনি, সেইজন্য তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন।

—আমাদের দুর্ভাগ্য ! এত চেষ্টা ব্যর্থ হলো, আমার দেশ স্বাধীন হতে পারলো না।

ব্রহ্মচারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয় পড়লেন। তারপর সরোজ ও ডেভিড সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাঁর চমক ভাঙলো। বললেন—চলুন, চলুন, ভেতরে চলুন।

ভিতরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাটির প্রাচীর। মাঝে কয়েকখানি বড় বড় পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। একখানি প্রশস্ত ঘরে ব্রহ্মচারী তাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন, বললেন—আমি এখানকার রবিন্সন ক্রুসো, এই আমার বাড়ী।

—আপনি এখানে একা আছেন বুঝি ?

—না আমরা দু'জন আছি। আর সঙ্গে আছে কয়েকজন কোরিয়ান।

—ভারতবর্ষ থেকে আপনারা এখানে এসে উঠলেন কি করে ?

—সে অনেক কথা। এম. এস-সিতে ফার্ষ্ট হয়ে বয়ন-শিল্প শেখার জন্য জাপান যাবার জোগাড় করছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। বাবার অনেক সম্পত্তি ছিল, সে সব পাবার জন্য জ্ঞাতি-শত্রু আমার পিছনে গুণ্ডা লাগালো। দু'একজন জানা-চেনা লোক আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, তখন খেয়াল করিনি। শেষে একদিন শীতের রাত্রে সার্কাস দেখে ফিরছি, রাত তখন বারোটা হবে, এমন সময় হঠাৎ দু'টি গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করলো। হাতে তাদের বড় বড় ভোজালি, আর একটু হলেই মেরে দিয়েছিল আর কি ! তাদের

ছুটে আসার শব্দ পেয়ে পিছু ফিরেই দেখি একেবারেই আবার পিঠের ওপর দু'খানি ভোজালি পড়ে আর কি, যুযুৎসুর প্যাঁচ জানা ছিল, তাই রক্ষা।...যাক্, তারপরেই কলকাতায় থাকা আর ঠিক হবে না বুঝে শিক্ষা শেষ করার জন্য জাপানে গেলাম। সেখানে আর্যধর্ম প্রচারক ভাই পরমানন্দের সঙ্গে দেখা হলো। অদ্ভুত মানুষ, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে হিন্দুধর্ম প্রচার করার কথা তিনি বললেন। কি ছিল তাঁর কথার মধ্যে কে জানে, চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। মন অস্থির হয়ে পড়লো, ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দ্বীপে। তারপর তিনি তো ভারতে ফিরে গেলেন। বিপ্লবী বলে তাঁর উপর কারাদণ্ডের আদেশ হলো। সেই খবর পড়ে আমার যেন জেদ চেপে গেল, পণ করলাম ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচার করেই জীবন কাটাব। তখন আমি ছিলাম কোরিয়ায়, সেখানে তখন জাপানীদের শোষণ চরমে গিয়ে পৌঁছেচে। কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী পুলিশের উৎপীড়নে উত্যক্ত হয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইল। সাংহাই থেকে জাপান অবধি চীন সাগরে অবজ্ঞাত যে দ্বীপগুলি আছে, সেইগুলিকেই আমার কর্মকেন্দ্র করবে বলে স্থির করলাম। এই দ্বীপের কাছাকাছি এসে টাইফুনে স্টীমার জখম হলো, আমরা বাধ্য হয়ে এই দ্বীপেই রয়ে গেলাম। এখানে জংলীদের বড় উৎপাত, তাই কাদা-মাটি দিয়ে এই গড় তৈরী করেছি। এদের কাছে ধর্ম প্রচার করার কোন সুবিধা হয়নি, এরা আমার কথা শুনবে কি, আমাকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে পারলে খুসি হয়। এ পথে জাহাজও দেখা যায় না যে ফিরে যাব। কয়েকটা বছর এখানে চুপ করে বসে আছি। কুড়ি জন ছিলাম, ইতিমধ্যে সাত জন জ্বরে ভুগে মারা গেছে।

সরোজ বললে—ভাই পরমানন্দের নাম শুনেছি, কিছু দিন আগে তিনি মারা গেছেন।

ব্রহ্মচারী বললেন—জানি।

ইতিমধ্যে বছর ষোলর একটি ছেলে ছুটে এলো। সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—বিনয়দা, এরাই বুঝি এরোপ্লেনে এসেছেন?

বিনয়বাবু বললেন—এরোপ্লেনে উড়ে আসেননি, প্লেন ভেঙ্গে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন।

বালকটি বললো—ওঃ, তাহলে এঁরাও আর ফিরতে পারবেন না।

ছেলেটি হতাশ ভাবে সকলের মুখের পানে তাকালো।

বিনয়বাবু ছেলেটির পরিচয় দিলেন—এটি আমার বন্ধুপুত্র। কোরিয়ার বিপ্লবে এর বাবা জাপানী মিলিটারীর গুলিতে খুন হয়, আমি একে নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে ভারতে ফিরে যাবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, এর বাবা আদর করে এর নাম রেখেছিলেন সান ইয়াৎ, আমরা সংক্ষেপে ডাকি 'সনি' বলে।

—ওর মা?

—সানি ছেলেবেলাতেই মাতৃহীন। বাপ ছাড়া এই দুনিয়ায় ওর আর কেউ ছিল না।

ডেভিড বললো—এই ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বাপ এসেছিল কোরিয়ায় বিপ্লব করতে, ছেলের কথা একটু ভাবেনি ?

—বিপ্লবী হয়ে তো সে আসেনি, এসেছিল সাংবাদিক হয়ে। কিন্তু অত্যাচার সে দেখতে পারেনি, প্রতিবাদ করেছিল, সেইজন্য অত্যাচারীর গুলিতে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে। মানবতার যাঁরা পূজা করেন, তাঁরা চিরদিনই অমানুষের হাতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন—সক্রেটিস, যীশু ও আব্রাহাম লিঙ্কনের উদাহরণ তো আমরা জানি, মহাত্মা গান্ধীর সারা জীবনটা কি ? এই দুনিয়াটা কারও নয়, কেউ এখানে বেশী দিন থাকতে আসেনি, কিন্তু সেই অল্প কয়েকটা বছরের জন্য প্রতিবেশীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি না—আমার সুখ আমার ভোগ বিলাসই সব, আর কারও কিছু নয়,—এই সভ্যতার আমরা গর্ব করি, এর মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায় ?

সহসা বিনয়বাবু থামলেন, বললেন—ধর্মপ্রচারের অভ্যাস থেকে আমার কথা বলার ধরণটাই বক্তৃতার মত হয়ে গেছে, মাপ করবেন। অনেক বেলা হয়েছে, আপনাদের এখনও কিছু খাওয়া হয়নি, এখন বক্তৃতা শোনার সময় নয়। আপনারা খানিক আরাম করুন, আমি ততক্ষণ আপনাদের আহার্যের আয়োজন দেখে আসি।

ব্রহ্মচারী সানিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সরোজ বললো—এমন স্থানে একজন ভারতীয়ের দেখা পাব—এ একেবারে অভাবিত ব্যাপার।

—ভালোই হলো, কতদিন এখানে থাকতে হবে, কিছু ঠিক নেই তো !

স্থানটি সত্যই মনোরম। গম্বুজটির ছাদে উঠে চারিপাশে তাকাতে ভাল লাগে। সামনে দিগন্ত বিস্তারী চঞ্চল সমুদ্র আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। পিছনে নারিকেল বীথির ঘন সন্নিবেশ পার হয়ে একটি টিলা চোখে পড়ে। এখানকার আদিম অধিবাসীদের কোন বাড়ী-ঘর চোখে পড়ে না, মানুষগুলিকেও দেখা যায় না। ওদের ভয় না থাকলে, এখানে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে। অপরাহ্নের সূর্য যখন সমুদ্রের কোলে ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকে, সাগরের নীলিমায় রঙের ছোপ ধরে—রঙ বদলায়, নীল, ফিকে শাদা ও লাল জল পরস্পরের গা ঘেঁসে দোল খায় দিগন্ত অবধি। আকাশেও সেই রঙের ছোঁয়া লাগে,—সোনালী-রুপালী এসে মেশে লালের সঙ্গে।

গম্বুজের ছাদে সরোজ আনমনে তাকিয়ে থাকে, বিমুগ্ধ হয়ে যায়। ডেভিড, বিনয়বাবু ও সানি কাছে বসে আছে, কিন্তু কথা তখন যেন অর্থহীন হয়ে যায়। সরোজ জীবনে কখনও এমনভাবে প্রকৃতির শোভা দেখেনি। সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যার আবছায়া সেই অপরূপ দৃশ্যের উপর অন্ধকারের আস্তরণ টেনে দেয়, সুশ্রী মুখের উপর নববধূ যেন ধীরে ধীরে ঘোমটা টানে। সরোজের

মনে সহসা রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন ভেসে ওঠে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে'। এই পংক্তিটি এখন তার কাছে ভারী মিষ্টি বলে মনে হয়, এর পরের লাইনগুলি আরো মধুর, কিন্তু তা তার জানা নেই। মনে মনে স্থির করে, এখান থেকে যখন ফিরে যাবে সবার আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ভালো করে পড়বে। খুঁজে বের করবে এই পংক্তিটি—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে, বিনয়বাবু বললেন—চলো, এবার নীচে যাই।

সরোজ বলে ওঠে—চমৎকার!

বিনয়বাবু বলেন—চমৎকার বলেই তো এখানে এতো দিন থাকতে পেরেছি। এই প্রাকৃতিক সুষমার উপর আমার কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। এখানকার মানুষগুলো যদি একটু ভদ্র হতো, তাহলে এখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

রাত্রে সহসা সরোজের ঘুম ভেঙে গেল।

খড়ের বিছানায় বেশ ঘুমুচ্ছিল, সহসা চমকে উঠলো। মনে হলো তার মুখের উপর জলে-ভিজানো গামছা দিয়ে 'ছপ' করে কে যেন মারলো। সরোজ তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। জানালা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। সেই আলোয় দেখে ডেভিড পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে আর তার মাথার কাছে একটা মানুষের মুণ্ড পড়ে আছে। সদ্য কাটা মুণ্ড, গলায় রক্ত তখনও টলটল করছে।

সরোজ স্থানুর মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মুণ্ডটির পানে। এমন অবস্থায় একটি কাটা মুণ্ড জীবনে সে কখনও দেখেনি। কয়েকটা মুহূর্ত তার চিন্তা-শক্তি স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। তারপর সরোজের মন সজাগ হলো। মনে পড়লো যে এই মুণ্ডটাই তো তার গায়ের উপর এসে পড়েছিল। নিজের পানে সে তাকালো—বুকের জামাটা রক্তময় হয়ে গেছে, মুখের উপর হাত বুলালো, মুখের উপর রক্তের সব ছিটা লেগেছিল, সেই রক্ত হাতে লাগলো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সরোজ মুখ মুছলো। তারপর ডেভিডের গায়ে ধাক্কা দিলে, ডাকলো—ডেভিড! ডেভিড!

ডেভিড চোখ চাইল।

—শীগগির ওঠো, ভীষণ ব্যাপার!

—কি হয়েছে?—ডেভিড ধড়মড় করে উঠে বসলো।

কাটা মুণ্ডটিকে দেখিয়ে সরোজ বললো—ঘুমুচ্ছিলাম, এই মুণ্ডটি কে আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরে গেছে।

মুণ্ডটির পানে তাকিয়ে ডেভিড স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে যেন কথা খুঁজে পেলে, বললো—গুরুতর ব্যাপার, বিনয়বাবুকে এখনই একবার ডাকা দরকার।

দরজায় ঝাঁপ বন্ধ করা ছিল, ঝাঁপটা খুলে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

পাশেই বিনয়বাবুর ঘর। বিনয়বাবুকে ডেকে তুলতে দেরী হলো না। বাহিরে এসে চাঁদের আলোয় সরোজের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত দেখে বিনয়বাবুও হতবাক্ হয়ে গেলেন। সরোজ তাঁকে ডেকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। কাটা মুণ্ডটি দেখে বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, বললেন—ও যে আলমার!

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—আলমার কে?

—আমার একজন সহকর্মী। ব্যাপারটা কি বলত?

সরোজ অল্প কথায় বিনয়বাবুকে ব্যাপারটা বললো। শুনে বিনয়বাবুর মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, বললেন—তাই তো, ভাবনার কথা! আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর আলমার বেরিয়েছিল কয়েকটা ডাব পাড়ার জন্য। বারণ করলাম, শুনলো না। এখনও ফিরলো না দেখে আমি বসে বসে ভাবছি। এদিকে আমার লোকজনদের ফাঁকি দিয়ে আলমারের কাটা মুণ্ড ঘরের মধ্যে আপনাকে ছুঁড়ে মেরে গেল। এমন দুর্ঘটনা তো কখনও হয়নি। আমাদের বন্দুককে ওরা রীতিমত ভয় করে। কিন্তু এখন তো আর নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।

বিনয়বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই একজন কোরিয়ান ঘরের মধ্যে এলো, ভাঙা ভাঙা ইংরাজী ও দেশী ভাষা মিলিয়ে কয়েকটি কথা বললো, বিনয়বাবু তার উত্তরে কি বললেন, তারপর সরোজদের পানে ফিরে বললেন—আরেক দুঃসংবাদ, সনিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ক'জন কোরিয়ান বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সকলে মিলে তন্ন তন্ন করে পাঁচিল-ঘেরা গৃহটি খুঁজে দেখলো। ছাদ থেকে উঠান পর্যন্ত কিছুই বাদ রাখলো না, কিন্তু সনি কোথাও নেই।

বিনয়বাবু বললেন,—ওরা নিশ্চয় পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল, সুবিধা পেয়ে সনিকে তুলে নিয়ে গেছে। আলমারের কাটা মুণ্ডটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে ঘরের মধ্যে। সন্তর্পণে কাজ সেরেছে, আমরা টের পাইনি। কিন্তু সনি সম্পর্কে এখন কি করা যায়, বড়ই চিন্তার কারণ হলো দেখছি!

সকলে ছাদে গিয়ে উঠলো, কাছাকাছি কোথাও শত্রুরা আছে কিনা দেখার জন্য।

কিন্তু গম্বুজের উপর থেকে সবটুকু তো দেখা যায় না, যদি ঠিক পিছনে পাঁচিলের আড়ালেই কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে বাইরে না গেলে জানা যাবে না। যেটুকু দেখা যায় সেখানে জনমানবের চিহ্ন নেই। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ বনানী থম্ থম্ করেছে। ডেভিড বললো—চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে একবার খুঁজে দেখি, তারা এখনও বেশী দূর যেতে পারেনি।

বিনয়বাবু বললেন—এই রাত্রে বাইরে বেরুলে আমরা আর কেউই ফিরে

আসবো না, অন্ধকারে তিনটে বল্লম এসে আমাদের তিন-জনকে শেষ করে দেবে।

গম্বুজের উপর তিনজনে আনমনে চিন্তা করছে, সহসা তাদের সচকিত করে একটি বল্লম এসে পড়লো একেবারে তাদের পায়ের গোড়ায়। বল্লমটির মাথায় একটি সাদা ফুলের মালা-জড়ানো। যেদিক থেকে বল্লমটি এসেছিল, ডেভিড সেইদিকে গুলি ছুঁড়তে গেল, বিনয়বাবু নিষেধ করলেন, বললেন—মিছামিছি গুলি নষ্ট করবেন না, অন্ধকারে কাউকেই লাগবে না। এই বল্লমটি ওরা ছুঁড়েছে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ওই শাদা ফুলের মালাটি তাই বল্লমের সঙ্গে জড়ানো আছে। ওই বল্লমটি আমরা বাইরে ছুঁড়ে ওদের ফিরিয়ে দিলে ওদের একজন দূত আসবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে বল্লমটি তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর সকলে ছাদ থেকে নেমে এলেন নীচে।

গম্বুজের নীচেই বাইরে যাবার ফটক। কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী, ভারী মজবুত। একটি লোক যাতায়াত করতে পারে এমন একটি অংশ তার খোলা যায়। বিনয়বাবু সেইটুকু খুলে দাঁড়ালেন, সরোজ ও ডেভিড পাশে দাঁড়িয়ে রইল পিস্তল হাতে নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরে একটি লোক সেই শাদা ফুলের মালা জড়ানো বল্লমটি হাতে নিয়ে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মাথাতেও একটি কাপড়ের পটিতে কয়েকটি শাদা পালক বাঁধা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে বিনয়বাবুকে কি কয়েকটা কথা বললো, বিনয়বাবু তার উত্তর দিলেন।

তারপর একজন কোরিয়ানকে ডেকে বিনয়বাবু কি বললেন, কোরিয়ান এগিয়ে এসে জংলী দূতের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। কোরিয়ানের সঙ্গে জংলীর অনেক কথা হলো। কোরিয়ান সেই কথা বিনয়বাবুকে বললো, বিনয়বাবু তার উত্তর দিলেন। উত্তর শুনে জংলী দূত বল্লম তুলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

সরোজ জংলীটির পানে ভাল করে একবার তাকিয়ে নিল, বেঁটে চেহারা, কিন্তু দেহের প্রতিটি পেশী স্পষ্ট ও কঠিন। বন্দুক না থাকলে এ রকম একজন জোয়ানের সঙ্গে দেহের শক্তিতে তারা তিনজনেও পেরে উঠবে কিনা বলা কঠিন।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বিনয়বাবু সরোজদের বললেন—লোকটি বলতে এসেছিল যে, সানিকে ওরা বন্দী করেছে। ওদের সর্ত না শুনলে সানিকে ওরা খুন করবে। আর সুবিধা পেলেই আমাদের ধরে পুড়িয়ে মারবে। তবে যে দুটি 'উড়ুক্কু দুশমন' সেদিন আকাশ থেকে নেমে এসে আগুন ছুঁড়ে ওদের দু'জনকে মেরেছে, এখন তারা আমার কাছে আছে। তাদেরকে যদি ওদের কাছে ফিরিয়ে দিই, তাহলে ওদের সর্দার সানিকে ছেড়ে দেবে আর লোকজন সুদ্ধ আমায় ছেড়ে যেতে হবে ওদের রাজ্যের সীমানার বাইরে। ওদের লোক আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগবে না। না

হলে ওরা এই পাঁচিলের বাইরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবে, আমাদের প্রত্যেকটি লোককে না মেরে নড়বে না। আর ওদের সর্দারের শক্তির পরিচয় একটু আগেই তো আমরা পেয়েছি। একজন সঙ্গীর মুণ্ড কেটে আমার এমন সুরক্ষিত বাড়ীর মধ্যে এসে 'উড়ুক্কু শয়তান' দুটোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। অমনি ধারা আমাদের সকলের মাথা নিয়ে ওদের সর্দার খেলা করবে, যদি আমরা তার কথা না শুনি।

সরোজ বললো—আপনি কি উত্তর দিলেন?

বিনয়বাবু বললেন—আমি তাদের কাছ থেকে তিন দিন সময় নিয়েছি। চতুর্থ দিনে তাদের লোক এসে জেনে যাবে আমার মতামত।

সরোজ বললো—তিন দিন পরে কি বলবেন?

—কি বলবো সে কথা পরে—বিনয়বাবু বললেন—এই তিন দিন ওরা চুপ করে বসে থাকবে। তিন দিনের মধ্যে যে ভাবেই হোক সনিকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। একটা ফন্দী ঠিক করে ফেলতে হবে।

—ফন্দী ফিকির যদি ব্যর্থ হয়?

—তাহলে সনিকে বাঁচানো যাবে না, ওদের সঙ্গে লড়তে হবে।

—আপনারা এই বারো-তেরোজন লোক ওদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝতে পারবেন? আর আমাদের দু'জনের জন্য আপনারা এতগুলি লোক জীবন বিপন্ন করবেন কেন? বরং আমরা দু'জন ওদের কাছে গিয়ে ধরা দিই, তাহলে আপনারা রক্ষা পাবেন, সনিও বাঁচবে। আমরা সৈনিক, আমরা তো যুদ্ধ করে মরার জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম, না হয় এদের হাতেই মরবো।

- তা হয় না, হতে পারে না। বিদেশে মরণের মুখে নিজের দেশের লোককে এগিয়ে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে চাই না, ভারতীয় মাত্রই এই নীতিকে ঘৃণা করে। আমাদের শিবি রাজা একটা পায়রা বাঁচাতে গিয়ে আত্মদান করেছিলেন, সেই দেশের মানুষ আমিও। যাক্ ওসব কথা, এখন কি করে সনিকে উদ্ধার করা যায় তারই একটি ফিকির বের করুন দেখি?

বিনয়বাবু, সরোজ ও ডেভিড উঠানের মাঝে চাঁদের আলোয় বসে মতলব ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আলোচনা চললো অনেকক্ষণ। শেষে তিন জনে মনও স্থির করে ফেললো—আজ রাত্রেই তারা সনিকে উদ্ধার করবে—এখনই।

রাত দুপুর। নিস্তব্ধ নিঝুম। উচ্ছল সমুদ্রের বেলাভূমির উপর আছড়ে পড়ার উচ্ছ্বাস, আর নারিকেল বীথির পাতায় বাতাসের শির্ শির্ দীর্ঘশ্বাস, আর কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝিঁঝিঁ পোকার পরিচিত শব্দও এখানে শোনা যায় না। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো চারিপাশ রহস্যময় করেছে। সে সুষমায় মাধুর্য আছে কিন্তু নিঃসঙ্গতাও বড় কম নেই। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট বনানীর পানে তাকিয়ে মনে হয়—বড় একা। ঘরের বাইরে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

সেই নিঝুম রাত্রির স্তব্ধতায় নিঃশব্দে একান্ত সন্তর্পণে বিনয়বাবু, সরোজ ও

ডেভিড পিস্তল হাতে নিয়ে পাঁচিলের বাইরে এসে দাঁড়ালো। তাদের অনুসরণ করলো দশজন কোরয়ান, দু'জন পিছনে রইল— ফটক পাহারা দেবার জন্য।

কোন কথা নেই, পায়ের শব্দ অবধি শোনা যায় না, যেন জীবন্ত কয়েকটি ছায়া শুধু এগিয়ে চলে।

খানিকটা ফাঁকা জমি, তারপর দীর্ঘ ঘাস ও আগাছার জংগল। কোমর অবধি উঁচু ঘাস, এবং ইতস্ততঃ দীর্ঘ নারিকেল গাছ। নিঃশব্দে আর এগিয়ে যাওয়া চলে না, ঘাসের জংগলে সর্ সর্ খস্ খস্ সাড়া জাগে। তবে নারিকেল গাছের ছায়ার নীচে চাঁদের আলোয় আলো-ছায়ার খেলা এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, খুব ভালো করে ঠাহর করলেও সেখানে যে কেউ আছে তা বোঝা যায় না

সেই জংগলের মাঝে বেশ একটু প্রশস্ত জায়গায় একটি নারিকেল কুঞ্জের নীচে আগুন জ্বলছে, কয়েকটা জংলী বসে আছে সেই আগুনকে ঘিরে। একটু তফাতে কয়েকজন শুয়ে আছে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। এরা ওদের পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে ঘাসের জংগল শেষ হয়ে গেছে। ওদের কাছে পৌঁছবার আগেই যদি ওরা কেউ পিছন পানে তাকায়—তাহলেই সবাই ধরা পড়ে যাবে। চীৎকার করে সে সকলকে সজাগ করে দেবে। তার চেয়ে জংগলটা ঘুরে ওই নারিকেল কুঞ্জের আড়াল দিয়ে একেবারে ওদের কাছে গিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোরিয়ান সংগীদের সেখানে রেখে তিনজনে সেই ফাঁকা জায়গাটুকু পাশ কাটালো। জংগলের মাঝে খস্ খস্ সর্ সর্ শব্দ পেয়ে জংলীগুলো সেদিকে দু-এক বার তাকালো বটে, কিন্তু গ্রাহ্য করলো না। সরোজরা যে সেই জংগলে আসতে পারে—একথা তাদের মনেও স্থান পায়নি।

নারিকেল কুঞ্জের পিছনে এসে তারা দাঁড়ালো, আর শ'খানেক হাত মাত্র দূরে জংলীরা বসে আছে। মাত্র পাঁচজন। ওদের কাছে যেতে হলে এবার চোখে না পড়ে উপায় নেই। কিন্তু তারপর। ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে ত্রিশ-চল্লিশ জন, ওরা যখন জেগে উঠবে, তখন ?

বিনয়বাবু কি করবেন, চিন্তায় পড়লেন।

সহসা সরোজের চোখে পড়লো- নারিকেল কুঞ্জের শেষ গাছটির নীচে সনি উবু হয়ে বসে আছে, তার হাত দুটি পিছন দিকে বাঁধা। স্বর্ণ সুযোগ। সরোজ আর দেরী করতে পারলো না। সটান শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে নারিকেল কুঞ্জের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো। একেবারে সনির পিছনের গাছটির আড়ালে এসে সে থামলো। হাত বাড়িয়ে সনির পিঠের উপর একখানি হাত রাখলো। সনি রীতিমতো চমকে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন পানে তাকিয়ে সে সরোজের হাত ও মাথাটা দেখতে পেলে। সে কি বলতে যাচ্ছিল, সরোজ চাপা গলায় বললো—চুপ !

সনি আবার মুখ ফিরিয়ে স্থির হয়ে বসলো। সে চালাক ছেলে, ব্যাপারটা বুঝে নিলে। সরোজ সনির পিঠের কাছে আরো একটু এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছুরি বের করে সনির হাতের বাঁধনটা কেটে দিলে। তারপর পিছিয়ে

এসে গাছের পেছনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তিনজনে তিনটি পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হলো, আর ঘুরে যাওয়া চলবে না, এবার সংক্ষেপে পথ শেষ করতে হবে—সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু দৌড়ে পার হয়ে অপেক্ষামান দশজন কোরিয়ান সঙ্গীর সঙ্গে গিয়ে মিলতে হবে।

বিনয়বাবু ডাকলেন—সনি!

সনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, চারজনে একসঙ্গে নারিকেল-কুঞ্জ ছেড়ে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড় দিল।

আগুনের পাশে জাগ্রত রক্ষীরা লাফিয়ে উঠলো। একজন তো তৎক্ষণাৎ একটি বল্লম ছুঁড়ে মারলো তাদের দিকে। আরেকজন দুটি আঙ্গুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে শিষ দিয়ে উঠলো—কু—উ-আ—!

বিনয়বাবু গুলি চালালেন—যে শিষ দিচ্ছিল সে ঘুরে পড়ে গেল।

বাকী ক'জন এবার একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। বীভৎস চীৎকার। রাত্রির অন্ধকার আঁৎকে উঠলো। সেই চীৎকারের রেশ সাগরের কোল থেকে ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে।

চারজন ঘাসের জঙ্গলে এসে পেঁছে গেল। এত ক্ষিপ্রগতিতে তারা জীবনে কখনও দাঁড়ায় নি। কিন্তু এই ঘাসের জঙ্গল তো আর দৌড়ে পার হওয়া যাবে না। তবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ঘুমন্ত জংলীগুলো এবার মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, হাতে বল্লম নিয়ে 'মার মার' রবে সাড়া তুলে ছুটে এলো পিছু পিছু।

কিন্তু ঘাসের ও আগাছার জঙ্গলে তারাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারলো না।

কোরিয়ানদের কাছে এসে বিনয়বাবু বললেন—ছুটে ভিতরে চল। পাঁচিলের ভিতর থেকে লড়াই না করলে আমরা পারবো না।

পাঁচিলের ফটক বেশী দূরে নয়। তাদের জন্য ফটক খোলাই ছিল। তারা ভিতরে আসতেই ফটক বন্ধ করে দেওয়া হলো। বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি গুনে দেখলেন যে, দশজন ভিতরে আসার আগেই ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে এসেছে মাত্র আটজন। জংলীরা তো প্রায় এসে পড়েছে, এখন আবার ফটক খুলে কে তাদের ভিতরে নিয়ে আসবে? কিন্তু তাই বলে কি সঙ্গী দু'জন জংলীদের হাতে মারা পড়বে? তাতো হতে পারে না। সরোজ এগিয়ে এলো, বললো—এখনি ফটক খোলো, আমি তাদের নিয়ে আসি।

ফটক খোলা হলো।

সরোজ বাইরে এসে দাঁড়ালো। কোরিয়ান দু'জন তখন ফটকের কাছে এসে পড়েছে। তাদের আসতে দেরী হয়েছিল বলেই জংলীরা তাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তাদের উপর বল্লম ছুঁড়ে মারছে।

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সরোজ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। একজন

জংলী অত্যন্ত কাছে চলে এসেছিল, সরোজ তাকে গুলি করলো। কিন্তু গুলি খেয়ে পড়ে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে বল্লম ছুঁড়লো, একজন কোরিয়ান সেই বল্লমের আঘাতে ধরাশায়ী হলো। সরোজ তাকে তুলে নিয়ে ফটকের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে।

লোকটি বেশীক্ষণ বাঁচলো না। একবার জল চাইলো। এক চুমুক জল পান করেই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। বল্লমটি তার বুকের পাঁজর ভেদ করেছিল।

বাইরে তখন জংলীদের হল্লা সুরু হয়ে গেছে।

সহসা এক ঝাঁক বল্লম ভিতরে এসে পড়লো।

বিনয়বাবু বললেন—চলুন, ছাদের উপরে যাই।

সকলে ছাদে উঠে এলো।

পাঁচিলের বাইরে ফাঁকা মাঠে পঁচিশ-ত্রিশজন জংলী জড়ো হয়েছে, তাদের হাতের বল্লমের ধারালো ফলাগুলি চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে। বিনয়বাবু বললেন—ওরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়েছে। এখনই ওদের নিরুৎসাহ না করলে ওরা পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে আসার চেষ্টা করবে। এক সঙ্গে তিন-চার জায়গায় পাচিল টপ্‌কালে আমাদের পক্ষে তখন মুস্কিল হবে। আমরা এই ক'জন ওদের তখন রুখতে পারবো না।

ওদেরকে ছাদের উপর দেখে, ক'জন জংলী দৌড়ে এগিয়ে এসে আরেক ঝাঁক বল্লম ছুঁড়লো ছাদের পানে। বিনয়বাবুরা সরে গেল। বল্লম গায়ে লাগলো না বটে, কিন্তু কাছাকাছি এসে পড়লো ছাদের উপর। জংলীরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠলো, দেয়ালের আরো কাছে এগিয়ে এলো।

বিনয়বাবু আর কথা বললেন না, এগিয়ে গিয়ে পিস্তলের ঘোড়া টিপলেন। অভ্যাস থাকলে এত কাছাকাছি পিস্তলের গুলি ব্যর্থ হয় না। একজন জংলী গুলি খেয়ে পড়ে গেল। রাগে জংলীরা চেঁচিয়ে উঠলো, আরেক ঝাঁক বল্লম ছুঁড়ে মারলো ছাদের দিকে।

এ লড়াই কিন্তু বেশীক্ষণ চললো না।

পর পর জংলীদের কয়েকজন গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হতেই তারা পিছু হটে গেল, ফিরে গেল পিছনের জঙ্গলের আড়ালে।

সকাল হতে তখন অনেক দেরী। সরোজরা কিন্তু বাকী রাতটুকু আর ঘুমুতে পারল না, এত বড় উত্তেজনার পর নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দেওয়া সম্ভব নয়। তার উপর আবার ভয়ও আছে, কখন কোন্‌দিক থেকে আবার আক্রমণ হবে তা তো জানা নেই।

বিনয়বাবু ছাদের উপর পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সে রাতে জংলীরা আর এলো না।

একদিন দু'দিন করে দেখতে দেখতে সাত রাত কেটে গেল তবু জংলীদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সরোজ বললো—ওরা আর কিছুদিনের মত এদিকে ঘেঁসবে না, আসবার হলে এদ্দিনে নিশ্চয় আসতো।

বিনয়বাবু বললেন—সম্ভবতঃ ওরা নতুন কোন ফন্দী আঁটছে। আমাদের উপর ঠিক চোখ রেখেছে, আচমকা একদিন আমাদের উপর চড়াও হবে। আমি ওদের ভাল ভাবে চিনি, আমার অভিজ্ঞতা আছে।

বিনয়বাবু সত্য কথাই বলেছিলেন, জংলীরা দিন কয়েক তাদের নিরাপদে ভাববার অবসর দিয়েছিল মাত্র।

আবার এক রাত্রে জংলীরা তাদের আক্রমণ করলো।

কিন্তু এবারকার আক্রমণ পূর্বের মত নয়। এই আক্রমণ এমনভাবে তাদের উপর এসে পড়লো যে এবার আর তারা রক্ষা পেলে না।

ঠিক দুপুর রাতে একটা সোরগোল উঠলো।

সবেমাত্র চারজনে ছাদ থেকে নেমে এসে একটু শুয়েছে, এমন সময় এই গোলযোগ।

ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে ছিল পিস্তল, তুলে নিয়ে বিনয়বাবু বেরুতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো একজন জংলী। তার মাথায় শাদা পালকটি দেখেই বিনয়বাবু তাকে গুলি করলেন। সে দরজার পাশেই ঘুরে পড়ে গেল।

পরক্ষণেই বাইরের উঠান আলোয় আলোময় হয়ে গেল—খড়ের ঘরে জংলীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চারজনে ঘরের বাহিরে এলো।

একজন কোরিয়ান ছুটতে ছুটতে এলো বিনয়বাবুর কাছে, অনেক কথা সে বলে গেল ঝড়ের মত। সকলে বুঝলো সে বিশেষ ভয় পেয়েছে।

তার সব কথা শুনে বিনয়বাবু বললেন—জংলীরা অতর্কিতে চারদিক থেকে আক্রমণ করেছে. চারিপাশের পাঁচিল তারা একসঙ্গে টপকেছে, এরা তাদের বাধা দিতে পারেনি। এরা সামনের দিকে রুখেছিল. সেই ফাঁকে তারা পিছন দিক থেকে উঠানে এসে নেমেছে, ঘরে আগুন দিয়েছে, সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে। সংখ্যায় তারা অনেক। আমাদের মধ্যে এখনও কে যে বেঁচে আছে আর কে যে বেঁচে নেই তা বলা শক্ত।

বিনয়বাবুদের দেখতে পেয়েই ক'জন জংলী হৈ হৈ করে সেদিকে ছুটে এলো, ওরা কাছে আসতেই চারজন একসঙ্গে গুলি চালালো, সামনের সারির চারজন ধরাশায়ী হলো। জংলীরা আর এগিয়ে আসতে সাহস করলো না। দূরে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগলো।

সরোজ বললো—এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না বিনয়বাবু, আমরা কোথায় যাব বলুন?

বেশ, চলুন—

বিনয়বাবু ছুটতে সুরু করে দিলেন।

চারজন ছুটলো তাঁর পিছনে।

জংলীরা চীৎকার করে উঠলো, কয়েকটা বল্লম ছুঁড়ে মারলো তাদের দিকে।

খড়ের চালাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলেছে, চারিপাশ আলোয় আলো। সেই আলোয় চলতে মোটেই কষ্ট হলো না। বিনয়বাবু বরাবর দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন গম্বুজের নীচে। এদিকে জংলীরা ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বিনয়বাবু বললেন—এই ঘরখানিই সবচেয়ে নিরাপদ। ওরা কোন না কোন সময় আগুন দিতে পারে ভেবে আমি এটিকে আগাগোড়া মাটি দিয়ে গড়েছি।

গম্বুজের দরজাটি ছিল বিশেষ ছোট। সকলে ভিতরে ঢুকে, একটা প্রকান্ড মাটির তাল পাশে পড়েছিল সেটাকে তিনজনে ঠেলে এনে দরজা বন্ধ করে দিল। বিনয়বাবু সেই দরজার পিছনে কয়েকটি গাছের গুঁড়ির ঠেক্‌না দিল, যাতে সহজে ঠেলে ভিতরে না আসা যায়। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে গিয়ে উঠলো গম্বুজের ছাদে।

সবেমাত্র ছাদে এসেছে, এমন সময় কোথা থেকে একটি তীক্ষ্ম বল্লম এসে একজন কোরিয়ানের বুকে বিঁধলো। বেচারা ঘুরে পড়ে গেল। একবার সামান্য একটু ছট্‌ফট্‌ করেই স্থির হয়ে গেল। ঢালু ছাদের উপর দিয়ে তাজা রক্তের একটা রেখা গড়িয়ে গেলো নীচে।

সনি এমনভাবে চোখের সামনে মানুষ খুন হতে দেখেনি, থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। বললো—ইস, মানুষ কি ভাবেই মানুষকে খুন করে!

সরোজ বললো—এখানে সভ্য-অসভ্য সবাই সমান। অসভ্যেরা একটা দুটো করে খুন করে আর সভ্যেরা এটম্‌ বোমা মেরে নগরকে নগর শুদ্ধ ধ্বংস করে দেয়।

বিনয়বাবু কোন কথা বললেন না, তাঁর মুখখানি পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠলো।

ক'জন জংলী পিছু পিছু এসেছিল বটে কিন্তু যখন তারা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে পারলো না, তখন ফিরে গেল। দূর থেকে এদের চারজনকে ছাদের উপর দেখলো, কিন্তু বল্লম ছুঁড়লো না। সারা রাত হৈ হৈ করে তারা শুধু ঘরে ঘরে আগুন লাগালো। সকালে দেখা গেল প্রত্যেকখানি কুটির ভস্মীভূত হয়েছে।

আশে পাশে জংলীরা ঘোরা-ফেরা করতে লাগলো গম্বুজ ঘরটির পানে নজর রেখে।

বিনয়বাবু বললেন—ওরা যে চাল চেলেছে, তাতে আমাদের ধরা পড়তেই হবে। আমাদের এখানে জল নেই, খাবার নেই, আমরা এভাবে কতক্ষণ যুঝবো?

সরোজ বললো—এক কাজ করলে হয় না, সামনের সমুদ্রের তীরে ওদের নৌকাগুলো রয়েছে, কোন রকমে ওখানে পেঁীছে একখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লে হয় না?

বিনয়বাবু বললেন—আমিও তাই ভাবছি, কিন্তু এই মহা-সমুদ্রে একখানা ডিঙ্গি নিয়ে যাবো কোথায় ?

—যেখানেই যাই ওই জংলীদের হাতে তো আর মরতে হবে না।

—তাহলে এখনি বেরিয়ে পড়তে হয়। ভোরের দিকে ওরা একটু এদিকে-ওদিকে আছে, এই সুযোগ।

সরোজ ও ডেভিড নীচে নেমে এসে সন্তর্পণে দরজায় আটকানো ঠেক্‌নাগুলি খুলে ফেললো, বিনয়বাবু ও সনি-ছাদের উপর সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাদের মনে হলো সমুদ্রের দিকটা বেশ নিরিবিলি বিনয়বাবু তখনই সনির সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। চারজনে একসঙ্গে গম্বুজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামনেই পাঁচিলের দরজা। জংলীরা দরজা খুলেই রেখেছিল। দরজা পার হয়ে তারা পাঁচিলের বাইরে এসে পড়লো। এবার কয়েকটা নারিকেল গাছের সারি পার হলেই সমুদ্রতীর, তারপরেই নৌকা।

পিছনে জংলীরা সোরগোল তুললো, কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিলে না। নারিকেল গাছের নীচ দিয়ে তারা দৌড়াতে সুরু করলো।

সহসা বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, একটা সাপের মত কি যেন চকিতে তাঁর গায়ে এসে পড়লো। পরক্ষণেই তাঁর গতি রুদ্ধ হলো, দেখলো একটা দড়ির ফাঁস তার বুকের উপর চেপে বসেছে। নিমেষ মধ্যে পিছনের গাছের আড়াল থেকে দড়িতে একটা টান পড়লো। বিনয়বাবু সামলাতে পারলেন না, মাটির উপর বসে পড়লেন। সরোজরা ক'পা এগিয়ে ছিল, বিনয়বাবুর পড়ে যাবার শব্দ শুনেই পিছন পানে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ব্যাপার বুঝতে তাদের দেরী হলো না, এগিয়ে এসে পকেট থেকে সে ছুরি বের করলো দড়িটা কেটে দেবার জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে সনি চিৎকার করে উঠলো। গাছের আড়াল থেকে আরেকটা দড়ির ফাঁস এসে তাকে বেঁধেছে। সরোজ বিপদে বুদ্ধি হারালো না, বললো—ডেভিড, নজর রাখ, দেখতে পেলেই গুলি চালাবে !

বিনয়বাবুর দড়ির উপর সে ছুরি ঘষতে সুরু করলো। একরকম লতা জড়ানো দড়ি, সহজে কাটতে চায় না।

এদিকে সনির দড়ি ধরে গাছের পিছন থেকে তারা টানতে সুরু করলো। কাউকে দেখা যায় না। ডেভিডের মাথা গরম হয়ে উঠলো, সে তেড়ে গেল সেই গাছগুলির দিকে। সামনে কি একটা পড়েছিল, তাতে ঠোক্কর লেগে ডেভিড তাল সামলাতে পারলো না, পড়ে গেল।

এই সুযোগ জংলীরা ছাড়লো না, চারিপাশের গাছের আড়াল থেকে হুড়মুড় করে তারা এগিয়ে এলো, চারজনকে ঘিরে ধরলো চারিপাশ থেকে।

তারপরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। জংলীরা তাদের পিস্তল কেঁড়ে নিলে। বেঁধে ফেললে পিছমোড়া করে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চললো জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে এসে মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে শিষ দিয়ে উঠলো—কু-উ-উ-য়া—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহারথীদের শাঁখের মত সেই ধ্বনির রেশ জঙ্গলের বুকে প্রতিধ্বনি তুললো। সেই ধ্বনির রেশ জংগলের বুকে হারিয়ে যেতে-না-যেতে চারিপাশ থেকে আরো অনেক জংলী ছুটে আসতে সুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিপাশে রীতিমত ভীড় জমে গেল।

পায়ে-চলা পথ, জংগলের মাঝ দিয়ে বরাবর চলে গেছে। জংলীরা সেই পথ দিয়ে তাদের নিয়ে চললো।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। শেষ রাতেও আকাশে আলো থাকে। সেই আলো-আঁধারে-ঘেরা জংগলের পথ আঁকাবাঁকা, উঁচু নীচু, দুর্গম কোথায় সে পথ শেষ হয়েছে, কে জানে!

পথ চলতে চলতে রাতের জ্যোৎস্নায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে দুপাশের ঢেউ-খেলানো পাহাড় চোখে পড়ে। চারজনে পথ চলে, আর ভাবে কোথাকার মানুষ তারা কোথায় চলেছে। জংলীরা তাদের নিয়ে গিয়ে কি করবে কে জানে? ইংরাজী বইয়ে পড়েছে, আফ্রিকার জংলীরা তো অন্য জাতের মানুষ পেলেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। এরাও তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে হয়ত! সরোজের মনে পড়ে পাশের বাড়ীর এক ভাড়াটে কাপড়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরতে গিয়েছিল। তখনই সে মরেনি, মরেছিল তার একদিন পরে। সে কী যাতনা, কি কষ্ট! তার সারা দেহের চেহারা হয়েছিল কি বীভৎস! তাদেরকেও তেমনি কষ্ট পেতে হবে। কেউ জানবে না কোথায় কোন্ জঙ্গলে জংলীরা তাদের কত যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারলো। তাদের মৃত্যুর খবরটুকুও কোনদিন দেশে গিয়ে পৌঁছাবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করতে চেয়েছিল, দেশ তো স্বাধীন হলই না, অজানা কোন্ এক জঙ্গলে জংলীদের হাতে সে খুন হলো! অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

সরোজ ভাবে, সকলেই ভাবে। ভাবে আর পথ চলে। সরু পথ। বনের পথ। গাছের নীচে দিয়ে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। উচু-নীচু পাথরের টুকরো, কোথাও বা গাছের ডাল তাদের পায়ে বাধছে—কিন্তু উপায় নেই, জংলীদের হাত থেকে নিস্তার নেই। অবসাদে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সে কথা বুঝবে কেন? জংলীরা তাদের টেনে নিয়ে যাবেই।

প্রত্যুষে যখন সূর্য উঠলো তখন তারা এক পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছেচে। পাহাড়টি বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ নয়। ইতস্ততঃ ছড়ানো কুঁড়ে ঘর কতকগুলি। তার ওদিকে ঢালু ধান জমি নেমে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। এটি জংলীদের ছোট একখানি গ্রাম বলে মনে হয়। সেই গ্রামের পাশ দিয়েই পথ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা পথের উপর ভীড় করে এসে দাঁড়ালো সরোজদের দেখবার জন্য। ছোট ছোট তেরচা চোখে বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে রইল সরোজদের মুখের পানে। যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো।

গাঁয়ের লোকের একটি দল এবার তাদের পিছু নিলে। তারা বোধ হয় শেষ অবধি দেখতে চায়।

সরোজরা তখন চড়াই ভাঙতে সুরু করেছে। তাদের দেহ তখন অবসন্ন। গাঁয়ে পেঁছে জংলীরা খানিকক্ষণ বসে যখন এক ভাঁড় করে চা খেয়েছিল, তখন সরোজদেরও এক ভাঁড় করে চা দিয়েছিল। সে চায়ে দুধ বা চিনি বলে কিছু ছিল না, কিন্তু সেইটুকুই তখন সরোজদের কাছে অমৃত বলে মনে হয়েছিল।

ছোট পাহাড়। একেবারে চূড়ায় উঠতে বেশীক্ষণ লাগলো না। উপরে একখানি মাত্র চালা ঘর। ঘরখানির অদূরে একটি গাছের নীচে বিরাট এক কাঠের পুতুল, রাক্ষসের মত বীভৎস তার আকার। সেই পুতুলটির সামনে খানিকটা সমান জায়গা। সেই জায়গায় কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিল। জংলীরা তাদের সামনে গিয়ে থামলো।

বিনয়বাবু এবার কথা বললেন। সরোজ তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বিনয়বাবু তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—ব্যাপারটা আমি এবার বুঝেছি। এদের একজন লোক একবার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিল। তার মুখে শুনেছি, এরা ভুতের বড় ভয় করে। এই পুতুলটি হচ্ছে এদের ভুতের দেবতা। এই পাহাড়ের পিছন দিকে একটি খাদ আছে. সে খাদের জলে এই দেবতার বাহন কুমীর থাকে। বিদেশীদের ধরে এরা এইখানে নিয়ে আসে, এই দেবতার নামে উৎসর্গ করে তাকে কুমীরের মুখে ফেলে দেয়। আমাদেরও এখানে নিয়ে এসেছে সেইজনাই—

বিনয়বাবু যে কথা বলছেন একজন জংলী বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছিল। সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিনয়বাবুর গালে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলে। আরো দু-এক ঘা হয়তো বিনয়বাবুর উপর পড়তো, কিন্তু ঠিক সেই সময় সকলের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। লোলচর্ম এক বৃদ্ধ, লাল রঙের আলখাল্লা পরণে, কুটিরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কাঠের পুতুলটির সামনে এসে দাঁড়ালো। উপস্থিত সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

লোকটি বোধ হয় পুরোহিত। ঠাকুরের সামনে বেদীর উপর সে গিয়ে বসলো, একটি পাতার উপর কিছু ফুল ছিল, বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে সেই ফুলগুলি দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিল। তারপর একটি ছোট মাটির পাত্র হাতে নিয়ে উঠে এল। পাত্রটির মধ্যে জল ছিল। সেই জল সে চারজনের মাথায় ছিটিয়ে দিল। তারপর জংলীদের হাত নেড়ে ইসারা করে মাটিতে তিনবার পা ঠুকে কি যেন বলে চীৎকার করে উঠলো। উপস্থিত জংলীরাও সমস্বরে সেই কথা বলে চীৎকার করে উঠলো।

চীৎকার থামলো। জংলীরা সরোজদের টেনে নিয়ে গেল দেবতার পিছন দিকে। পুরোহিত ও অন্যান্য জংলীরা তাদের অনুসরণ করলো।

পাহাড়ের চূড়ায় তারা উঠেছিল, এবার নামার পালা। কিছুটা নেমে বাঁদিকে

ফিরতেই এক খাদের ধারে এসে তারা পেঁছালো। সেখানে পাহাড়ের খানিকটা অংশ ফেটে বরাবর নীচে নেমে গেছে। এমন স্থানে এত গভীর ফাটল বড় একটা দেখা যায় না। সেই খাদের নীচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ঠাহর করা যায় না। এরোপ্লেন থেকে সরোজ ও ডেভিডের নীচে তাকানো অভ্যাস আছে তাই, নাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে নীচের পানে তাকালে সাধারণ লোকের মাথা ঘুরে যাবে। বিনয়বাবু তো একবার তাকিয়ে চোখ বুঁজলেন, ভগবানকে স্মরণ করলেন বোধ হয়। সনির চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠলো, তার মুখের পানে তাকিয়ে সরোজের মনে হলো যে সে বুঝি এখনই কেঁদে ফেলবে।

খাদের ওপাশে পাহাড় বরাবর নেমে গেছে, ঢালু পাহাড় বরাবর গিয়ে ডুবে গেছে নীল সমুদ্রের গর্ভে।

সেই খাদের কিনারায় জংলীরা সারি দিয়ে চারজনকে দাঁড় করিয়ে দিলে।

পুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ালো। বিড় বিড় করে কি উচ্চারণ করে হাতের পাত্র থেকে সবটুকু জল নিঃশেষে ঢেলে দিলে সেই খাদের মধ্যে, তারপর উচ্চ-কণ্ঠে কি বলে উঠলো।

চারজনের প্রথমেই দাঁড়িয়েছিল সরোজ। পুরোহিতের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একজন জংলী তাকে ধাক্কা দিলে নীচে ফেলে দেবার জন্যে। সরোজ প্রস্তুত হয়েই ছিল। জংলীটি ধাক্কা দেবার আগেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে নীচে লাফিয়ে পড়লো। জংলীটি পড়তে পড়তে চীৎকার করে উঠলো। পিছনে সমবেত জংলীদের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। পুরোহিত উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো, মাটির পাত্রটি তাঁর হাত থেকে খাদ্যের মধ্যে পড়ে গেল। তিনজন ষণ্ডামার্ক জংলী ডেভিড, বিনয়বাবু ও সনির পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তারা সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত এবার চীৎকার করে উঠলো।

ভীড়ের ভিতর থেকে তিনজন লোক বল্লম হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো, বিনয়বাবু, ডেভিড ও সনির পানে বল্লম উঁচিয়ে তারা প্রস্তুত হলো,—আদেশ পেলেই তারা এদের গেঁথে ফেলবে।

ডেভিড ব্যাপারটা বুঝলো। তাড়াতাড়ি বললো—আমরা নীচে লাফিয়ে পড়ি বিনয়বাবু, জংলীদের বল্লমে খুন হওয়ার চেয়েও নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

বিনয়বাবু বললেন—কিন্তু

—আর কিন্তুর সময় নেই বিনয়বাবু, এখনি হুকুম হবে, চোখ বুঁজে লাফিয়ে পড়ুন।

ডেভিড আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে চোখ বুঁজে নীচে লাফিয়ে পড়লো। সনিও আর চিন্তা করলো না, লাফিয়ে পড়লো।

বিনয়বাবু ক্ষণেক কি যেন ভাবলেন, তারপর একবার 'ওম্' উচ্চারণ করে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

লোকে যে স্বেচ্ছায় অমনভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে,

জংলীরা তা কখনও দেখেনি। তারা অবাক হয়ে গেল। বৃদ্ধ পুরোহিতও বারেকের জন্য 'হাঁ' হয়ে গেল। তারপর সকলেই খাদের কিনারার কাছে এগিয়ে এসে নীচের পানে তাকালো, অন্ধকারে যতটা সম্ভব ঠাহর করে দেখতে চাইল—মানুষগুলির হলো কি। কিন্তু সেই গভীর খাদের অন্ধকারে নীচে অবধি কারও দৃষ্টি পেঁছালো না।

বিনয়বাবু চোখ বুঁজে লাফিয়ে পড়েছিলেন। মনের গতি মুহূর্তের চেয়ে দ্রুত সঞ্চরণশীল। মনের সেই প্রতীতি নিমেষে বিনয়বাবুর মনে হলো তাঁর সারা দেহ এখনি নীচের পাথরের সংগে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে টুকরো টুকরো হয়ে কাচের বাসনের মত ছড়িয়ে পড়বে। শুধু একটা সংঘাত, তারপরই সব শেষ। এই অভাবিত অনিবার্য প্রচণ্ড সংঘাতের সম্মুখীন হবার মত মনের বল বিনয়বাবুর ছিল না, বিনয়বাবু তাই চোখ বুঁজলেন।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই থুপ্ করে এসে পড়লেন একেবারে পাঁকের মধ্যে। বিনয়বাবু চোখ মেলে দেখলেন পাঁকের মধ্যে ডুবে গেছেন। চারিপাশ প্রায়-অন্ধকার, পাঁকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। তবু কোন রকমে বিনয়বাবু এক জায়গায় দাঁড়ালেন। কোমর অবধি পাঁকের নীচে ডুবে গেল। এতক্ষণে বিনয়বাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—এ যাত্রায় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

বিনয়বাবু চারিপাশে ভাল করে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন। কাছাকাছি তিনজনকে তিনি দেখতে পেলেন—ডেভিড, সরোজ ও সনি। সনি বেচারার অবস্থা কাহিল, তার বুক অবধি পাঁকে ডুবে গেছে।

হঠাৎ চোখে-মুখে কাদা ছিট্‌কে লাগলো। বিনয়বাবু চমকে উঠলেন। হাতের মুখের পাঁক মুছে ফেলে দেখেন, খানিকটা আগে সরোজ দাঁড়িয়ে আছে, তার হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেছে। হাতে তার একখানি বড় ছোরা। তার সামনেই কিছু দূরে এক বিরাট কুমীর পাঁকের মধ্যে লেজ আছড়াচ্ছে। তার মুখের মধ্যে থেকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটি মানুষের দু'খানি পা বেরিয়ে আছে। বিনয়বাবু ভাল করে ঠাহর করে দেখলেন, যে জংলীটিকে সরোজ জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে পড়েছিল তাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাহলে সেই জংলীটাকেই কুমীরে ধরেছে, ওই পা দু'খানি তাহলে সেই জংলীটার। ওই জংলীটিকে শেষ করে এবার কুমীরটি তাদের দিকে এগিয়ে আসবে। সরোজ একখানি ছোরা নিয়ে ওই বিরাট কুমীরের সংগে আর কতটুকু কি করতে পারবে? ওই কুমীরের কবলে তাদের চারজনেরই মৃত্যু। ওই কুমীরের মুখে মরার চেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে আছড়ে পড়ে মরা তো অনেক ভাল ছিল। এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেত, আর এই কুমীরের কামড়ে কতক্ষণ কষ্ট পেয়ে মরতে হবে কে জানে! বিনয়বাবু ভগবানকে স্মরণ করলেন—ওম্ তৎসৎ! ওম্ তৎসৎ!

মাত্র মিনিট দুয়েক! তারপরেই কুমীরটা হাঁ করে এগিয়ে এলো সরোজের দিকে। সরোজ তার মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, প্রস্তুত হয়েই ছিল, এক

পা-ও সে পিছিয়ে এলো না। চকিতে কুমীরটির মুখের মধ্যে ছোরার এক সাংঘাতিক আঘাত করে সে হাত টেনে নিল। কুমীরের জিভ ও ঠোঁটের পাশ থেকে দু'খানা হয়ে চিরে গেল, যাতনায় একবার মুখ বন্ধ করেই, পাঁকের উপর কয়েকটা প্রচণ্ড লেজের ঝাপটা মেরে কুমীরটা ঝাঁপিয়ে পড়লো সরোজের উপর। বিনয়বাবু নিশ্চিত বুঝলেন—এবার আর সরোজের রক্ষা নেই। সরোজ কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে গিয়ে পর পর দু'বার কুমীরের দু'চোখে ছোরার আঘাত করলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো, কুমীরের প্রকাণ্ড মাথাটার উপর দিয়ে রক্তের ধারা নেমে এলো কুমীরটি সরোজের পানে ফিরে
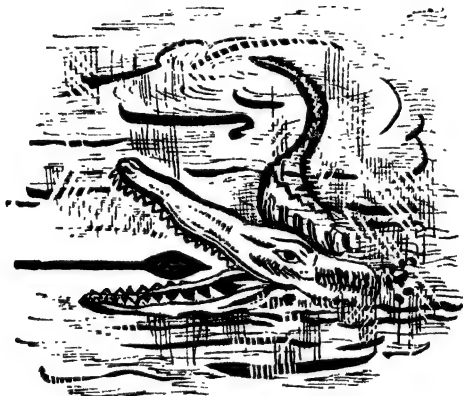
আবার হাঁ করলো, সরোজ তার নাকের নীচে আবার ছোরার আঘাত করলো। কুমীরটা ফোঁৎ-ফোঁৎ করে একটা শব্দ করলো, মাথা, নাক ও মুখে টকটকে লাল রঙ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। পরক্ষণেই কুমীরটি মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। কয়েক গজ দূরে ছিল জল, সেই জলের মধ্যে নেমে গেল।

সরোজ কয়েক মিনিট তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কুমীরটি আর ভাসলো না। এবার সরোজ এদের পানে ফিরলো।

এতক্ষণ সকলে যেন একটা সার্কাসের খেলা দেখছিল। দেখতে দেখতে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে নিজেদের কথা আর কারও মনে ছিল না। সরোজের ডাক শুনে সকলে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। সরোজ বললো—বিনয়বাবু, ডেভিড, সান, তোমরা এদিকে চলে এসো, ওখানে বেজায় পাঁক, এখানে পাঁক অনেক কম।

তিনজনে সাবধানে সরোজের দিকে অগ্রসর হলো। কোথায় কতখানি পাঁক জানা নেই তো, হয়ত পরের পদক্ষেপেই ডুবে যাবে।

খাদের পাশে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। অন্ধকার প্রকাণ্ড গুহা। জল কি পাঁক সেই গুহার মুখ অবধি পৌঁছায় নি। চারজনে সেই গুহার মুখের কাছে

উঠে বসলো। গায়ের জামা খুলে হাত-পায়ের পাঁক মুছে ফেললো। সামনে একটু নামলেই জল, বরাবর খাদের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী নদীর মত চলে গেছে। কিন্তু সেই জলেই তো কুমীরটিও ডুবেছে, সেই কথা ভেবেই কেউ আর সাহস করে জলে নামলো না। জামায় মুছেই হাত-পায়ের কাদা সাফ করলো।

কিন্তু পাহাড়ী খাদের, আলো-হাওয়াহীন গভীর খাদের স্যাঁতসেঁতে কনকনে পাঁক। গায়ে শুকাতে না শুকাতেই সর্বাঙ্গ কেমন যেন শিরশির করে ওঠে, শীত করে, কাঁপুনি আসে।

চারজনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে।

কোন এক সময় সানিই প্রথম কথা বলে—গুহার মধ্যে ওগুলো চকচক করছে কি?

সকলে ভিতরে অন্ধকারের পানে দৃষ্টি ফেরায়। সত্যই পাথরের খাঁজে খাঁজে কি যেন চিকমিক করছে।

ভাল করে ঠাহর করে সকলে দেখে, শেষে সরোজ বললো—ওগুলো বোধ হয় হীরে। এ রকম পাহাড়ের গুহায় তো হীরা পাওয়া যায়, নাবিক সিন্দবাদের গল্পে পড়েছি। একটা পরীক্ষা করে দেখি।

সরোজ গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। কাছাকাছি যে পাথরের টুকরোটি ঝিকমিক করছিল, সেটি কুড়িয়ে নিয়ে এল। সকলে হাতে নিয়ে সেটিকে পরীক্ষা করলো। কাচের মত একটুকরো পাথর, একটি কোটের বোতামের মত বড় হবে, অন্ধকারে ঝলমল করছে। বিনয়বাবু বিশেষ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—এটি হীরেই খুব সম্ভব, তবে আনকোরা নতুন, কাটলে হীরেই হবে।

সরোজ লাফিয়ে উঠলো, বললো—এত হীরে? এমন বড় বড়! এর এক-একটার দাম তো দশ-পনেরো হাজার টাকা হবে। আমরা তো তাহলে রীতিমত এক-একজন কোটিপতি!

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—হীরে-মুক্তো খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না। এখানে ওই এক-একখানা হীরের চেয়ে এক এক গ্লাস জলের দাম অনেক বেশী।

জলের কথা উঠতেই সানি বললো—সত্যি আমার তো অনেকক্ষণ তেষ্টা পেয়েছে।

সরোজ বললো—জলের ব্যবস্থা এখনি হবে, আগে হীরেগুলি কুড়িয়ে নিই।

সরোজ হীরা কুড়োতে লেগে গেল।

ইতিমধ্যে সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে এসে পৌঁছেচে। রোদ্রের ঋজু গতি খাদের বন্ধুর দেয়ালে আঘাত করে নীচে অবধি পৌঁছাতে না পারলেও দ্বিপ্রহরের আভাসটুকু পৌঁছে দিয়েছে নীচে পর্যন্ত।

বিনয়বাবু বললেন—একটা দিন তো অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে, এখান থেকে বের হবার পথ না পেলে এখানেই আমাদের জীবন্ত সমাধি হবে। তখন কোথায় থাকবে হীরে আর কেই বা দেবে এর দাম?

ডেভিড বললো—আমি সেই কথাই এতক্ষণ ভাবছি। এই খাদের খাড়া পাহাড়ের দেয়াল ঠেলে ওপরে ওঠা তো সম্ভব নয়।

সরোজ বললো—তার প্রয়োজন হবে না। কুমীরটা যেদিকে নেমে গেল, ওই জলের রেখা ধরে আমরা বরাবর যাব। এই জলের সঙ্গে বাইরের যোগ আছে। এই জলে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, নাহলে এতখানি উপর পর্যন্ত কাদা জমতে পারতো না। এখন ভাঁটার সময়। জোয়ার এলে এই গুহার মুখ অবধি জল আসে। তাইতেই পলিমাটি এসে এই কাদা জমেছে।

বিনয়বাবু বললেন—মানলাম তোমার কথা, কিন্তু যেখানে একটা কুমীর গেছে, সেই পথে আরো কিছুদূর গেলে আরো কুমীরের দেখা যে মিলবে না তা কি করে জানা যাবে?

—সে কেউ বলতে পারে না। তবে সে কুমীর এখানে এসেও তো আমাদের খেতে পারে। আর সে-কথা ভেবেও কোন লাভ নেই, আমাদের ওই একটিমাত্র বাঁচার পথ আছে। একখানি ছোরা সম্বল করে ওই পথেই আমাদের এগোতে হবে।

সরোজের যুক্তি অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

সরোজ অনেকগুলি হীরা জামায় বাঁধলো। তারপর চারজনে জলের কিনারা ধরে অগ্রসর হলো।

দু'পাশে খাড়া পাথরের দেয়াল। আঁকাবাঁকা বন্ধুর। মাথার উপর আকাশ দেখা যায় না। মনে হয় দু'পাশের দেয়াল যেন আরো একটু এগিয়ে এসে তাদের চেপে ধরবে। দু'পাশের সেই আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ী পাঁচিলের পানে তাকালেই নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

জলের কিনারা ধরে চারজনে অগ্রসর হয়। কাদার মধ্যে কখনো-কখনো কোমর পর্যন্ত নেমে যায়। সামনে কোথায় যে কতখানি গভীরতা তা পরের পদক্ষেপ পর্যন্ত জানা যায় না। নীচে শুধুই পাথর, পিচ্ছিল, কখনো-বা ধারালো। ডানপাশে পাথর, বাঁপাশে পাথর, নীরস কঠিন, কালো। নিষ্করুণ পাথর উপরের আকাশকেও ঢেকে দিয়েছে, নিজের নির্মম কঠিন সীমার মধ্যে অসীম আকাশের আলোকময় স্বচ্ছতাকে যে প্রবেশ করতে দেয় না। যে একবার তার গভীর গহ্বরে এসে পড়বে, এই খাদ গুরুভার পাষাণ হয়ে চারিপাশ থেকে তার উপর চেপে বসবে।

চারজন নীরবে পথ চলেছে। এই পথ চলা তাদের সুরু হয়েছে গতকাল থেকে। শুধু পথ আর পথ। পাহাড়ী পথ। বন্ধুর নীরস কঠিন পথ। কাল পথের দু'পাশে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের শ্যামলিমা ছিল। আজ আর পথের দু'পাশে কালো পাষাণ ছাড়া কিছু নেই। কালও পথের শেষ ছিল অজানা, আজও পথের প্রান্ত অজ্ঞাত। তবু চলতে হবে। এ যেন জীবনের অনিবার্য গতি। রোগ, শোক, দুঃখ ও বেদনা যে ভাবেই আঘাত করুক না কেন, নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত; সেইখানেই পথের শেষ। পা চলতে চায় না, তবু চলার শেষ নেই। দেহ অবসন্ন, তবু আরামের অবসর

নেই। মন ভাবতে চায় না, তবু পথের শেষ সম্পর্কে না ভেবে উপায় নেই। চলা আর চলা, সন্তর্পণে কাদার মধ্যে পিচ্ছিল ধারালো পাথরের উপর পা ফেলে চলা।

অন্ধকার যখন বেশ ঘন হয়ে এসেছে, আর কিছুই ভালভাবে ঠাহর করা যায় না, এমন সময় মনে হলো মাথার উপরে পাষাণের দেয়াল যেন কিছুটা নেমে আসছে, আকাশের কিছুটা যেন দেখা যায়।

বিনয়বাবু বলে উঠলেন—খাদ যেন ফুরিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

সরোজ বললো—পাহাড় বোধ হয় শেষ হয়ে এল। কাদাও কমে আসছে।

সত্যই পাহাড় শেষ হয়ে এসেছিল। মাথার উপর আকাশ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো অতো ক্লান্তির মধ্যেও মুক্তির আনন্দে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। নূতন উদ্দীপনা দেখা দিল চলার গতিতে।

কিছুক্ষণ পরেই সত্যই তারা পাহাড়ের কোলে নক্ষত্র-খচিত মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালো। মুক্ত বাতাসের ঝাপটা তাদের দেহে যেন স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। রাত্রির দিগন্ত-বিস্তারী অন্ধকারে তাদের আর ভয় করলো না।

একটা বড় পাথরের উপর তারা চারজন এতক্ষণে বিশ্রাম করতে বসলো।

সরোজ বললো—এবার আমাদের ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে।

বিনয়বাবু বললেন—দাঁড়াও, আগে। হাত-পা ছড়িয়ে একটু জিরিয়ে নি।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটু আরাম করার অবসর। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় চারজনের চোখেই তন্দ্রার আবেশ জড়িয়ে এলো। ধীরে ধীরে চারজনই ঘুমিয়ে পড়লো।

সরোজেরই ঘুম ভাঙলো সবার আগে। কিসের যেন একটা শব্দ পেতেই ঘুম ভাঙলো। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় পাহাড়টিকে বিরাট এক দৈত্যের মত মনে হচ্ছে। খাদের সেই জল ধারা রুপার পাতের মত নেমে এসেছে, কিছুদূর গিয়েই অদৃশ্য হয়েছে বড় কয়েকখানি পাথরের আড়ালে, তার পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছের সারি। সরোজ দৃষ্টি ফেরালো অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে। আজ সারাটা দিন এই বিপুল বিরাট সুনীল আকাশের দেখা সে পায়নি, অনেক কষ্ট করে এই আকাশের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতে, নিবিড়ভাবে আকাশকে দেখতে সরোজের ভাল লাগলো। নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরোজের মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। কোন এক সময় দূর থেকে মানুষের কণ্ঠ ভেসে এলো তার কানে। সরোজ উঠে দাঁড়ালো। যেদিক থেকে শব্দ আসছিল, সেইদিকে ঠাহর করে দেখলো। চাঁদের আলোয় চোখে পড়লো দূরে একটা নদীর রেখা, তারই পারে গাছের ফাঁকে কয়েকটা আলো জ্বলছে। আলোগুলি জংগলের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

সরোজ এবার আর সকলকে ডেকে তুললো। সন্তর্পণে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছাবে, তারপর যদি সেখানে জংলীদের কোন নৌকা পায় তো তাতে চড়ে ভেসে পড়বে, যেখানে গিয়ে শেষ অবধি পৌঁছায় পৌঁছাবে।

চারজনে পাহাড় থেকে নেমে পড়লো প্রান্তরে।

প্রান্তরের চেয়ে সেটাকে আগাছার জঙ্গল বলাই ভাল। পথ বলে তো কিছু নেই। আগাছা মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে ডাল ভেঙে এগিয়ে যেতে হয়। পা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। ভাঙা ডালের খোঁচা লেগে দেহেও ক্ষত হতে বাকী থাকে না। তবু সেই আগাছার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলতে হয়। বেশী শব্দ হলে ভয় করে—যদি জংলীরা শুনতে পায়। কথা বলতেও সাহসে কুলায় না, নিস্তব্ধ রাত্রে শব্দ অনেক দূরে যায়, জংলীদের কানেও হয়তো পেঁছাতে পারে। স্তব্ধ রাত্রির মাঝে স্তব্ধ থাকাই ভাল। চারজনে নীরবে পথ অতিক্রম করতে লাগলো।

বহুকষ্টে নদীর কিনারায় যখন তারা এসে পেঁছালো তখন রাত্রি গভীর। চাঁদ তখন আকাশের একপাশে ঢলে পড়েছে। বনানীর অন্ধকার আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

নদীর তীরে অনেকগুলি নৌকা ছিল। ছোট ছোট নৌকা, চারজন তাতে বসা চলে। সবচেয়ে কাছে যে নৌকাখানি পেলে, সেইখানিতেই তারা উঠে পড়লো। উঠে তো পড়লো, কিন্তু যাবে কোন দিকে? কোন্ দিকে গেলে সাগরে গিয়ে পড়া যাবে, জংলীদের কবল থেকে বাহির হওয়া যাবে? সরোজ বললো—নদীর তীরে চর পড়েছে, এখন ভাঁটার টান চলেছে, স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে দাও, ঠিক সাগরে গিয়ে পড়বে।

সরোজ হাল ধরে বসলো। নৌকা স্রোতের মুখেই ভেসে চললো।

রাত কাটলো। সকলে নদীর জলে মুখ হাত ধুয়ে, আকণ্ঠ জল পান করে স্নিগ্ধ হলো। প্রভাতী সূর্যের আলো সকলের মনে নবীনতার সঞ্চার করলো।

বেলা এক প্রহর কেটে গেল, কিন্তু তখনও সমুদ্রের দেখা নাই। দুপাশে আগাছার জঙ্গলে কোন জংলীরও দেখা মিললো না। কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে চারজন দ্বীপের সীমা পার হবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ছোট নদী এঁকে-বেঁকে ক্রমশঃ এক পাহাড়ের গায়ে এসে পড়লো, তারপর সহসা একটা বাঁক ফিরেই গিয়ে পড়লো এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে। সরোজ তাড়াতাড়ি নৌকা পাড়ে ভেড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। সেখানে স্রোতের টান এত বেশী যে নৌকাখানি পাহাড়ের গায়ে লেগে চূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সরোজ নিরুপায় হয়ে স্রোতের মুখে হাল ছেড়ে দিলে। নৌকা বাঁক ফিরে ঢুকে গেল গুহার মধ্যে।

গুহার খিলান পার হয়েই ভিতরে অন্ধকার।

সরোজ বলে উঠলো—শেষ অবধি কি সলিল সমাধিই অদৃষ্টলিপি?

বিনয়বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সব তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর নির্দেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও খসে পড়ে না। ওঁম্ তৎসৎ! ওঁম্ তৎসৎ!

অন্ধকার। ক্রমেই ঘন অন্ধকার। শেষে কোথাদিয়ে কিভাবে যে নৌকা চলছে তাও আর বোঝা গেল না। এখনি হয়তো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে

নৌকাখানি গুঁড়ো হয়ে যাবে। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সকলে চুপ করে বসে রইল।

সনির গা ছম্ ছম্ করছিল, সহসা সে প্রশ্ন করলো—নৌকাটা যদি গুহার মধ্যে আটকে যায় সরোজবাবু ?

সরোজের মনেও যে সে আশঙ্কা জাগেনি তা নয়। তবে সনিকে সাহস দেবার জন্য সে বললো—তাহলে আমরা জলে নেমে চিৎসাঁতার কেটে ভাসতে ভাসতে যাব।

—কোথায় যাব ? নদী যদি পাতালে নেমে গিয়ে থাকে ?

—আমরাও পাতালে যাব।

—অর্থাৎ ডুবে মরে যাব ?

—সে যা হয় তখন দেখা যাবে !

—তখন আর কখন ? সে তো এখনি।

সরোজ সে কথার আর কোন উত্তর দিলে না, উত্তর দেবার মত কিছু ছিলও না।

সনি চুপ করে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে রইল, অন্যমনস্কভাবে নৌকা থেকে হাত বাড়ালো, বোধ হয় স্রোতের টান দেখবার জন্য। নদীর জলে হাত লাগাতেই সে চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিয়ে বলে উঠলো—জল বেজায় গরম,যেন ফুটছে !

সকলে একসঙ্গে জলে হাত দিয়েই হাত টেনে নিলে. সত্যি জল যেন ফুটছে।

বিনয়বাবু বললেন—এটি তাহলে একটা হট্ স্প্রিং—গরম জলের প্রস্রবন।

সনি বললো—আমরা কি তাহলে গরম জলে সিদ্ধ হয়ে মরবো নাকি ?

কেউ কোন জবাব দিলে না।

কিন্তু মুখে কিছু না বললেও উত্তরোত্তর গরমটা যেন বেশী বলে মনে হতে লাগলো। আর বুঝি নিঃশ্বাস নেওয়া চলে না। বুকে টান ধরে. মাথার

মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যাচ্ছে। বাতাস

বুঝি ফুরিয়ে গেল। সকলে অস্থির হয়ে উঠলো। দূরে যেন আগুন জ্বলছে মনে হলো।

সরোজ তখনও হাল ধরে ছিল। আর সে হাল ধরে থাকতে পারলো না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে হাত অবশ হয়ে এলো। সরোজ নৌকার হালের উপরেই মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো।

সবার আগে সরোজেরই জ্ঞান হলো। চোখ মেলে সে যা দেখলো তা তার বিশ্বাস হলো না। চোখ দুটিকে দুহাতে রগড়ে নিয়ে সে ভাল করে আরেকবার দেখলো না, সত্যিই! একখানি ঘরের মধ্যে একটি বিছানার উপর সে শুয়ে আছে। সাদা দেওয়াল। বেশ পরিচ্ছন্ন ঘর। একেবারে মেঝের উপর শুয়ে নেই, একখানি ক্যাম্প-খাটের উপর শুয়ে আছে। পাশেই একটি জানালা। বাইরে রোদ্র উজ্জ্বল মেঘমুক্ত নীল আকাশ। তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। সরোজ বেশ কিছুক্ষণ আকাশের পানে তাকিয়ে রইল। গত কয়েকটা দিনের দুর্ভাগ্যের কথা মনে হলো যেন একটা দুঃস্বপ্ন।

সরোজ উঠে বসলো। ওপাশে আরেকটি জানালার ধারে আরেকখানি ক্যাম্প খাটে বিনয়বাবু শুয়ে আছেন, বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু ডেভিড আর সানি গেল কোথায়? সবাই তো একই নৌকায় ছিলাম, তারা দু'জন গেল কোথায়? সরোজের উৎকণ্ঠা হলো, ডাকলো—বিনয়বাবু, ও-বিনয়বাবু!

কিন্তু সহজে কি আর বিনয়বাবুর ঘুম ভাঙে! দু'দিন পরে অমন আরামের ঘুম! অনেক ডাকাডাকি করার পর ঘুম ভাঙলো। ঘুম তো ভাঙলো, কিন্তু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বিনয়বাবু তাকিয়ে রইলেন ঘরখানির পানে,—কথা বলবেন কি! কিছুক্ষণ বাদে বিনয়বাবুর মুখ থেকে কথা বেরুলো—সরোজ, আমরা তাহলে বেঁচে আছি এ্যাঁ!

—তাতো আমিও দেখছি, কিন্তু ডেভিড আর সানিকে তো দেখছি না।

বিনয়বাবু উঠে বসলেন, বললেন ডেভিড আর সানি নেই? কোথায় গেল তারা? কে আমাদের বাঁচালে বল দেখি? এ কার বাড়ী?

—আমি এসব কিছু জানি না। চলুন আমরা দু'জনে বাইরে গিয়ে বাড়ীর কর্তার কাছ থেকে সব খবর নিইগে।

বেশ, তাই চল—বলে বিনয়বাবু সরোজের সঙ্গে বাইরে এলেন।

ঘরের চৌকাট পার হয়ে দু'জনে সবেমাত্র বাইরে বারান্দায় এসেছে এমন সময় বাঘের মত প্রকাণ্ড একটা বড় কুকুর তাদের পথ রুখে গর্জন করে উঠলো। তথাপি সরোজ সাহস করে যেই আরেক পা এগিয়েছে, অমনি কুকুরটা তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে আর কি! সরোজ তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলা। কুকুরটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে ঘ্যাক ঘ্যাক শব্দ করতে লাগলো।

সরোজ হতাশভাবে বললো—বাইরে যাওয়া নিষেধ।

বিনয়বাবু বললেন—থাক্ আর বাইরে গিয়ে দরকার নেই।

সরোজ হতাশভাবে বিছানার উপর বসে পড়লো। বললো—বাইরে বেরুবার দরকার আছে, কিন্তু উপায় নেই। আমরা পাছে বাইরে যাই সেইজন্য কুকুরটাকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। এতে এদের নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে'

বিনয়বাবু চিন্তিতভাবে বললেন – বিপদের বুঝি আর শেষ নেই, একটা পার হতে না হতেই আরেকটা এসে পড়ছে। ডেভিড আর সনির কি যে হলো···

বিনয়বাবুর কথা শেষ হবার আগেই একজন সাহেব এসে ঘরে ঢুকলো। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, রক্তবর্ণের চোখ দুটির পানে তাকালেই বেশ দুর্দান্ত লোক বলে মনে হয়। তবে জংলী নয়, সাহেব, এই যা ভরসা। সাহেব নমস্কার জানিয়ে বললো—গুড মর্ণিং—সুপ্রভাত!

তারপর পরিষ্কার ইংরাজীতে সাহেব জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা?

বিনয়বাবু বললেন আমরা চারজন···

সাহেব বললো – তা জানি, সে কথা বলছি না, আপনারা কোথাকার লোক তাই জিজ্ঞাসা করছি?

— আমরা দুজন বাঙালী—ভারতীয়।

—আর যে দু'জন ও-ঘরে রয়েছে?

—ওঃ, ওরা সনি আর ডেভিড, ওরা ইংরাজ। ওরা ভাল আছে সাহেব? কী বিপদের মাঝেই যে পড়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের নিয়ে চলুন ওদের ঘরে। কোন্ ঘরে ওরা আছে?

সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললো—না, ওদের ঘরে আমি আপনাদের যেতে দোব না। ইংরেজ আর ভারতীয় কখনও এক জায়গায় থাকতে পারে না। তোমরা — ভারতীয়রা বোমা মেরে বহু ইংরেজকে খুন করেছ, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন করে আমাদের দেশ ছাড়া করতে চেয়েছ, আজাদ হিন্দ ফৌজ করে আমাদের দুর্দিনে আমাদের বিপদকে আরো বাড়িয়ে তুলেছ, তোমরা সাপের মত বিষধর। আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না, কোন ইংরেজ কোন ভারতবাসীকে বিশ্বাস করতে পারে না।

সাহেবের চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে উঠলো। বিনয়বাবু চুপ করে গেলেন।

সরোজ শান্ত কণ্ঠে বললো—আপনি আমাদের উপর রাগ করছেন কেন সাহেব, আমরা তো আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি।

—ক্ষতি করনি কারণ সুবিধা পাওনি, সুবিধা পেলেই করবে।

সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রথম পরিচয় যে ভাবে হলো, তাতে সরোজ ও বিনয়বাবু বুঝলেন যে এই মানুষটির সঙ্গে বনিবনা হওয়া শক্ত, লোকটি সুবিধার নয়।

কিছুক্ষণ বাদে একটি লোক দু'খানি প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে এল। সে যে ঠিক কোন্ জাতের লোক তা বোঝা গেল না। খাবারের থালা

দু'টি সামনে রেখে ইংরাজীতে সে বললো—আপনাদের দু'জনের জন্যে খাবার—ঝোল আর রুটি।

লোকটি বেরিয়ে যাচ্ছিল, সরোজ তাকে ডাকলো—শোন!

লোকটি ফিরলো।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—তোমাদের কর্তার নাম কি বল তো? কোথাকার লোক?

- তা আমি জানি না। তবে মিশনারী সাহেব নামেই তিনি খ্যাত।

—এই জায়গাটার নাম কি বলত? কোথায় আমরা এসে পড়েছি?

ওদিক থেকে বিনয়বাবুও বলে উঠলেন—আচ্ছা, আমাদের আর দু'জন লোক কেমন আছে বলত?

লোকটি সভয়ে একবার ঘরের বাহিরের পানে তাকালো, তারপর ব্যস্তভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিল—সব ভাল, একটু বাদেই কর্তার মুখ থেকেই সব শুনতে পাবেন।

ত্রস্তপদে সে বেরিয়ে গেল।

সরোজ বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকালো। বিনয়বাবুও কেমন যেন ধাঁধায় পড়লেন। মুহূর্তেকে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে সরোজের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলেন—চিয়ার আপ্ মাই বয়! পরের কথা পরে, এখন তো পেট ভরে খেয়ে নাও!

দু'জন খেতে বসে গেল।

দু'জনেই চিন্তাচ্ছন্ন, কেউ আর কোন কথা বললো না।

খানিক পরে সেই চাকরটি একখানি চিঠি দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আগ্রহ-ভরে চিঠিখানি খুলে বিনয়বাবু পড়তে সুরু করলেন।

মহাশয়েষু—

আপনারা আমার আশ্রয়ে এসে উঠেছেন আপনাদের সেবা করতে সব সময়েই এ অধম প্রস্তুত আছে। আশ্রিতদের আমি দীক্ষা দিই, আপনাদের আমার কাছে দীক্ষা নিতে হবে—আমার এখানে এই নিয়ম। আজ সন্ধ্যায় আপনাদের দীক্ষা হবে। তৈরী থাকবেন, ইতি—

মিশনারী সাহেব

—ব্যাপারটা কি বলুন তো?- সরোজ বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকালো।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সনি আর ডেভিডেরই বা কি হলো, তাই ভাবছি। আর ভেবেই বা কি হবে? সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি! যে বুলডগটি দরজার কাছে বাঁধা আছে!

দুজনে জানালা দিয়ে বাহিরের আকাশের পানে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দু'জন লোক এসে বললো—চলুন, সাহেব ডেকেছেন।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লো।

প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন। দেখলেই বেশ বোঝা যায় সেকালের একটি পুরাণো গড়-বাড়ী। প্রাঙ্গনের একপাশে পাইক-বরকন্দাজদের থাকার জন্য ব্যারাকের সারি। ব্যারাকের সামনে একটি খুঁটির মাথায় কেরোসিনের আলো বসাবার জন্য একটা কাচের আলোকদান। ব্যারাকগুলি পার হয়ে পাঁচিলের প্রান্তে একটি ছোট ঘর, ঘরখানির মাথায় একটি ক্রুশ লাগানো আছে। সঙ্গী দু'জন সরোজ ও বিনয়বাবুকে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো।

সেখানি ঘর নয়, একটি গির্জা। দরজার সামনে দেয়ালের গায়ে একটি বেদী করা আছে। সাদা কাপড় দিয়ে বেদীটি ঢাকা। বেদীর উপরে একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মিশনারী সাহেব, তাঁর পরণে পাদ্রীর শুভ্র পরিচ্ছদ। সঙ্গী দু'জন এদেরকে বরাবর সাহেবের সামনে এনে পেঁৗছে দিলে। সাহেব দু'জনের মুখের পানে একবার তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলতে শুরু করলেন—তোমরা চার বন্ধু। দু'জন ইংরাজ আর দু'জন ভারতীয়—বাঙালী। ভারতীয় মাত্রেই পৌত্তলিক, তারা পুতুলের পূজো করে। তোমরাও পুতুলের পূজো কর। তোমাদের এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি দেবার জন্য ধরাধামে ঈশ্বরের পুত্র যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পথই একমাত্র ধর্মপথ, মুক্তির পথ, আলোকের পথ। তোমাদের সেই দিব্য পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছে। আমি খৃশ্চান মিশনারী, পরমেশ্বরের কৃপায় আমি তোমাদের জীবন রক্ষা করেছি, পরমেশ্বরের নির্দেশে আমি তোমাদের পৌত্তলিকতার মহাপাপ থেকেও রক্ষা করবো। পরম পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্! আ-মেন!

বিনয়বাবু সহসা প্রতিবাদ তুললেন—আমরা পুতুল পূজো করি একথা আপনাকে কে বললো? ওই যে যীশুর মূর্তি আপনি বেদীর উপর রেখেছেন, ওটি কি তাহলে পুতুল নয়?

সাহেব ধমক দিলেন—তোমরা অজ্ঞ, সংস্কার তোমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এগিয়ে এসো, দীক্ষা নাও, যীশুর কাছে প্রার্থনা কর।

বিনয়বাবু বললেন—না। আমি মরবো কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করবো না। আমার ধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো ধর্ম, পৃথিবীর সব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে হিন্দু ধর্মে। তোমাদের বাইবেলে যা আছে, আমাদের ধর্মে তার চেয়ে কম কিছু নেই।

—বাজে বকো না, এগিয়ে এসো।

—না।

—না? বটে!—সাহেব কাঁপতে কাঁপতে রুদ্ধ ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন—নিয়ে যাও, এক ফোঁটা জল অবধি দেবে না। পাপীরা জলাভাবে খাদ্যাভাবে শুকিয়ে মরুক—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।

যে দু'জন লোক সরোজ ও বিনয়বাবুকে নিয়ে এসেছিল, তারা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়েছিল, এবার এগিয়ে এসে দু'জনের হাত ধরলো। বিনয়বাবু ঝট্‌কা মেরে

হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। লোকটির হাতখানি যেন লোহা দিয়ে গড়া। সরোজ ও বিনয়বাবুর হাত ধরে তারা উপাসনা-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এবার আর তারা পুরানো ঘরে ফিরে এলো না। ব্যারাকের একখানি ঘরের মধ্যে দু'জনকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

ঘরখানি সত্যই আটক রাখার মত ঘর। একমাত্র দরজা ছাড়া বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দরজাটি বন্ধ হওয়া মাত্রই অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে গেল। সরোজ ও বিনয়বাবু কয়েক লহমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সরোজ হতাশভাবে বললো—নাঃ, এভাবে আর পেরে ওঠা যায় না। সারা জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আমাদের আর কোনমতেই যেন বেঁচে থাকতে দেবে না। একটার পর একটা সঙ্কট লেগেই আছে।

বিনয়বাবু বললেন—এবারকার সঙ্কটের জন্য অবশ্য আমিই দায়ী, কিন্তু ধর্ম-ত্যাগ করে আমি বাঁচতে চাই না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ!

সরোজ বললো—আমি আপনাকে দোষ দিই না। দোষ আমাদের অদৃষ্টের। নাহলে এই মিশনারী সাহেবের হাতে এসে আমরা পড়বো কেন?

বিনয়বাবু বললেন—ধর্মত্যাগ করতে হবে শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। যে ধর্ম প্রচার করার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করলাম, সে কি ধর্ম-ত্যাগ করার জন্য? সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার কথা আমার মনে ছিল না। তুমি না হয় সাহেবের কাছে দীক্ষা নাও, আমার কথা চিন্তা করো না, আমি ধর্মের জন্য মরবো তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই।

—তা হয় না বিনয়দা। হিন্দু ধর্মকে আমি আপনার চেয়ে কম ভালবাসি না। আপনার মতো ধর্মের জন্য অত পড়াশুনা না করে থাকতে পারি, তাহলেও আমি হিন্দু। আমার ধর্মের অপমান মানে আমার জাতির অপমান। ভারতবাসী মানেই হিন্দু। হিন্দু মানেই একটা নৈতিক ও সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সংস্কার।

—ঠিক তাই, ঠিক তাই। ভারতের যা কিছু ঐতিহ্য, সবই ধর্মের!

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, দু'জনে একপাশে দেয়ালের ধারে সরে গেল। পদশব্দ দরজার সামনে এসে থামলো। দরজা খোলার শব্দ হলো। দুটি লোককে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে তারা চলে গেল। বাহিরের পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কে?

—আমরা, সান ও ডেভিড।

কেউই আশা করেনি যে, এত শীঘ্র আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা এখানে এলে কি করে?

ডেভিড বললো—সে এক ব্যাপার। আজ সকালে মিশনারী সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা দু'জন কোন্ দেশের লোক? আমি তো

সেরেফ বলে দিলাম, ইংরেজ। বললো, 'আমরা খৃশ্চান কি না?' বললাম যে 'হ্যাঁ, আমরা খৃশ্চান।' শুনে সাহেব খুশিই হলো। সন্ধ্যাবেলা আমাদের নিমন্ত্রণ করলো উপাসনা-ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করার জন্য। উপাসনা-ঘরে যেতেই বললো, 'খৃষ্টের পা ছুঁয়ে শপথ করো যে আমি যা বলবো প্রাণ দিয়েও তা পালন করবার চেষ্টা করবে। আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করেছি, তোমরা আমার কাছে ঋণী।' আমরা তখনই রাজী হলাম। দু'জনে খৃষ্টের পা ছুঁয়ে শপথ করছি, এমন সময় পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠলো, 'সাহেব, এরা খৃষ্টের মূর্তি স্পর্শ করেনি।' সেই কথা শুনে সাহেবের দু'চোখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'আমার সঙ্গে চালাকি? শয়তান! এদের দু'জনকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে। অন্ন-জল দিও না। দু'দিন পেটে কিছু না পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপরেই এখানে আপনাদের সঙ্গে দেখা।

চার বন্ধু এখন পরস্পরকে কাছে পেয়ে ভারী আনন্দিত হলো। সামনে যে দুর্যোগই থাক, সে দুর্যোগ আর তাদের কাছে বড় বলে মনে হলো না।

পুরো একটি দিন অনাহারে কেটে গেল।

খাদ্যাভাবে তত কষ্ট হলো না, যত কষ্ট হলো জলাভাবে। কেমন যেন শরীরটা ঝিমঝিম করে।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পরে একজন লোক দরজা খুলে ভিতরে এলো. পিছনে আরেকজন দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে লোকটি ভিতরে এসে বললো—আপনাদের যেতে হবে, সাহেব ডাকছে!

সরোজ প্রশ্ন করল—চারজনেই?

—হ্যাঁ, চারজনই।

—চলো—বলে সরোজ এগিয়ে এলো তারপর লোকটি যেই বাহির হবার জন্যে পিছু ফিরেছে, অমনি সরোজ লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর, বিনয়বাবু তাকে সাহায্য করলেন। লোকটি একবার চীৎকার করার সুযোগ পর্যন্ত পেলে না। তার গলা টিপে ধরে দু'জনে তার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় দিয়ে তারই জামা ছিঁড়ে তার মুখ হাত বেঁধে ফেললো।

ওদিকে বাহিরে দরজার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল ডেভিড ও সনি ততক্ষণে তাকেও সেই অবস্থায় এনে ফেলেছে।

লোক দুটিকে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চারজনে বেরিয়ে পড়লো।

তখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। চারজনে একবার চারিপাশ দেখে নিলে। প্রাঙ্গণের পাঁচিলের একপাশে কয়েকটি বাঁশ পড়েছিল। সকলে সেইদিকেই গেলে। সরোজ ও ডেভিড দুটি বাঁশ তুলে দেয়ালের উপর হেলিয়ে রাখলো। তারপর চারজন সেই বাঁশ দুটি বেয়ে উঠে পড়লো পাঁচিলের উপর।

পাঁচিলের চারিপাশে পরিখা কাটা। পরিখা জলে পূর্ণ। অবশ্য পাঁচিলের

উপর থেকে জলে লাফিয়ে পড়া সোজা। কিন্তু তারপর? সাঁতরে তারা যাবে কতদূর? তার আগেই যদি সাহেবদের লোকেরা এসে ধরে ফেলে?

সহসা বিনয়বাবু বললেন—ওই দেখ তো, একটা ষ্টীম-লঞ্চ রয়েছে না?

সকলে দেখলো, সত্যই কিছুদূরে একখানি ষ্টীম-লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। সকলে পাঁচিলের উপর দিয়ে সেইদিকেই অগ্রসর হলো।

কিছুটা গিয়ে একটা মোড় ফিরতেই দেখা গেল—সামনেই নদী। পরিখার জল নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এবার নতুন উদ্দীপনায় চারজন আরো দ্রুত অগ্রসর হলো।

ষ্টীম-লঞ্চটি যেখানে ছিল, তার সামনেই গড়ের ফটক। ফটক তখন বন্ধ। ফটকের পাশ দিয়ে পাঁচিলটাকে শক্ত করার জন্য কয়েকটি বড় বড় খুঁটি পোতা ছিল। সেই খুঁটি ধরে অতি সহজে চারজন পাঁচিলের নীচে নেমে এলো। তারপর সাঁতরে ষ্টীম-লঞ্চে গিয়ে উঠতে তাদের দু'মিনিট সময় লাগলো না। লঞ্চে কোন লোক ছিল না। ডেভিড এরোপ্লেন ও মোটর চালাতে ভালই জানতো। ষ্টীম-লঞ্চের যন্ত্রপাতির দিকে একবার তাকিয়ে প্রথমে সে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করলো, তারপর সহসা ঝকঝক করে সাঁড়া তুলে লঞ্চের পিছনের চাকা ঘুরতে শুরু করলো—লঞ্চ চলতে শুরু করলো।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই লঞ্চখানি পরিখা পার হয়ে নদীতে গিয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময় দেখা গেল পিছনে পাঁচিলের মাথায় কয়েকটি মশালের আলো, সেই আলোর নীচে মানুষের কালো কালো ছায়া। সনি বললো—ওরা আমাদের দেখছে!

পরক্ষণেই গুম্ গুম্ করে গুলি ছোড়ার শব্দ হলো। প্রতিধ্বনিতে চারিদিক কেঁপে উঠলো—গুম্ গুম্ গুম্!

নদীর জলে লঞ্চের আশে-পাশে কয়েকটা গুলি এসে পড়লো। বিনয়বাবু বললেন—সাবধান!

সরোজ বললো—আর ভয় করি না।

ডেভিড বললো—গুলিই করুক আর যাই হোক্, এখন আমরা নিরাপদ। অন্ধকারে ওরা কিছুতেই লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারবে না।

বিনয়বাবু বললেন—কিন্তু আমরা যাবো কোন্ দিকে? এটা তো একটা নদী, শেষে আবার জংলীদের আড্ডায় ফিরে যাবো না তো?

সরোজ বললো—কিছুদূর গিয়ে, তারপর মোটর বন্ধ করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই হবে, ঠিক সমুদ্রে পড়বো, তারপর দিক ঠিক করা যাবে।

কথাটায় যুক্তি ছিল। প্রথমই কিছু না জেনে-শুনে অযথা সব পেট্রল খরচ করা ঠিক হবে না। মিনিট দুয়েক যাবার পর ষ্টীম-লঞ্চের মোটর বন্ধ করে দিয়ে তারা স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিলে।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও সরল।

প্রত্যুষে যখন সূর্য উঠলো, তার আগেই তারা সাগরে এসে পড়েছে। দ্বীপের

রেখা পিছনে হারিয়ে গেছে চারিপাশে শুধু থৈ থৈ করছে অসীম জল, বাতাসে দোল খাচ্ছে দিক্‌সীমা অবধি।

এখন মাথার উপর সূর্য আছে, দিক্ নির্ণয় করা সহজ। বিনয়বাবু বললেন—পশ্চিমে চালাও, চীনদেশের কোথাও না কোথাও পৌঁছানো যাবে।

সরোজ বললো—যদি পেট্রলে না কুলায়?

বিনয়বাবু বললেন—তার আগেই আমরা কোন জাহাজের দেখা পেতে পারি। চালাও—

সরোজ এবার পুরোদমে লঞ্চ ছোটালো পশ্চিমে।

অদৃষ্ট এবার সুপ্রসন্ন বলতে হবে, কিছুদূর যেতেই দিগ্বলয়ের গায়ে জাহাজের ধোঁয়া দেখা গেল। জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে বিশেষ দেরী হলো না। একেবারে ভারতীয় জাহাজ। আশ্রয় পেতে বিলম্ব হলো না।

ক্যাপ্টেন সব শুনে বললেন—চীন সাগরে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে, ওখানে বোম্বেটেদের আড্ডা, জংলী ধরণের কিছু কিছু আদি অধিবাসীও ওখানে থাকে। তারই কোন একটা দ্বীপে আপনারা গিয়ে পড়েছিলেন।

বিনয়বাবু বললেন—থাক্, অতীতের কথা ভেবে আর লাভ নেই। এবার তো নিরাপদে নিজের দেশে গিয়ে পৌঁছাব ওঁম্ তৎসৎ, ওঁম্ তৎসৎ!

———

—এক—

তর্ক চলছিল।—

সরোজ জোর গলায় বললে—গান্ধীকে এ যুগের যীশুখৃষ্ট বললেও চলে !

ডেভিড বললে—যীশুখৃষ্টের সঙ্গে গান্ধীর তুলনা চলে না, কিসে আর কিসে !

সরোজ টেবিল চাপড়ে বলে উঠলো—গান্ধী তখনকার দিনে জন্মালে যীশুখৃষ্টের মতই পূজ্য হতেন।

—কখ্খনো নয়—ডেভিড বললে।

সরোজ বললে—নিশ্চয়ই।

তর্কের খাতিরে শেষ পর্যন্ত হয় তো দু' বন্ধুর মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যেতো ! কিন্তু তর্কটা ততদূর জমে ওঠার আগেই বিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতে কাগজে মোড়া একখানি বড় ছবি।

সামনের একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে হাতের ছবিখানি টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন—আজ ভারী ঠকে গেলাম কিন্তু !

সরোজ আর ডেভিড একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো—কেন ? কি হলো ?

বিনয়বাবু বললেন—অক্সন মার্টে গিয়েছিলাম আজ নীলাম দেখতে। গিয়ে দেখি এই ছবিখানা সেল হচ্ছে। বিশেষ বিশেষত্ব কিছুই নেই, তবে চোখদুটো যেন সত্যিকারের মানুষের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। ছবিতে অমন চোখ দেখা যায় না। দেখে ছবিখানি কেনার জন্য আমার ভারী ইচ্ছা হলো, আমিও নিলাম ডাকলাম। পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত তখন ডাক উঠেছে। ক্রমে ক্রমে যখন দুশো টাকায় গিয়ে উঠলো তখন একে একে সবাই ডাকা বন্ধ করলে শুধু একজন বাঙালী ভদ্রলোক ছাড়া—ছবিখানি কেনার ইচ্ছা তার খুব। আমার সঙ্গে সে সমভাবে ডেকে চললো। আমি যত ডাক দিই, সে তার চেয়েও বেশী ডাক দেয়। আমি গোঁ ধরলাম যে ছবিখানা আমি কিনবই। শেষে দু' হাজার দুশো একান্ন টাকা দিয়ে ছবিখানা কিনে নিলুম।

সরোজ বললে—দু'হাজার দুশো একান্ন টাকা দিয়ে একখানা বাজে ছবি কিনলেন ?

বিনয়বাবু হেসে বললেন—তখন তো আর সে খেয়াল ছিল না। তখন গোঁ ধরেছিলাম যে ছবিখানি কিনবই।

—কোন বড় আর্টিস্টের ছবি নয় তো?—ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো।

—এ কোন বড় আর্টিস্টের ছবি কিনা ঠিক করে তা বলা শক্ত! তবে বিলাতে থাকার সময় শুনেছিলাম—কে একজন বিখ্যাত ফ্লেমিশ আর্টিস্ট শেষ জীবনে একখানি ছবি আঁকেন, যার চোখ দুটি নাকি জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলতো জীবন্ত মানুষের মতো। ছবিখানাকে ভাল করে রং চং দিয়ে শেষ করার আগেই আর্টিস্ট মারা যান, গোলযোগের মধ্যে ছবিখানিও কোথায় হারিয়ে যায়। এই ছবির চোখ দুটির পানে তাকিয়ে আমার সেই ছবির কথাই মনে পড়ে গেল। চোখ দুটির পানে একবার তোমরাই দেখ না—

ছবিটার প্যাকিং কাগজখানি খুলে ফেলে বিনয়বাবু, সরোজ আর ডেভিডের দিকে ছবিখানা এগিয়ে দিলেন।

এক কিপটে বুড়ো এক থলি মোহর মাটির উপর ঢেলে লোলুপ দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে আছে। সাদা দাড়ীতে মুখ ভরে গেছে, এক মাথা সাদা চুল, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কিন্তু মোহরগুলোর পানে তাকিয়ে চোখ দুটি তার জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে জীবন্ত মানুষের মতো। ছবির যে এমন চোখ থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারা যায় না।

সরোজ আর ডেভিড কতক্ষণ থ' হয়ে চেয়ে রইল ছবিখানার দিকে। প্রশংসায় মন ভরে উঠলো। এমন চোখ না আঁকতে পারলে কিসের আর্ট।

সনি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে সকলে কি একখানা ছবি দেখছে। জিজ্ঞাসা করলো—কিসের ছবি কাকা?

সনি সকলের উপর ঝুঁকে পড়লো। কতক্ষণ ধরে ছবিখানাকে দেখে সে বললে—ছবির বুড়োটা আমাদের পানে যেন চেয়ে আছে! এটা কার ছবি কাকা?—কোন ঘরে টাঙাবেন?

বিনয়বাবু হেসে বললেন—তুমি বল কোন ঘরে টাঙাবো?

—আমার পড়ার ঘরে টাঙিয়ে দিন, চোখদুটো দেখে সবাই অবাক হবে।

—'সবাই' মানে তোমার বন্ধুরা তো? বেশ তাই হবে!

সন্ধ্যাবেলা ছবিখানা সনির পড়ার ঘরেই টাঙিয়ে দেওয়া হলো।

—দুই—

সন্ধ্যার পরে পড়তে পড়তে বইয়ের উপর মাথা রেখে সনি কখন ঘুমিয়ে পড়লো। বিকালে অত ছুটোছুটি করে ফুটবল খেলার পর বসে বসে বেশীক্ষণ পড়া যায় কখনও!

পড়তে বসে কিছুক্ষণ সনি ছবিখানির পানে তাকিয়েছিল। ওই ড্যাব্‌-ড্যাবে চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে তাকিয়ে মন যেন ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে।

জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো জ্বলে উঠে এখনি বুঝি তাকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করে ফেল্‌বে। সনির কেমন যেন অস্বস্তি মনে হয়। ছবিখানার পানে তাকিয়ে থেকেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সনি স্বপ্ন দেখ্‌লে।

স্বপ্ন দেখলেঃ ছবির বুড়ো লোকটা সত্যিকারের মানুষ হয়ে ছবি থেকে নেমে এলো। ছবির ফ্রেমখানা সে হাতে নিয়েই নেমে এলো। নীচে এসে তার চেয়ারটার পাশে মেঝের উপর বসে পড়ে ফ্রেমখানাকে সে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেললো। ফ্রেমটা ফাঁপা। মেঝেতে ঢালতেই ফ্রেমটার ভিতর থেকে অনেকগুলি হীরা বেরিয়ে পড়লো। অনেক হীরা। বুড়ো একটীর পর একটী যত্ন করে দেখে দেখে গুনতে শুরু করে দিলে। গুনতে গুনতে হঠাৎ বুড়োর নজর পড়লো সনির ওপর। আর বুড়োর গোনা হলো না, তাড়াতাড়ি হীরাগুলো হাতে তুলে নিয়ে সনির পানে তাকিয়ে বললে—নেবে? নাও না?

সনির লোভ হলো, তাড়াতাড়ি সে হাত বাড়ালে, বললে—দাও।

—ইস্‌, এত সহজ কি না!

তাড়াতাড়ি ফ্রেমটার মধ্যে হীরাগুলো রেখে বুড়ো হিহি করে হাসতে সুরু করলে।

কি বিশ্রী খন্‌খনে হাসি!

ছ্যাঁৎ করে সনির ঘুম ভেঙে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সনির মনে হলো কে যেন তার মাথার উপরে একটা হাত রাখলে—ভুত নাকি! সনির বুক দুর দুর করে উঠলো, ধড়মড় করে উঠে সে পিছনে মুখ ফেরালে।

—ফরর্‌ ফরর্‌ ফ—ররর…

ঘাড় ফেরাতেই মাথার উপর থেকে একটা চামচিকে উড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো।

ওঃ চামচিকে! কারুর হাত নয় তাহলে। সনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু উড়ন্ত চামচিকেটার পানে তাকিয়ে তার মনে পড়লো, ভুতেরা অনেক রকম দেহ ধরে বলে সে শুনেছে, ওই চামচিকেটা তাই নয়তো? এদ্দিন এই ঘরে সে পড়ছে, কোনদিন তো চামচিকে ঢোকে নি। আজই বা এলো কোত্থেকে? তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে আলো নিভিয়ে সনি উপরে চলে গেল খেতে।

খেতে খেতে নানা কথার আলোচনা হয়।

সেদিনও দু একটি কথা হচ্ছিল, সহসা কোন ফাঁকে ফস্‌ করে সনি বলে ফেললে—নতুন ছবিখানার সম্পর্কে এখনি একটা মজার স্বপ্ন দেখলুম।

—স্বপ্ন দেখ্‌লে? পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি?—সরোজ বললে।

—হ্যাঁ, পড়তে পড়তে কখন যে বইয়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছি

জানি নে। তা' সে কতক্ষণই বা, কিন্তু তারই মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলুম ; ভারী মজার স্বপ্ন কিন্তু।...

—কী ?

সকলে সনির মুখের পানে তাকালো।

— যার ছবি, দেখলুম সেই বুড়ো লোকটা ছবি থেকে নেমে এলো। নীচে এসে আমার পাশে সে বসলো। গোড়ায় আমায় দেখতে পায়নি। হাতে ছিল তার ওই ছবির ফ্রেমখানা—বলে সনি স্বপ্ন-কাহিনী বলতে সুরু করলে।

সব শুনে বিনয়বাবু হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন —এ-ই ! এ শুধু তোমার মস্তিষ্কের আলোড়ন। তুমি ক'দিন সহরে থেকে একেবারে সহুরে হয়ে পড়েছ, নাহ'লে জংলীদের খপ্পরে পড়ে তুমি একটাও স্বপ্ন দেখনি, আর এই একখানা সামান্য ছবির জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখেই স্বপ্ন দেখতে সুরু করে দিয়েছ ! যাক্‌গে, ও-ছবি কাল সকালে খুলে নিয়ে আমার ঘরে টাঙিয়ে দোব'খন।

বিনয়বাবুর কথায় সনি লজ্জিত হয়ে খাবারের উপর ঝুঁকে পড়লো।

—তিন—

রাত তখন প্রায় বারোটা হবে।—

সারা শহর স্তব্ধ, নিঝুম। কোন বাড়ী থেকে এতটুকু শব্দ নেই, কোন জানালা দিয়ে এতটুকু আলো ভেসে আসছে না। সরু পথটার দু'ধারে দু'সারি

বাড়ী ঘুমন্ত দৈত্যের মত পড়ে আছে। আলোর পোষ্টগুলো একা একা দাঁড়িয়ে আছে, দৈত্যের হাতে এক এ গাছি লাঠির মত। রাত্রির সেই থমথমে ভাবটা সহ্য করতে না পেরে, মাঝে মাঝে এক একটি কুকুর 'ঘেউ' 'ঘেউ' করে চীৎকার করে তাদের অভিযোগ জানাচ্ছে।

স্তব্ধ নিশুতি রাত।

খট্ করে দরজা খোলার শব্দ হলো। নিঃশব্দে সরোজ নিজের ঘর থেকে বাহির হয়ে এলো। অন্ধকার বারান্দা দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি পার হয়ে নীচে এসে ঢুকলো সনির পড়ার ঘরে। হাতে ছিল একটি টর্চ। তারই আলোয় নিঃশব্দে একখানা চেয়ার দেওয়ালের পাশে এনে, তার উপরে উঠে, সেই ছবিখানা নামিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তেমনি নিঃশব্দে সনির পড়ার ঘরে এসে, ছবিখানা যেখানে ছিল সেইখানেই টাঙিয়ে রেখে গেল।

সরোজ সবেমাত্র নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে, বাইরে তখন কালো পোষাক-পরা দুটী লোক দাড়ির সিঁড়ি খাটিয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে নামার ব্যবস্থা করছে। একটু চেষ্টা করেই দড়ির সিঁড়িটা তারা পাঁচিলে আটকে ফেললে। তারপর সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আরেকটা দাড়ির সিঁড়ি ভিতরদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে, তারা ভিতরে এসে নামলো। একহাতে তাদের টর্চ, আরেক হাতে একটা করে পিস্তল।

বাড়ীটার কোথাও যেন তাদের অজানা নেই। টর্চের আলোয় দেখতে দেখতে বরাবর তারা দুজনে সনির পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই প্রথম আলো ফেলে একবার দেয়ালের সব ছবিগুলি তারা দেখে নিলে। জ্বলজ্বলে চোখওয়ালা ছবিখানার উপর আলো পড়তেই লোক দুটীর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একজন অপর জনকে বললে—ওই চেয়ারখানার উপরে উঠে ছবিখানা পেড়ে নে নিধে!

নিধে ছবিখানি পেড়ে নিলে।

কিন্তু ছবিখানা হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে নামতে গিয়েই বাধলো বিভ্রাট। নিধের জামাটা চেয়ারের হাতলে বেধে চেয়ারখানা ঠকাস্ করে উলটে পড়লো।

শব্দটা খুব জোরে না হলেও লোকের ঘুম ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট। নেপালী চাকরটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে মানুষের মত কালো কালো কারা যেন ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

ভুত নাকি? নেপালী ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে চোখ বুজলো, গায়ত্রী জপ করার জন্য পৈতে খুঁজতে সুরু করে দিলে। নিধে আর তার সঙ্গী তার সামনে দিয়ে চলে গেল। তাদের পায়ের শব্দ শুনেও কিন্তু নেপালী চাকর চোখ খুললো না, তখনও সে পৈতে খুঁজছে।

—চার—

সকালে পড়ার ঘরে এসে সনি দেখলে ছবিখানা নেই।

তিন বন্ধুতে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে গল্প করছিল, সনি এসে জিজ্ঞাসা করলে—আমার পড়ার ঘর থেকে নতুন ছবিখানা আপনারা কেউ খুলে এনেছেন?

—নতুন ছবিখানা? না তো! সেখানা তোমার ঘরে নেই?—বিনয়বাবু অবাক্ হয়ে গেলেন।

—না। সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—কই, চল দেখি—বলে বিনয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

সরোজ বিনয়বাবুর হাত ধরে বসালে, বললে—বসুন, অনর্থক দেখতে গিয়ে কোন লাভ হবে না। সে ছবি চুরি যাবে তা আমি আগেই জানতুম।

—জানতে তো আগেই আমায় জানাওনি কেন? সওয়া দু' হাজার টাকা দামের ছবি!

—কিন্তু তার জন্য আপনার বিশেষ কোন লোকসান হয়নি, ছবিখানি চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারা ঠকেছে!

—কী রকম?

মানে, ছবিখানা যেজন্য তারা চুরি করেছে, তা তারা পায়নি।

সকলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এবার সরোজের মুখের পানে তাকালো। সরোজ বললে—ছবিখানির মধ্যে একটা-কিছু ছিল, না হ'লে একজন অচেনা অজানা আর্টিস্টের ছবির জন্য দু' হাজার দু'শো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত কেউ দর দেয় না।

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না না, একেবারে বাজে ছবি নয়, বাজে আর্টিস্ট কি অমন একজোড়া চোখ আঁকতে পারে?

—ও চোখ দুটো বাজে, সবটা শুনুন আগে তাহলেই বুঝতে পারবেন—বলে সরোজ বলতে সুরু করলে—সনি যখন কাল রাত্রে খেতে বসে স্বপ্নের কথাটা বললে, যে ছবির মানুষটী ফ্রেমের মধ্যে থেকে হীরা-জহরৎ বের করে গুনছে, তখনই আমার মনে সন্দেহ হলো, অনেক রাত পর্যন্ত ভেবে দেখলুম যে ছবির ফ্রেমটী একবার খুলে দেখলে মন্দ হয় না। তাই তখনি সনির পড়ার ঘরে গিয়ে ছবিখানা খুলে আনলাম। ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় ভাল করে দেখতে দেখতে ফ্রেমের এক কোণে একটা টিপ্‌কল নজরে পড়লো। সেটার উপর আঙ্গুলের একটু চাপ দিতেই ফ্রেমখানা খুলে গেল। দেখি কি, ভিতরটা পাইপের মত ফাঁপা। উল্টে ধরতেই টুপ্ টুপ্ করে কতকগুলি হীরে মেঝের উপর পড়লো। একে একে সব ঢেলে ফেললুম। গুনলাম। একশো একুশ-খানা আছে। ড্রয়ারের মধ্যে হীরেগুলি রেখে ফ্রেমটী আবার ছবির সঙ্গে

ফিট্ করে টাঙিয়ে রেখে এলুম। ছবিখানির উপর যে-দলের নজর ছিল, তারা তারপরে ছবিখানা চুরি করে নিয়ে গেছে, কাজেই তারা ঠকেছে।

সানি জিজ্ঞাসা করলে—আর ওই চোখদুটো ?

—ওঃ, ওই চোখ দুটো ? ও কোন বড় আর্টিষ্টের আঁকা-টাকা কিছুই নয়, শুধু ওর মণি দুটিতে দু'খানি হীরে বসানো আছে বলেই অমন জ্বল্‌জ্বল করছে। ওই চোখ দেখেই ছবিটা চেনার সুবিধে হয়েছে।

—হীরেগুলো কই, দেখি ?—বিনয়বাবু বললেন।

—এই যে—বলে সরোজ টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজের মোড়াক বের করলে। খুলে ফেলতেই জ্বলজ্বলে ঝক্‌ঝকে সব হীরা চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। সকলে হীরাগুলির পানে চেয়ে রইলো, সরোজ গুনতে সুরু করলে—এক দুই—তিন—

শাঁ……ঠক্……ঠক্—

সহসা কোথা থেকে একটা তীর এসে সামনের দেওয়ালে লেগে মেঝেতে পড়ে গেল।

—পাঁচ—

সকলে চমকে উঠলো।

সরোজ তীরটা তুলে নিলে। তীরে একখানি কাগজ গাঁথা।

সরোজ কাগজখানা খুলে নিলে। সাধারণ সাদা কাগজ নয়, একখানি চিঠি। ভাঁজ খুলে সরোজ চিঠিখানা পড়ে নিলে। সকলে চারিপাশ থেকে ঝুঁকে পড়লো, কিসের চিঠি, কার চিঠি জানবার জন্য।

সরোজ চিঠিখানা এবার সবাইকে শুনিয়ে পড়লো—

বিনয়বাবু,

হীরাগুলি আমাদের চাই-ই। আজ সন্ধ্যাবেলা কাগজের একটা মোড়ক করে হীরাগুলি বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে রাখবেন। আর এই চিঠি পাবার পরেও যদি হীরাগুলি ফিরিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে বিশেষভাবে বিপন্ন হবেন, তা আগে থেকেই জানিয়ে দিলাম। ইতি—

শেষে কারও নাম নেই। চিঠিখানা কে লিখলে তা জানার কোন উপায় নেই।

চিঠি শুনে ঘরের মধ্যে সবাই কিছুক্ষণ থ' হয়ে রইল।

জানালা দিয়ে তীরটা এসেছিল দেখে ডেভিড তাড়াতাড়ি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো: পথ ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। ডেভিড জানালার সামনে থেকে ফিরে এলো, বললে—তীরটা ছুঁড়েই ব্যাটা পালিয়েছে!

সরোজ হাসলে, বললে—তবে কি আমাদের কাছে ধরা দেবার জন্যে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ?

সরোজের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে বিনয়বাবু বললেন—একখানা চিঠি দেখে ভয় পাবার ছেলে আমি নই, হীরে ফিরিয়ে দাও বললেই অমনি দিচ্ছি কিনা !

ডেভিড টেবিলের উপর থেকে একখানি হীরা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে—এমন বড় বড় একশো একুশখানা হীরে. কত দাম হবে আন্দাজ করতো।

সরোজ বললে—তা হাজার পঞ্চাশ হবে।

—এর মধ্যেই তো শত্রুরা পিছনে লেগেছে, এগুলির সদ্গতির ব্যবস্থা কি করা যাবে বল দিকি ?—ডেভিড বললে।

—আজই এগুলি আমি ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসি। তারপর কিছুদিন পরে ব্যাঙ্কের মারফতে বিক্রী করার ব্যবস্থা করলেই হবে, আপনার কি মনে হয় ?—সরোজ বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকালো।

বিনয়বাবু বললেন—আমি আর কি বলবো, তুমি যা ভাল মনে কর, তাই কর। তবে যখন শত্রু একটা জুটেছে, তখন ও-গুলোকে বাড়ীতে রাখা আর নিরাপদ নয়, ব্যাঙ্কে জমা দেওয়াই ভাল।

ডেভিড বললে—আমারও সেই মত।

সরোজ ছোট একটি ক্যাশবাক্সে হীরাগুলি রেখে চাবি বন্ধ করলে।

—ছয়—

দুপুর বেলা।—

হীরাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে সরোজ মোটরে করে ফিরলো। গলির মোড়ে মোটর থামলে. ড্রাইভারকে গাড়ী গ্যারেজে তুলে রাখতে বলে, মোটর থেকে নেমে সরোজ গলির মধ্যে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় কোথা থেকে দু'জন লোক ছুটে এসে সরোজকে জড়িয়ে ধরে, নাকের উপর একখানি রুমাল চেপে ধরলো।

রুমালখানায় ক্লোরোফর্মের তীব্র গন্ধ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আত্মরক্ষা করার জন্য তাড়াতাড়ি সরোজ যুযুৎস্থর একটা প্যাঁচ মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু সহসা তার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো, সে ঢলে পড়লো।

ড্রাইভার তখন সবেমাত্র মোটর ছাড়তে যাচ্ছে, ব্যাপার দেখে ছুটে সে মোটর থেকে নেমে এলো। নেমে এসেই যে দু'জন সরোজকে জাপটে ধরেছিল, তাদের একজনের মুখের উপর সজোরে একটি ঘুঁসি মারলো।

লোকটি যেন তৈরী ছিল। চট্ করে সরে গিয়ে ঘুঁসিটা পাশ কাটিয়ে, শিখ ড্রাইভারের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো।

তারপরেই একটা যুযুৎস্থর প্যাঁচ—

পরমুহূর্তেই দেখা গেল, ড্রাইভার মাটীর উপর চিৎ হয়ে পড়েছে, আর তার বুকের উপর বসে সেই লোকটি। সঙ্গে সংগে পকেট থেকে আরেকখানি ক্লোরো-

রুমের রুমাল বের করে সে ড্রাইভারের নাকের উপর চেপে ধরলো। বার দুয়েক ঝট্‌কা দিয়ে, রুমালখানা সরাবার চেষ্টা করে ড্রাইভারও স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেল।

অপর লোকটা ততক্ষণে সরোজকে মোটরে তুলে ফেলেছে। এঁকে ডেকে সে বললে—নিধে, আয় উঠে আয়, ও শিখ্‌ ব্যাটা থাকগে ওখানে পড়ে।

অজ্ঞান শিখ ড্রাইভারটাকে ফেলে রেখে নিধে মোটরে উঠে এলো।

মোটর ছেড়ে দিলে।

গলির ভিতরে এতখানি ব্যাপারের এতটুকু কেউ টের পেলে না।

তার একটু পরের কথা।—

সরোজের প্রতীক্ষায় বিনয়বাবু বসে বসে বই পড়ছিলেন। অনেকক্ষণ সরোজ ব্যাঙ্কে গেছে। এইবার ফিরবে। ফিরলেই একহাত দাবা খেলা যাবে।...

হঠাৎ বাহিরে গলিতে একটি হৈ-চৈ গণ্ডগোলের শব্দ তাঁর কানে এলো। কি—না—কী ভেবে বিনয়বাবু বইয়ের মধ্যে মন বসাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পড়ার উপায় কই! হৈ-চৈ ক্রমে বেড়ে উঠে কানে এসে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।

বই রেখে বিনয়বাবুকে উঠতে হলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় নেপালী চাকর এসে জানালো—বাবু, পাড়ার এক্‌ঠো আদ্‌মি আপনাকে বোলাচ্ছে!

—বাইরে লোক ডাকছে? বিনয়বাবু বললেন—উস্‌কো উপরমে বোলাও!

চাকর যাকে নিয়ে এলো সে সনির বন্ধু, মুখ চেনা। ছেলেটি বিনয়বাবুকে দেখে বললে—আপনাদের শিখ ড্রাইভারটা গলির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তাই খবর দিতে এলাম।

—কে ?—রালা সিং ?

—হ্যাঁ।

—তাই এত গোলমাল হচ্ছে বুঝি ?—তা সরোজ কি করছে ? সে তোমার সাহায্যে তাকে বাড়ীর মধ্যে তুলে আনলে পারতো !

—সরোজবাবু তো নেই।

—সরোজ নেই ? এই তো ঘণ্টাখানেক আগে রালা সিংয়ের মোটরে সে গেছে, চল দেখিগে—বলে বিনয়বাবু এগোলেন। নীচে নামতে নামতে কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন—মোটরখানা গলির মোড়ে আছে, দেখলে ?

—কই, না তো ?

এইবার বিনয়বাবুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সরোজের জন্য তাঁর আশঙ্কা হলো।

গলির মুখে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে বিনয়বাবু দেখলেন, রালা সিং অজ্ঞান হয়ে পথের উপর পড়ে আছে, আর চারিপাশে লোক—যেটুকু হাওয়া এলে তার জ্ঞান হতে পারে—তা'ও আটক করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটির পানে তাকিয়ে বিনয়বাবু বললেন—একটু ধরবে ভাই ? ওকে বাড়ীতে নিয়ে যাই।

ছেলেটী সামনের লোকগুলিকে সরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ড্রাইভারের মাথার দিকটা ধরলো।

চারিপাশের ভীড় থেকে তখন অবিশ্রাম প্রশ্ন হচ্ছে ঃ

—আপনাদের লোক বুঝি ?

—কী করে অজ্ঞান হলো ?

—আহা, বেচারার সর্দি'গর্মি' হয়েছে বুঝি ?

এমনি আরো কত কথা।

বিনয়বাবু কারও কথার কোন জবাব দিলেন না। দু'জনে মিলে রালা সিংকে ধরে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে সোফায় শুইয়ে দিলেন। তারপর ছেলেটীর মুখের পানে চেয়ে বললেন—ভাই, আরেকটু উপকার করতে পারবে ?

—কি ? বলুন।

—ডাক্তারবাবুকে একবার ছুটে ডেকে আনতে পারবে ?

—ওঃ, এ-ই !—বলে ছেলেটী ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিনয়বাবু ফোন ধরলেন।

ডোভিড চাকরী করে, বিনয়বাবুর ফোন পেয়েই কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আপিস থেকে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।

—সাত—

ঘুটঘুটে অন্ধকার !—এ কোন্ জায়গায় সে এসে পড়লো ?

চোখ দু'টী ভাল করে রগড়ে নিয়ে সরোজ উঠে বসলো।

চারপাশে জমাট অন্ধকার। একি! মাটির উপর পড়ে পড়ে সে ঘুমোচ্ছিল? জুতোটা পর্যন্ত খোলেনি? ইস্, কি গুমোট্! ঘামে জামা কাপড়গুলো যে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে! এত অন্ধকারই বা হলো কেমন করে? এ সে কোথায় এসে পড়লো? ওঃ—হয়েছে—হয়েছে—

সরোজের সব কথা মনে পড়লো। মনে পড়লোঃ হীরাগুলোর কথা—ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার পথে শত্রুদের আক্রমণের কথা···তারপর?

তারপর এই অন্ধকার ঘরে সে এখন বন্দী হয়ে আছে। এতটুকু আলো আসার কোন পথ নেই। অবিরাম নিঃশ্বাস নিতে নিতে এই ছিদ্রহীন ঘরের অক্সিজেন্ হয়তো ফুরিয়ে যাবে, মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসবে জীবনের বুকে। সনি, ডেভিড, বিনয়দা, কেউ এতটুকু খবরও পাবে না।

ভাবতে ভাবতে সরোজ অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলে, আর কোঁচার কাপড়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে লাগলো। তার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জুতোর শব্দ হতে লাগলো—মস্—মস্—মস্।

সরোজের মাথার উপর ছাদে তখন শব্দ হচ্ছিল—খস্ খস্ খট্ খট্! —খটাং—ঠং—

শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা এক ঝলক আলো এসে পড়লো একেবারে সরোজের মুখের উপর। চমকে উঠে সরোজ উপরে তাকালো, দেখলো ছাদের

খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেছে, সেখান থেকে টর্চের আলো এসে পড়েছে

নীচে, একেবারে তার মুখের উপর। সরোজ আলোর সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো একপাশে। ফাটলের ওপাশে দুটি লোকের মুখ দেখতে পেলে। একজনের হাতে টর্চের আলো। আলোটী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার সে সরোজের মুখের উপর ফেললো, বললে—সরোজবাবু শুনচেন ?

নাম ধরে ডাকতে দেখে সরোজ প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেল, তারপর বললে—কী ?

—এখন কেমন আছেন, একটু ভাল মনে করছেন কি ?

কথা শুনে সরোজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। লোকটি নাগালের মধ্যে থাকলে তার গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে সে বলতো, —এখানে লোকে কেমন থাকে তুমি জান না ? কিন্তু লোকটি তখন হাতের নাগালের বাইরে, কাজেই সে চুপ করে রাগে গস্-গস্ করতে লাগলো।

সরোজের মনের ভাব লোকটি কেমন করে জানিনা জানতে পারলো যেন··· হিহি করে হেসে বললে—এখন কেমন আছেন, বুঝছেন তো ? ওই জন্যেই চিঠিতে লিখেছিলাম হীরেগুলো আমাদের দিয়ে দিতে, তা তো দিলেন না, সেগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলেন, এখন বুঝুন তার সুখ !

সরোজের অসহ্য মনে হলো, বললে —তোমরা কি বলতে চাও, বল তো দেখি ?

লোকটা হি-হি করে হেসে উঠলো, বললে—না, এমন কিছুই নয়, শুধু বলছিলাম কি ব্যাঙ্কের ফর্মে একটি সই করে কেসিয়ারকে একখানি চিঠি লিখে দিন যাতে হীরেগুলো আমরা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে পারি। তা হলেই এখান থেকে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে ।

সরোজ গম্ভীর ভাবে বললে—যদি না লিখে দিই ?

—তাহলে মাটির নীচে এই ঘরে আপনাকে পচে মরতে হবে। যে হীরের লোভ আপনি করছেন, সে হীরে আপনার জীবনে আপনি কোনদিন দেখতে পাবেন না।

—বটে ! তাহলে তোমরাও জেনে রেখো যে মরণকে আমি ভয় করি নে, ভয় দেখিয়ে সরোজ সরকারের কাছ থেকে তোমরা একখানা হীরেও আদায় করতে পারবে না।

—আচ্ছা, দেখবো আপনার কথা কতক্ষণ থাকে !

—তাই দেখো, মরতে হয় মরবো, কিন্তু এক কলমও লিখবো না—বলে সরোজ রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে সুরু করে দিলে—মস্ মস্—মস্‌মস্ !

উপরে ঘটাং করে ছাদের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশে আবার সেই আগের মতই অন্ধকার !

—আট—

রাত তখন প্রায় দশটা।

সীন, ডেভিড ও বিনয়বাবু পরিশ্রান্ত হয়ে লালবাজার থানায় বসে আছেন।

যদি সরোজের, কি মোটরখানির কোন খবর আসে। থানায় থানায় জানানো হয়েছে। সরোজকে না হয় তারা লুকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু মোটরখানাকে লুকিয়ে রাখা তো আর সহজ হবে না। আর মোটরখানার পাত্তা পাওয়া গেলেই সরোজকে খুঁজে বাহির করা সহজ হবে।

—ঢং—ঢং—ঢং—। রাত দশটা বেজে গেলে পুলিশ কমিশনার তাদের বাসায় যেতে বললেন। তিনি এও তাদের বলে দিলেন যে, কোন খবর পেলেই ফোন ক'রে তাদের তখনি জানানো হবে।

কাজেই ইচ্ছা থাকলেও আর তাদের বসে থাকা চললো না। তার উপর সরোজের জন্য ঘুরে ঘুরে দুর্ভাবনায় শরীর তাদের এলিয়ে পড়েছিল। যাই হোক্, সকলে সবেমাত্র কমিশনারের ঘরের বাহির হয়েছে, এমন সময় ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ডেভিড ফিরে গিয়ে ফোন ধরলে—

···হ্যালো···ইয়েস্···আপনি কে?

কথা চলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ বাদে ফোন নামিয়ে ডেভিড বললে—মোটরখানা পাওয়া গেছে বিনয়দা, নারকেলডাঙ্গার একটি পুকুরের ধারে···

—নারকেলডাঙ্গায়?

—হ্যাঁ—

—আর সরোজ?

—তার কোন খবর তো এরা দিতে পারলে না।

—বেশ এসো—বলে বিনয়বাবু এগোলেন। তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সামনে যে চল্‌তি ট্যাক্‌সিখানা পেলেন, তাতেই লাফিয়ে উঠে পড়ে' বললেন—নারকেলডাঙ্গা—

রাত দশটায় থানা থেকে তিনজন লোককে চলতি ট্যাক্‌সিতে উঠতে দেখে ড্রাইভার প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তারপর ডেভিডের সাহেবী পোষাক দেখে সুস্থ হয়ে সে ট্যাক্‌সি ছেড়ে দিলে।

ট্যাক্‌সি ছুটলো—

নারিকেলডাঙ্গার থানায় পৌঁছে, সেখান থেকে একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে সঙ্গে নিয়ে, পুকুরের ধারে যেখানে মোটরখানা পড়েছিল তারা সেখানে গেল। দেখা গেল, খালি মোটারখানা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে—গাড়িখানির এতটুকু ক্ষতি হয় নি। কিন্তু সরোজ গেল কোথায়?

ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে জিজ্ঞাসা করলেন—বন্ধুটির কি হলো বলুনতো?

—এখন তাতো কিছুই বলা যায় না। তবে আশেপাশে সব বাড়ীগুলির উপরেই আমরা নজর রেখেছি, যদি কোন সূত্র পাই তাহলেই সেই বাড়ী সার্চ করবো। নাহলে বিনা কারণে সব বাড়ীগুলো তো আর সার্চ করা চলে না, আপনিই বলুন?

—তা বটে!

—চলুন, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে, মোটর নিয়ে ফিরি।

সনি হঠাৎ বোকার মত জিজ্ঞাসা করে বসলো—আচ্ছা, তাকে গুম্ করে রেখে কি লাভ হবে ?

—লাভ হবে, তার জীবনের মূল্য স্বরূপ আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার সুবিধা হবে। যাক্. এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, চলুন মোটরে গিয়ে বসিগে—ইন্‌স্‌পেক্‌টর মোটরে গিয়ে উঠলেন।

ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে থানায় ছেড়ে দিয়ে তিনজনে বাড়ী ফিরলো।

—নয়—

সনি ঘুমোচ্ছিল।

সহসা ঘুম ভেঙে গেল, কিসের যেন একটি শব্দ কানে এলো।

—ঠক্—ঠক্—ঠন্ ঠন্ !

কিসের শব্দ ?

সনি বিছানার উপর উঠে বসে একটি জানালা খুলে ফেললে। তারপর জানালা দিয়ে মুখ বের করে সে যা দেখলে, তাতে তার নিজের চোখকে সহজে সে বিশ্বাস করতে পারলে না।—
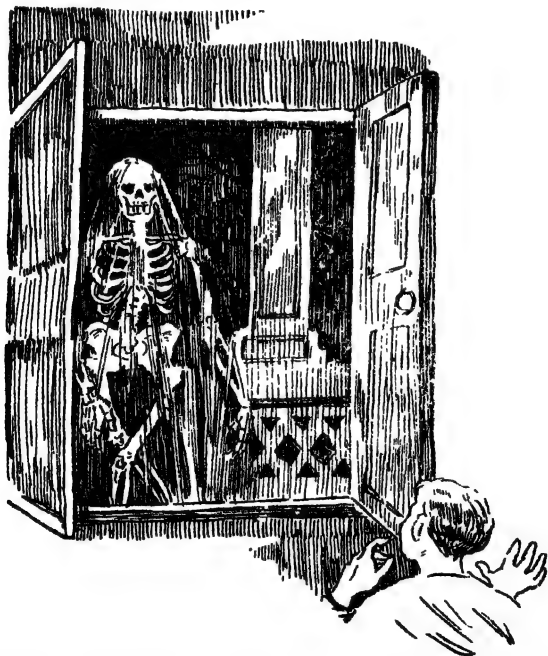
বারান্দা দিয়ে একটি কঙ্কাল তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে—বীভৎস—ভয়ঙ্কর—

সনির সারা দেহ ছম্‌ ছম্‌ করে উঠলো। কি করবে সে ভেবে পেলে না। মানুষকে সে ভয় করে না, কিন্তু এ ভূতের সঙ্গে সে কী করবে? কঙ্কালটি ধীরে ধীরে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সনির ইচ্ছা হলো একবার চীৎকার করে ওঠে, ডেভিড কিংবা বিনয়বাবুকে ডাকে। কিন্তু ভূতটা যে ক্রমেই জানালার কাছে আসছে। বিনয়বাবু কি ডেভিড তার ডাক শুনে উঠে আসার আগেই যে সে এসে পড়বে! কিন্তু আজই বা এখানে ভূত এলো কোত্থেকে। নিশ্চয়ই এ ভূত নয়। শত্রুদের কোন নতুন রকমের কারসাজী। আচ্ছা, আমিও দেখছি—

সনি বালিশের নীচে থেকে পিস্তলটা নেবার জন্য হাত বাড়ালে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কঙ্কালটি জানালার পাশে এসে পড়লো। জানালায় গরাদ নেই, এক সেকেণ্ড জানালা টপ্‌কে ঘরের মধ্যে ঢুকেই হাতের একখানি প্রকাণ্ড কালো কাপড় সনির মাথার উপর ফেলে দিলে, জেলেরা যেমন ভাবে জাল ফেলে।

সনির মাথার মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। পিস্তল বের না করেই তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে সনি মাথার উপর থেকে কাপড়খানা খুলে ফেলার চেষ্টা করলে। কিন্তু তৎক্ষণে দু'জন লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে। নিরুপায় হয়ে সনি চীৎকার করে উঠলো—বিনয় কা—কা—আ...

কথা শেষ হবার আগেই একজন তার মুখ চেপে ধরলো।

বিনয়বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো সনি যেন তাকে ডাকছে—কে যেন চীৎকার করে উঠলো।

মনের ভুল নয়তো?

বিনয়বাবু উঠে বসলেন—সত্যি যদি সনি ডেকেই থাকে, তাহলে আরেকবার নিশ্চয়ই ডাকবে। কিন্তু কই আর তো কিছু শোনা যাচ্ছে না, তবে? একবার বেরিয়ে দেখাই ভাল।

বালিশের নীচে থেকে পিস্তলটি বের করে নিয়ে বিনয়বাবু দরজা খুলে বারান্দায় বেরোলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ওপাশের ঘর থেকে ডেভিড বেরিয়ে এলো, তার হাতেও পিস্তল। বিনয়বাবুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো—কার যেন একটি চীৎকার শোনা গেল না?

—হ্যাঁ, আমার মনে হলো সনি যেন চীৎকার করে আমায় ডাকলে।

—সনির গলা বলে আমারও মনে হলো।

সনির দরজায় দুজনে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—সনি—সনি—!

কোন উত্তর নেই।

দরজায় সজোরে দু'বার ধাক্কা দিয়ে ডেভিড ডাকলে—সনি?

তবুও কোন সাড়া নেই।

ডেভিড বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকালো। বিনয়বাবু বললেন—জোরে জোরে ধাক্কা দাও, দরজা ভেঙে ঢোকো,—

তারপর সহসা খোলা জানালাটির পানে দৃষ্টি পড়তেই বললেন—না না, দরজায় ধাক্কা দেবার দরকার নেই, জানালাটি তো খোলা রয়েছে, ওইটে দিয়ে ভিতরে ঢুকি গে চলো—

দু'জনে গরাদেহীন জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

ভিতরে আলোর সুইচ্ টিপতেই দেখা গেল, বিছানার উপর সনি নেই। চাদরখানা এলোমেলো হয়ে গেছে, পিস্তলটা পড়ে আছে।

খানিকক্ষণ কারও মুখ থেকে কথা সরলো না।

—দশ—

—উঃ—মাগো—ওঃ—

কাতরোক্তি শুনে সরোজের তন্দ্রা টুটে গেল। সরোজ ধড়মড় করে উঠে বসলো। কানের কাছে কে এমন কাৎরাচ্ছে! উঠে বসতে গিয়ে সরোজের পায়ে কি একটা লাগলো যেন, নরম—নরম!

—উঃ—।

মানুষ নাকি!

সরোজ হাত বাড়িয়ে দেখলে, মানুষই বটে। এ কে? এমন অবস্থায় কেন? সরোজ লোকটিকে দু'বার ঝাঁকানি দিলে, লোকটি যেন একটু নড়ে-চড়ে উঠলো—উঃ—

—কে গো? তুমি কে?

—উঃ—এ্যাঁ—কি—কী?

এই অন্ধকারে তাকে জব্দ করার এ এক নতুন ফন্দী নয়তো? সরোজ সেই অদেখা মানুষটিকেই এবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কে? তুমি কে?

সরোজের সে ঝাঁকানিতে লোকটির দেহের সব হাড়ে হাড়ে খট্ খট্ করে উঠলো। সে কি যেন বলার চেষ্টা করে বলে উঠলো…এ্যাঁ…আমি…অন্ধকার…

এবার গলার স্বর সরোজ চিনলে, বললে—কে, সনি?

—এ্যাঁ, সরোজ কাকা?

—এখানে তুমি এলে কি করে?

—এরা আমায় ধরে এনেছে…তাই তো…হ্যাঁ…ঠিক হয়েছে…এবার মনে পড়েছে—রাত্তিরে সবে ঘুমিয়েছি—

ঘটাং—ঘট্—

সনির কথা শেষ হবার আগেই উপরের সেই ফোকরটা খুলে গেল। সেই পুরাণো দুটি মুখ দেখা গেল ফোকরটার পাশে। আর নীচে নেমে এলো এক ঝলক টর্চের আলো।

উপর থেকে একজন ডাকলে—সরোজবাবু।

—কী ?

—হীরেগুলি আপনি আমাদের দেবার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

—কী করে দেবার ব্যবস্থা হবে ?

—ব্যাঙ্কের ফর্মে সই করে দিন, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।

—ব্যাঙ্কের ফর্মে সই করে দোব, এ কথা তোমাকে কে বললে ?

—আপনি কি তা'হলে সই করতে রাজী নন্ ?

—যদি বলি—না।

—ভাল কথায় না দিলে, জোর করে সই করিয়ে নোব। আপনার চোখের সামনে সনির চামড়া কেটে কেটে নুন দোব, দেখি আপনি সই করেন কি না ?

তাকে কেটে কেটে নুন দেওয়া হবে শুনে সনি সরোজের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। সরোজ তার মনের ভাব বুঝলো। তার পিঠের উপর ধীরে ধীরে হতে বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—বেশ, তাহ'লে আমায় আর চব্বিশ ঘণ্টা সময় দাও—তার মধ্যে আমি মন ঠিক করে ফেলবো।

—আবার চব্বিশ ঘণ্টা ?

—হ্যাঁ।

—না, তা আর হয় না, বারো ঘণ্টা সময় দিলাম। কাল সকালে হীরেগুলো আমাদের চাই-ই—বলে ঘটাং-ঘট্ করে লোক দুটি দরজাটা বন্ধ করে দিলে। উপরে তাদের চলে যাবার পদশব্দ শোনা গেল।

—এগার—

সনি এবার বললে,—কী হবে সরোজ কাকা ?

—অত ভয় পাচ্ছ কেন ? এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই আমি একটি ব্যবস্থা করে ফেলছি।

—কী করবেন ?

—একটি ফন্দী আমার মাথায় এসেছে। ওদের টর্চের আলোয় দেখলুম, ওপাশে একটি দরজা আছে, সেটাকে কোন রকমে খুলতে পারলেই একটি ব্যবস্থা হবে।

—কিন্তু যদি না খোলে ?

—ভেঙে খুলতে হবে। এদিকে এসো দিকি, আমায় সাহায্য কর—বলে সরোজ অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা স্পর্শ করলো। দরজায় দুবার ধাক্কা মেরে দেখলে, সামান্য একটু কাঁপলো মাত্র! সহজে যে সে-দরজার কোন ক্ষতি হবে, তা মনে হলো না।

ওপাশে কি আছে শোনার জন্য সে কিছুক্ষণ কান পেতে রইল, কানে এলো একটি অস্পষ্ট সপ্-সপ্ শব্দ। প্রথমটা বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ শোনার

পর সরোজের মনে হলো, ওপাশে কাছাকাছি কোথাও হয়তো একটা প্রেস আছে, তারই মেসিন চলার শব্দ।

ঘরের ও কোণ থেকে ইতিমধ্যে সনির কথা ভেসে এলো—সরোজ কাকা, আমি যে হারিয়ে গেলুম।

—এই যে এধারে এসো—

—কই ?

—এ—ই, এই দিকের দেয়ালের ধারে—

সহসা 'কট' করে একটি শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে কালো অন্ধকার আলোয় ঝলমল্ করে উঠলো। সরোজের চোখে ধাঁধা লাগলো। অবাক হয়ে গেল। একটু বাদে চোখ ঠিক হলে, সরোজ দেখলে সনি তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসছে, তার হাতের কাছে আলোর সুইচ্। সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি জ্বাললে ?

—হ্যাঁ, আপনার চোখে ধাঁধা লেগে গেছে, না ?

—সুইচ্ খুঁজে পেলে কেমন করে ?

—মনে হলো আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, দেয়ালে হাত দিতেই সুইচ্টার উপর হাত গিয়ে পড়লো, টক্ করে টিপে দিলাম।

—যাক, ভালই হলো, এবার সব দেখা যাবে। এদিকে এস দিকি—বলে সরোজ ঘরটা ভাল করে একবার দেখে নিলে। কাঠের ঘর। একটি ছাড়া দরজা জানালা নেই। মাথার উপর ক'টা খুপ্রী আছে, ভেন্টিলেটার হিসাবে হয়তো। লোহার পাত দিয়ে দরজাটা আঁটা, সহজে খোলা যাবে বলে তো মনে হয় না, কিন্তু চেষ্টা ছাড়লে তো চলবে না। সরোজ সজোরে একটা লাথি মারলে—দুম্ম্—ম্ !

দরজাটা একবার শুধু কেঁপে উঠলো।

—দুম্ম্—ম্—ম্ !

—দুম্ম্—ম্—!

—দুম্ম্ !

সরোজের লাথি মারার বিরাম নেই।

একটির পর একটি অবিরাম লাথি মারতে মারতে সরোজ যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, কপাল বেয়ে টস্টস্ করে ঘাম ঝরছে, এমন সময় একটা লোহার বলটু ছিটকে পড়লো। সরোজের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দরজায় যে লোহার পাত্টির মুখে বলটুটি আঁটা ছিল, হাতের চাপে সরোজ সেটা বেঁকিয়ে ফেললে। তারপর কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ডান্ডাটি শাবলের মত ব্যবহার করে দরজাটির দু'পাশের কব্জাকে উপ্ড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

দরজাটির মাঝে একটু ফাঁক হতেই অল্প অল্প জল এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

সনি বলছে—জল আসছে যে !

—হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। আগে মনে করেছিলুম ওপাশে একটা প্রেস

চলছে। কিন্তু এখন বুঝলুম ওটা প্রেস নয় জলের শব্দ। জলের ঢেউ এসে ছলাৎ ছলাৎ করে দরজার ওপাশে এসে লাগছিল। যাক ভালোই হলো,

জলের ধাক্কা যদি জোরে হয় তাহ'লে দরজাটা উপড়ে পড়তেও পারে—বলে সরোজ হাতের শাবলটা দিয়ে দরজাটির পাশে আরেকটু জোরে চাপ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে—ভুস্—স্—

দরজাটি একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সনির হাত ধরে সরে না দাঁড়ালে দু'জনেই আহত হতো নিশ্চয়ই। তারপরেই ছল্-ছল্ করে জল এসে পড়লো ঘরের মধ্যে। দু'জনে প্রথমে জলের টানে পিছিয়ে পড়লো। তারপর সে ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে, সরোজ সনির হাত ধরে বললে—এগিয়ে এসো, দম বন্ধ করে এই জলের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

—কিন্তু…

—'কিন্তু'র আর কিছু নেই। জলের মধ্যে ডুবে মরাও ভাল, তবু শত্রুর হাতে নির্যাতিত হওয়া ভাল না—

দু'জনে হাত ধরে দরজার বাহিরে কালো জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—বারো—

উপরের ঘরে বসে দু'জনে কথা বলছিল, হঠাৎ কথার ফাঁকে খোট্টা চাকরটী এসে জানালো—বাবুজী জমিন্‌কা কামরা পানি ভরগৈ!

দুজনে চম্‌কে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো -কোন কামরা?

—জিস্‌মে দো আদ্‌মী আটক্‌ হ্যায়।

দু'জনের মধ্যে কেউ আর কোন কথা বললে না, একসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে তর্‌-তর্‌ করে নীচে নেমে গেল। নীচের ঘরে এসে একখানি টেবিল সরিয়ে একজন মেঝের উপর পায়ে করে একটি সুইচ্‌ টিপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর থেকে একখানি চাক্‌তি সরে গিয়ে একটা গর্ত দেখা গেল। গর্তটা জলে ভরে গেছে। টর্চ লাইট ফেলে কিছুই দেখা গেল না।

দ্বিতীয় লোকটি এবার বললে—গেল কোথায়, ডুবলো নাকি?

প্রথম লোকটি জলের উপর ঝুঁকে পড়ে, টর্চের আলোয় বার বার ভাল করে দেখতে দেখতে বললে—তাইতো, তাহ'লে এত পরিশ্রম সবই তো পণ্ড!

—জলে নেমে একবার দেখলে হয় না?

—তাতো দেখবোই! তবে দরজাটা ভাঙলো কেমন করে, তাই আশ্চর্য।

- আমিও তাই ভাবছি! এমন মজবুত দরজা। ওদের কাছে ছুরিটুরী ছিল নাকি?

—তুমি আমায় এতো কাঁচা ছেলে পেয়েছ নাকি! দু'জনের পকেট সার্চ করে তবে-না নীচে নামিয়েছি!

—তবে দাঁড়াও, আমি একবার নীচে নেমে দেখি—বলে জামা ও গেঞ্জিটা খুলে সে নীচে নেমে গেল। জল তখন অনেক। ডুবে ডুবে সে জলের মধ্যে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু অনেকক্ষণ খোঁজার পর, সরোজ আর সানিকে না পেয়ে, সে উপরে ভেসে উঠে সেই ফোকরটার মুখের কাছে এসে বললে—ব্যাটারা ভেগেছে, কোথাও নেই।

—জলের টানে ভেসে গ্যাছে হয়তো।

—তাও হতে পারে, এখন ধরো দিকি, ওপরে উঠি। উপরের লোকটি নীচের লোকটিকে উপরে উঠে আসতে সাহায্য করলো। উপরে এসে সে বললে—তাহ'লে এখন উপায়?

—উপায় একটা কিছু করতেই হবে। না হলে অত টাকার জহরৎগুলো হাত ছাড়া করা তো চলবে না। এরা দু'জন তো গেলো! মরে একেবারে গঙ্গায় গিয়ে ভেসে উঠবে। এখনও তো বিনয় আর ডেভিড আছে, তাদের পাক্‌ড়াও করে কাজ হাসিল করতে হবে।

—কিন্তু ওরা তো পুলিশেও খবর দিয়েছে। আমাদের চিঠিখানা এখন পুলিশের হেপাজতে আছে।

—তা কি আর আমি জানি না, ওদের দু'জনকে আটকে ফেললেই কাজ ঠিক হাসিল হয়ে যাবে।

—কি করবে?

—এই দেখ না, একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, চিঠিখানা পেলেই ওরা ছুটে এসে আমাদের ফাঁদে পা দেবে।—বলে পকেট থেকে একখানি ডায়েরী বের করে একখানি সাদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সে লিখলে ঃ

সরোজ ও সনি ১৫ নং গোকুল গোয়ালা লেনে আটক আছে।
আজই তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবেন।—জনৈক বন্ধু

লেখা শেষ করে সে ডাকলো—বুলু—বুলু—!

—বলুন—বলে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো। বয়স বছর পনেরো, কিন্তু বেঁটে চেহারা দেখে দশ বছরের বেশী বলে মনে হয় না।

—এই চিঠিখানা এই ঠিকানায় দিয়ে আয়। জিজ্ঞেস করলে বলবি, একজন ভিখিরী দু'আনা পয়সা দিয়ে তোকে পাঠিয়েছে, বুঝলি ?

বুলুর চোখ দুঠো বড় বড় হয়ে উঠলো, বললে—ভিখিরী দু'আনা পয়সা দিয়েছে ?

—হ্যাঁরে ব্যাটা, হ্যাঁ। সে কি আর সত্যিকারের ভিখিরী, পুলিশের লোক ভিখিরী সেজে থাকে না, সেই ভিখিরী।

—ওঃ গোয়েন্দা! দিন তবে দিয়ে আসছি—বলে চিঠিখানা হাতে নিয়ে উপরের ঠিকানাটি পড়তে পড়তে বুলু ছুটলো।

বিনয় ও ডেভিড সারাদিন অবিরাম খোঁজাখুঁজির পরে সবেমাত্র দরজাটি পার হয়ে বাড়ী ঢুকেছে এমন সময় দেখলে একটি ছোট ছেলে একখানি চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে ছেলেটী চিঠিখানি বিনয়বাবুর হাতে দিলে। কাগজের টুকরাটী তাড়াতাড়ি বিনয়বাবু পড়ে নিলেন—

সরোজ ও সনি ১৫নং গোকুল গোয়ালা লেনে আটক আছে।
আজই তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবেন।—জনৈক বন্ধু

চিঠি পড়ে বিনরবাবু বুলুর পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ চিঠি তোমায় কে দিলে খোকা ?

—একজন ভিখিরী।

—ভিখিরী ?

—হ্যাঁ, দু'আনা পয়সা আমার হাতে দিয়ে বললে—'যা এই চিঠিখানা এই ঠিকানায় দিয়ে আয় দিকি'—তা চিঠিখানা আপনাদেরই তো বাবু ?

—হ্যাঁ—বলে বিনয়বাবু ডেভিডের পানে ফিরে বললেন—সম্ভবতঃ কোন পুলিশের লোক আমাদের সাহায্য করেছে।

ডেভিড বললে—আবার শত্রুদের একটি চালও তো হতে পারে। আমাদের দু'জনের জন্যে আবার নতুন কোন ফাঁদ পেতেছে। তা দেখ খোকা, চিঠিখানা কোন্ জায়গায় তোমার হাতে দিলে বলতো—

ডেভিড তাকিয়ে দেখে বুলু তার অনেক আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে।

বিনয়বাবু বললেন—তা হোক, একবার খোঁজ করতে দোষ কি ?

—বেশ, বলুন ত এখনি যাই।

—এখনি ? কিছুক্ষণ জিরিয়ে গেলে হতো না ?

— না, তাহ'লে রাত হয়ে যাবে, বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

—বেশ, তবে চল।

দু'জনে গোকুল গোয়ালা লেনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

গঙ্গার ধারে নির্জন শান্ত পল্লী। তারই মাঝ দিয়ে সরু একটি ইঁট-বাঁধানো গলি চলে গেছে, সাপের মত। এই গলিটার নামই গোকুল গোয়ালা লেন। পনেরো নম্বর বাড়ীটি খুঁজে নিতে বেশী দেরী হলো না। ছোট বাড়ী। দোতলা। দরজার মাথায় 'টু-লেট্' লেখা এক বোর্ড ঝুলছে। প্রকাণ্ড একটা তালা দরজায় লাগানো। বাড়ীটায় যে কেউ বাস করে না—তা বাইরে থেকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

বিনয়বাবু বললে—খালি বাড়ী যে হে, টু-লেট্ ঝুলছে।

ডেভিড বললে—তাতে কি! এমনি সব টু-লেট লেখা বাড়ীর ভিতরেই তো কত লোককে গুম্ করে রাখা হয়। যেমন করেই হোক, ভিতরটা একবার দেখতেই হবে। এদিকে আসুন দিকি--বলে বিনবাবুর হাত ধরে বাড়ীটার পাশে এক সরু গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। বাড়ীটির সেদিকে একটা নীচু পাঁচিল। একটু চেষ্টা করলেই সহজে টপ্‌কে যাওয়া যায়। গলির কাছাকাছি কোন লোক নেই। ডেভিড বললে—বিনয়দা, এই সময় পিস্তলটা ঠিক আছে তো?

বিনয়বাবু বুক-পকেট চেপে ধরে বললেন—হ্যাঁ, পিস্তল ঠিক আছে, তুমি লাফিয়ে পড়, আমি পিছনে আছি।

ডেভিড দু'হাত দিয়ে পাঁচিলটা ধরে ঘোড়ায় চড়ার ধরণে একেবারে ঘুরে গিয়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পড়লো। বিনয়বাবুও তার পিছনে লাফিয়ে পড়লেন।

এতক্ষণ একটি লোক অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, এদের ভিতরে লাফিয়ে পড়ার সংগে সংগে সে সরে গেল।

—তেরো—

সামনেই কয়েকখানি ঘর। ওপাশ দিয়ে দোতালার সিঁড়ি উঠে গেছে। টর্চের আলোয় নীচের ঘরগুলি দেখতে একটুও কষ্ট হয় না। ঘরগুলি খালি। ভাড়াটে বাড়ীর ঘর, জঞ্জালে ভর্তি। কতদিন আগে ভাড়াটে উঠে গেছে, তারপর আর পরিষ্কার করাই হয়নি। দেখে দেখে নীচের ঘরগুলিকে পাশ কাটিয়ে দু'জনে নিঃশব্দে উপরে উঠতে সুরু করলে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকার জমাট বাঁধতে সুরু করেছে। অন্ধকারের আবছায়ায় উপরে সিঁড়ির মুখে দু'জনে এসে দাঁড়ালো। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। গা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করে ওঠে। তা উঠুক, বাড়ীর ভিতরে যখন এসেছে, তখন সব সন্ধান না করে তারা যাবে না। দু'জনে প্রথমে সামনে যে ঘরখানি দেখলো, তারই মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

যেই ঘরের মধ্যে গেছে, অমনি চোখ ঝল্‌সে দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি আলো জ্বলে উঠলো। 'কি করবে'—ভেবে নেবার আগেই ভীমের মত চারজন লোক তাদের জাপ্‌টে ধরলে, তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল, ছুরি, যা-কিছু ছিল সব বের করে নিয়ে তাদের হাত মুখ বেঁধে সেখানে ফেলে রেখে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

যাবার সময় আলোগুলো নিভিয়ে যেতে ভুললো না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর এরা পরস্পরের সাহায্যে কোন রকমে হাতের ও মুখের বাঁধনটি আল্‌গা করে ফেললো। বিনয়বাবু বললেন—এমন ব্যাপার জানলে কিছু খেয়ে নিয়ে বেরোতাম। সারাদিন যা ঘুরতে হয়েছে।

ডেভিড বললে—আগে জানতে পারলে তো আমি পুলিশ সঙ্গে করে আনতাম, তাহলে কি এই অন্ধকারে এমন ধারা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে' থাকতে হতো ?

বিনয়বাবু বললেন—হাত পা বাঁধার জন্যে তো আর কষ্ট হচ্ছে না, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলার কষ্ট যে হাত-পা বাঁধার চেয়ে অনেক বেশী।

সহসা বাইরে থেকে কার গলা শোনা গেল—খাবেন ? খাবার পাঠিয়ে দোব ?

দু'জনেই চম্‌কে উঠলো, মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে, জানালার ধারে এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই কথা বলছে।

বিনয়বাবু বললেন—আপনি ?

লোকটি হাসলো, বললো—হ্যাঁ, আমি। খাবেন তো বলুন ?

ডেভিড বললে—বেশ পাঠিয়ে দিন, কিন্তু খাব কেমন করে, হাত তো বাঁধা।

—সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই। আমাদের লোক এসে খাইয়ে দিয়ে যাবে'খন—বলে লোকটি সরে গেল।

বিনয়বাবু ডেভিডের কানের কাছে সরে গিয়ে বললে—তেমন যদি কোন লোক খাওয়াতে আসে বুঝলে…?

ডেভিড ঘাড় নেড়ে বললে—বুঝেছি, আমায় কি আবার নতুন করে কিছু বলতে হবে নাকি !

একটু বাদেই একটা লোক খাবার নিয়ে এলো।

জানালার লোকটি এবার এলো, দরজা খুলে দিয়ে আলো জেলে সে বললে —এদের খাইয়ে দাও।

সঙ্গের লোকটি বিনয় আর ডেভিডকে খাওয়াতে সুরু করে দিলে। লোকটি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

সহসা বাইরে কোথাও টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো, লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠলো। আবার ঘণ্টা বাজলো। লোকটি আর দাঁড়াতে পারলো না, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—তোর খাওয়ানো হলে আমায় ডাকিস্, দরজায় তালা লাগিয়ে যেতে হবে, বুঝলি ?

যে খাইয়ে দিচ্ছিল. সে ঘাড় নেড়ে জানালো—আচ্ছা।

লোকটি ঘর থেকে যেতে না যেতেই, বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি হে?

—কথা কহিতে বারণ আছি—

কথা শুনেই বিনয়বাবু বুঝলেন, লোকটা উড়িয়া। বললেন—কত মাইনে পাও?

—কথা কহিতে বারণ আছি, বাবু শুনিতে পাইব।

—আরে বাবু শুনতে পাবে না, চুপি চুপি বলনা কত মাইনে পাও?

—পাঁচঅ তঙ্কা।

—মাত্র পাঁচ টাকায় এত কাজ কর?

এবার উড়ের মনটি একটু নরম হলো, বললে—বাবু বড় গুণ্ডা আছি, দিন-রাত মারিব মারিব করি ভয় দেখাউচি, আর চাকুরীই বা মিলিব কুথা বাবু?

—আরে চাকুরী মিলিব না কিরে!

এবার উড়ের মুখে হাসি ফুটলো। কিন্তু হাসবার আগেই সে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। বিনয়বাবু তখন তার বুকের উপর বসে, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরেছেন। উড়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু সে সফল হবার আগেই ডেভিডের সাহায্যে বিনয়বাবু তার মুখ হাত পা বেঁধে ফেললেন। তারপর তাকে সেখানে ফেলে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের সিঁড়ির অন্ধকারে তর্‌তর্‌ করে দু'জনে নেমে গেল। নীচে নেমে আসতেই সামনের অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠলো, সংগে সংগে বাড়ী কাঁপিয়ে একটি কুকুর চীৎকার করে উঠলো—ঘেউ—ঘে—ঘে—ঘেউ!

সংগে সংগে এক সেকেণ্ডের মধ্যে সব কটি বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠলো, পাশের একটি ঘর থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে এদেরকে সামনে দেখেই পাকড়াও করলে। একজন হাঁক দিলে—সর্দার?

—কে? কি হয়েছে?

—সয়তান লোগ ছিপাকে ভাগ যাতা থা, পাকড়া লিয়া!

—বহুৎ আচ্ছা, যাতা হুঁ—

একটু পরে সেই লোকটি নেমে এলো। এদের দেখে সে হেসে বললে—আপনারা তো ভারী চালাক লোক দেখছি—এ নেপালী, উপরসে রশি লাও, দোনো বাবুকো জোরসে বাঁধো—

—বহুৎ আচ্ছা, হুজুর—বলে নেপালী দড়ি আনতে চলে গেল।

বিনয়বাবু বললেন—আচ্ছা, আমাদের এম্‌নি ভাবে আটকে রেখে আপনার লাভ কি?

—লাভ একটু আছে বৈ কি, না হলে কি আর এমনি আট্‌কে রেখেছি—বলে সর্দার হাসলো, অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভাঙার আগে ভীম যেমন ভাবে হেসেছিল।

—চৌদ্দ—

চারিপাশে শুধু অন্ধকার, কালো জল বুকটাকে চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস না পেয়ে ফুসফুসটা টনটন করে উঠছে, হৃৎপিন্ডটা এখুনি ফেটে গিয়ে নাকমুখ ছাপিয়ে রক্ত উঠবে বুঝি। একটুখানি নিঃশ্বাস নেবার আশায় সরোজ ভেসে উঠলো, ঠক্ করে ইঁটের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। বাতাস নেই—বাতাস নেই। শুধু জল—আর জল—আর জল। উঃ অসহ্য! বুক ফেটে গেল বুঝি—হাওয়া—হাওয়া—ওঃ—

চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু অমন অবস্থাতেও সরোজ সনির হাত ছাড়েনি। কিন্তু বেশীক্ষণ আর ধরে রাখাও চললো না, আপনিই হাত ঢিলে হয়ে এলো,—চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

তারা জলের টানে ভেসে চললো।

গুন্ডাদের আড্ডা। নিজেদের বাঁচানোর জন্য, পালাবার জন্য বাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ রেখেছিল। জলের টানে দু'জনে গঙ্গায় গিয়ে পড়লো।

ঘস্-ঘস্ ঝক-ঝক করে গঙ্গার বুকে একখানি ষ্টীমার চলছিল। চলতি ষ্টীমারের পাশে দুটি লাশ দেখে, একজন খালাসী চীৎকার করে উঠলো—হুজুর দোঠো লাশ—!

লাশ!

মেট্ ষ্টীমারের ব্রেক কষলো। দু'জন খালাসী জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লাশ দুটি তারা টেনে আনলে ষ্টীমারের ধারে। ষ্টীমারের উপর থেকে তাদের তুলে নেওয়া হলো। সারেঙ্ তাদের জ্ঞান ফিরে আসার ব্যবস্থা করলে। পা দুটি ধরে মাথাটি নীচে ঝুলিয়ে ক' পাক ঘোরাতেই, হুড় হুড় করে জল বমি হতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে তারা চোখ মেলে চাইলে। তখন বোটে করে তাদের জল-পুলিশের আড্ডায় পোঁছে দেবার ব্যবস্থা হলো।

জল-পুলিশের আড্ডায় সেবা-শুশ্রূষার জোরে সরোজ ও সনির শরীর একটু সুস্থ হলো। কৈফিয়ৎ লিখে নিয়ে পুলিশ তাদের বাড়ী পোঁছে দিয়ে গেল।

বাড়ী পোঁছে তারা চাকরের মুখে শুনলে, বিনয়বাবু আর ডেভিড সেই কখন বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেন নি। সম্ভবতঃ তাদেরই সন্ধানে বেরিয়েছেন ভেবে সরোজ আর সনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। উঠে দাঁড়াবার মত জোর তখন তাদের ছিল না।

—পনেরো—

ঘুম ভাঙতেই সরোজ চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁরে, বাবুলোগ আভি তক্ নেহি আয়া?

—নেহি বাবু, সাঁঝমে এক লেড়কা একঠো চিঠ্ঠি লেকর আয়া থা, তব্ দোনো বাবু চলা গয়া।

—কুছ্ বাত্ কহ গৈ থে?

—নেহি বাবুজী।

—আচ্ছা, তুম যাও—বলে সরোজ চাকরকে ভাগিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলো। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে বিনয়বাবু আর ডেভিড বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এখনো ফিরলেন না। গেলেন কোথায়? শত্রুদের কবলে গিয়ে পড়লেন নাকি? শত্রুরা কোন চিঠি দিয়ে আটকে ফেললে নাকি? এখন কি করে তাদের উদ্ধার করা যায়?

—কাকা দেখুন, ওই লোকটা আমাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দু'বার এই গলি দিয়ে গেল, কেমন যেন চেনা-চেনা!

কথা শুনে সরোজ নীচে পথের পানে তাকালো। দেখলে লোকটি উপর দিকে তাদের পানে তাকিয়ে হন্-হন্ করে চলে যাচ্ছে। সরোজের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সরোজ চিনলে, সে মুখ আর কারও নয়, বন্দীঘরের ফুকর দিয়ে যে লোকটা কথা বলতো—এ সে-ই! চেয়ার ছেড়ে সরোজ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, এবং তর্‌তর্ করে নীচে নেমে ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরলো। লোকটি এক ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু সরোজের দেহেরও ত শক্তি কম নয়, তার হাত ছাড়িয়ে নিতে সে তো পারলই না, লাভের মধ্যে সরোজ তার হাতখানি মুচড়ে একেবারে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বললে—এসো—

— কোথায়?

—আমার বাড়ীর মধ্যে!

—কেন? আমি কি করেছি? ছেড়ে দিন্, আমি চলে যাই।

—ছাড়বো বলেই তো ধরেছি! এখন ভাল ভাবে আসবে তো এসো, নাহ'লে—

—নাহ'লে কি, মারবেন নাকি? উঃ,—আঃ—ছাড়ুন—যাচ্ছি যাচ্ছি—

সরোজ লোকটির হাতের একটি শিরা এমন ভাবে চেপে ধরলো যে, লোকটি যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠলো, কিছুই করতে হলো না, সুড় সুড় করে সে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই সরোজ বললে—সনি তাড়াতাড়ি খানিকটা শক্ত দড়ি নিয়ে এসো দিকি —

সনি ছুটে অন্য ঘর থেকে দড়ি নিয়ে এলো। লোকটিকে সরোজ চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। তারপর সামনের আরেকখানি চেয়ারে বসে পড়ে বললে—এবার আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব দাও দিকি, বল—আমাদের আর দু'জনকে কোথায় আটকে রেখেছ?

—কে দু'জন আমি তো কিছুই জানিনে। সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু জানিনে, আমায় ছেড়ে দিন।

—দেখ, আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না, আমার কথার জবাব দেবে কি না তাই বল? সহজে জবাব না দিলে কি করে জবাব আদায় করতে হয়, তা আমার জানা আছে, বুঝলে!

—সত্যি বলছি—আমি কিছুই জানিনে, অফিস থেকে ফিরছিলাম, আপনি ধরলেন—

—কিছুই জানো না ? বেশ, আমি জানিয়ে দিচ্ছি—বলে সরোজ পিন-

প্যাডের উপর থেকে একটি আলপিন তুলে নিয়ে বললে—এই একটি পিন হাতের নখের ফাঁকে বিঁধলেই বুঝতে পারবে, কেমন করে সব জানা যায় !

লোকটি প্রথমে চুপ করে রইল। শেষে তার আঙুলে পিন বেঁধবার উপক্রম করতেই, তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিয়ে বললে—বলুন-বলুন

আলপিনটা আবার প্যাডে রেখে সরোজ বললে—বেশ, সব ঠিক ঠিক জবাব দাও।

—বলুন !

—বিনয়দা আর ডেভিড কোথায় আছে ?

—তাদের আটকে রাখা হয়েছে।

—কেন ?

—হীরেগুলো পাবার জন্যে।

—বেশ, কোথায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে, ঠিকানা দাও, পুলিশ নিয়ে গিয়ে আমি তাদের উদ্ধার করে আনি।

—কিন্তু তাদের তো আপনি পাবেন না, আজ সকালে তাদের আসামে চালান দেওয়া হয়েছে।

—চালান দেওয়া হয়েছে ? কেন ?

—টাকা পাবার জন্যে।

—তা আসামে তারা কি করবে?

—ডাকাতেরা তাদেরকে কিনেছে।

—তার মানে?

—মানে, কালীর পূজায় নরবলি দেবে।

—এখন তাদের উদ্ধার করা যায় না?

—যায়, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি?

—তোমায় আমি টাকা দেবো।

—বেশ, টাকা যদি দেন তো রাজী আছি, ফন্দী বলে দেবো।

—শুধু ফন্দী বলে দিলেই তো হবে না, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। যদি তোমার কথা মিথ্যা হয়?

—বেশ, আমি আপনার সঙ্গে যাব, আর তাঁতেও যদি আপনার সন্দেহ থাকে, আমার একখানি ফটো আপনি পুলিশে জমা রাখতে পারেন, যাতে আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করে পালাতে না পারি। তবে একটা কথা, তাদের উদ্ধার করতে গেলে আজকের ট্রেণেই আপনাদের বেরোতে হবে।

—বেশ, এখনি আমি সব ব্যবস্থা করছি,—বলে সরোজ টেবিলের উপর থেকে একখানি টাইম-টেবল্ টেনে নিলে।

—ষোল—

দু'পাশে উঁচুনীচু পাহাড়, মাঝপথ দিয়ে বিরাট একখানি ট্রেন রাক্ষুসে অজগরের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে ছুটে চলেছে। রাত্রের অন্ধকার দু'পাশের জঙ্গলের সঙ্গে খস্‌খস্ মর্মর করে কি যেন চুপি চুপি কথা বলছে। মানুষের হাতে-গড়া এই বিরাট দৈত্যের গর্জন শুনে অন্ধকারও বুঝি ভয় পেয়ে, দু'পাশের উঁচু উঁচু গাছগুলোর আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। ট্রেন ছুটছে—হুস্ হুস্—গম্‌গম্—ঝক্‌ঝক্—ঘস্ ঘস্—

তারই একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট।

যাত্রী তিনজন। সনি ঘুমোচ্ছিল, সরোজ এতক্ষণ বসে বসে কখন নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর শিবপদ (সেই লোকটির নাম) এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ঘুমোবার ভাণ করেই বসেছিল, আর চোখের কোণ দিয়ে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। যেই দেখলে সরোজ ঢুলে ঢুলে শুয়ে পড়েছে, অমনি সে উঠে বসলো, তার দু'হাত বাঁধা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওপাশের একটা সুটকেশ খুলে, একখানি ছুরি বের করে নিয়ে, দাঁত দিয়ে খুলে, হাতের দড়িটা কেটে ফেললে। তারপর এপাশে এসে নিজের কম্বলখানা টেনে এনে সরোজকে চাপা দিয়ে দিলে, তারপরেই তাকে জাপ্‌টে ধরে কম্বলশুদ্ধ জানালা গলিয়ে বাহিরে ফেলে দিলে, সরোজ আত্মরক্ষার এতটুকু অবসর পেলে না।

সনি তখনও ঘুমোচ্ছিল, শিবপদ তাকেও একখানি চাদর দিয়ে বেঁধে ফেললে, তারপর বেডিং খুলে তার মধ্যে তাকে জড়িয়ে নিলে। সনি চীৎকার করার চেষ্টা করলে, কিন্তু ট্রেনের শব্দে সে চীৎকার কেই-বা শুনবে? শিবপদ ইতিমধ্যেই তার মুখের মধ্যে দু'খানা রুমাল গুঁজে দিলে, চীৎকার করার আর উপায় রইল না।

রাত তখন অনেক।

পরের ষ্টেশনে খাসিয়া কুলিকে ডেকে সুটকেশ আর বেডিং তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে শিবপদ নেমে পড়লো, কারও মনে কোন সন্দেহই হলো না। চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে সুটকেশের ভিতর থেকে একটি টর্চ বের করে নিয়ে সে জঙ্গলের পথ ধরলো।

সরোজ যেখানে পড়লো পাহাড়ের সেদিকটা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। একবার পড়লে ঠোক্কর খেতে খেতে মানুষটা নীচে গিয়ে কোথায় পড়ে হাড়গুলো যে গুঁড়ো হয়ে যাবে, কে জানে! কিন্তু সরোজের নেহাৎ বরাত জোর। সরোজ বেঁচে গেল।

নীচের পাথরের উপর এসে আঘাত পাবার আগেই একটি ঝোপের উপর পড়ে সে আট্‌কে গেল। কম্বলখানার খানিকটা ফেঁসে গেল, একটি ডাল লেগে পিঠের নীচে খানিকটা ছড়েই গেল হয়তো। যাক, সরোজের লাভই হলো, পিঠের কাছে কম্বলের যেখানটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সরোজ দু'পাশে কনুয়ের চাপ দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সেখানটা একটু একটু ফাঁসিয়ে দিতে লাগলো। তারপর কোন রকমে একটা হাত বের করে একট ডাল চেপে ধরে, আরেক হাতে কম্বল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। চাঁদের আলোয় নীচে তাকিয়ে দেখলে যে সে শূন্যে ঝুলছে একটী গাছের ডাল ধরে। হাত যদি ফস্কায় কি ডাল যদি ভাঙে, তাহলে একেবারে বিশ-ত্রিশ হাত নীচে পাথরের গায়ে গিয়ে আঘাত খেয়ে চূর্ণ হয়ে যেতে হবে।

তারপর আত্মরক্ষার চেষ্টা। একটির পর একটি করে গাছের ডাল ধরে ওঠা। অন্ধকারে গাছে কোন সাপ আছে কি না কে জানে।

শেষে রেল লাইনের উপর উঠে আসতে সরোজ ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। পূর্ব আকাশে তখন প্রভাতী সূর্যের আলোর আভাস জেগেছে।

রেল লাইনের ওধার দিয়ে সরু একটি পায়ে চলা পথ। সেখানে পৌঁছে একটি গাছের তলায় বসে সরোজ খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলে। দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু বন। রেল লাইনটা ঘুরে ঘুরে ওপাশে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। একটি লোকের মুখ দেখারও উপায় নেই, তবে পায়ে-চলা পথটা পাওয়া গেছে—এই যা সান্ত্বনা। শিবপদ কি চালাকির খেলাই খেললে। একটু অসাবধান হয়েছে আর সেই ফাঁকে সে কি কীর্তিই না করে গেল! সনির কি হলো কে জানে! তবে এখন যদি সে একবার তাকে হাতে পেত তাহলে এক ঘুসীতে তার মাথাটি গুঁড়ো করে দিত।...

সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠলো !

ওদিকে পথের মুখে দু'জন খাসিয়াকে আসতে দেখা গেল। দু'জনের কাঁধে বাঁক ভর্তি কি সব জিনিষপত্র। কিছুক্ষণ বাদে তারা কাছে এলে সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—আবাতী সর্দারের গাঁ কোন দিকে জান ?

দু'জনের একজনও সরোজের কথা বুঝতে পারলো বলে মনে হলো না। তাদের জবাব না দিতে দেখে সরোজ আবার জিজ্ঞাসা করলে—আবাতী সর্দারের গাঁও ?

এইবার যেন সরোজের কথা তারা বুঝতে পারলো বলে মনে হলো। তাদের মধ্যে একজন সরোজের কথার জবাব দিলে, সরোজ সব বুঝলে না, শুধু বুঝলে কয়েকটি মাত্র শব্দ—না…ভয়…খাবা…ভয়…দুষমন সর্দার…

সরোজ আবার জিজ্ঞাসা করলে—কতদূর ? কোথায় ? কত পথ ?

লোক দুটি এবার হাত দিয়ে পাহাড়ের অনেক নীচে দূরের একটা জংগল দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সরোজ দেখলে পকেটের রিভলভারটি ঠিক আছে, সেটি শিবপদ নেয়নি। তবু একটু ভরসা আছে। পথের মাঝে যা হোক কিছু খাবার মিলবে ভেবে সরোজ সেই পথ ধরে চললো।

—সতেরো—

পাহাড়ী জংগল।

কোথায় যে এই পায়ে-চলা পথের শেষ হয়েছে কে জানে ? চল্‌তে চল্‌তে সরোজ শ্রান্ত হয়ে পড়লো। পথে একটি গ্রাম পেয়ে সেখানে এক লোকের বাড়ীতে অতিথি হয়ে কিছু আহারাদি করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে সরোজ আবার বেরিয়ে পড়লো।

জংগলের মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

চল্‌তে চল্‌তে পরিশ্রান্ত সরোজ একটি গাছে চড়ে বসলো। রাতটা এই গাছে বসেই কাটিয়ে দিতে হবে। যদি সারারাত বসে থাকতে থাকতে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলেই তো এই ডালের উপর থেকে নীচে পড়ে হাড় ভেঙে যাবে। কাজেই সরোজ কোমরের বেলট্‌ দিয়ে একটা ডালের সংগে নিজেকে বেঁধে ফেললে, যদি পড়ে যায় তাহলেও কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলবে তো !

এদিকে রাত্রির অন্ধকার জমাট্‌ বেঁধে উঠলো। চুপ করে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে সরোজের দু'চোখ ঘুমে ঢুলে আসতে লাগলো। সামনের দিকে তার মাথাটি এক একবার ঝুঁকে পড়তে থাকে, সংগে সংগে সে সজাগ সতর্ক হয়ে উঠে বসে।

—গোঁ—য়োঁ য়োঁ—হুম্‌—ম্‌—ম্‌—

—উঃ—আঃ—

পশুর গর্জন আর মানুষের চীৎকার সরোজকে চকিত করে তুললে। একটু আগেই চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় সামনের গাছের পাতাগুলো

সরিয়ে সরোজ দেখলে পথটি যেখানে ঢাল্ হয়ে পাহাড়ের নীচে নেমে গেছে সেইখানে একটি লোকের বাঁ হাতখানি একটি চিতাবাঘে কামড়ে ধরেছে, লোকটি আরেক হাতে একখানি টাঙির মত অস্ত্র নিয়ে চিতাটিকে আহত করবার চেষ্টা
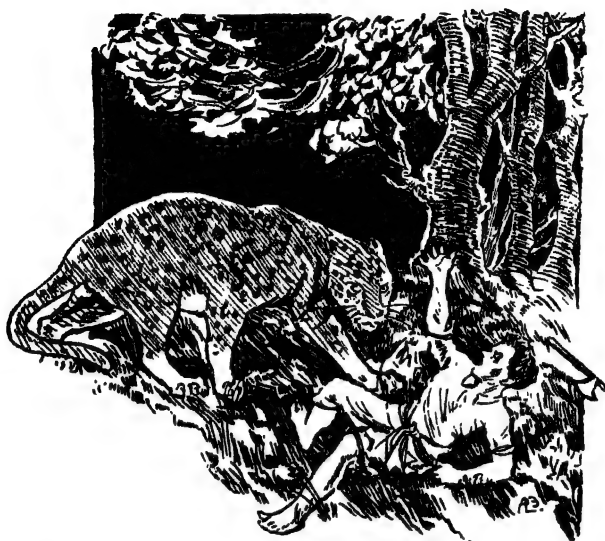
করেছে। দু'একবার আঘাত করতেই চিতাটি লোকটিকে এক ঝট্‌কা মেরে মাটির উপর ফেলে দিলে, এইবার বুঝি সামনের দু' থাবা দিয়ে তাকে চিরে ফেলবে।

এক সেকেণ্ডে সরোজ কোমরের বেল্‌ট থেকে পিস্তলটা টেনে নিলে, তারপর লক্ষ্য ঠিক করে ঘোড়া টিপলে—দুম্-ম্-ম্—

গুলি খেয়েই চিতাটি লাফিয়ে উঠলো, তারপর লুটিয়ে পড়লো মাটির উপর। সরোজের বুক ফুলে উঠলো—সে কোনদিন শিকার করেনি, প্রথম গুলিতেই এতবড় একটি চিতা। ত্বরিতর করে সরোজ গাছ থেকে নীচে নেমে এলো। লোকটি তখনও সেখানে পড়ে আছে, ব্যাপারটি সে তখনও বোঝেনি। সরোজ তাকে গিয়ে ধরে তুললে, বিশেষ কিছুই হয়নি, শুধু হাতটি জখম হয়েছে মাত্র। তারই কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে সরোজ তার হাতে পট্টি বাঁধতে সুরু করলে।

লোকটি সুন্দর বাংলা জানে। কলিকাতায় শাল কাঠের ব্যবসা আছে, হিসাব-নিকাশ করতে প্রায়ই সেখানে যায়। আলাপ জমে উঠতেই জিজ্ঞাসা করলে—এই জঙ্গলে রাত্রে শিকার করতে এসেছেন বুঝি?

সরোজ সত্যি কথাই বললে,—না, শিকারের জন্য নয়, একটু বিপদে পড়েই এসেছি।

—বিপদে পড়েছেন? কি রকম?

সরোজ সব খুলে বললে।

লোকটি বললে—হ্যাঁ, আমি ওদের আড্ডা জানি, ও একটি ডাকাতের দল। মাঝে মাঝে অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দেয় বলে গুজব শুনেছি। আমার একটি চাকর আছে সে ওদের দলেরই লোক, সে আপনাকে কিছু-কিছু সাহায্য করতেও পারে। আপনি যখন আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছেন তখন আপনার যাতে উপকার হয় তা আমি করবো। চলুন, কাছেই আমার বাড়ী, সেখানে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

লোকটি সরোজকে নিয়ে এগোলো।

চলতে চলতে সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নামটা তো জানতে পারলাম না?

—আমার নাম জমাল বড়ুয়া। এ অঞ্চলে সবাই আমাদের চেনে। আসুন, এই দিকে।

রাত্রির অন্ধকারে সরোজকে সে নিয়ে চললো। সরোজের সন্দেহ হতে লাগলো, এই আবার আবাতী দলের কেউ নয়তো।

—আঠারো—

পরদিন সকালে প্রভাতী সূর্যের আলো পূর্ব আকাশটা ফরসা করে তোলার আগেই জমাল সরোজকে ডেকে তুললে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা তৈরী হয়ে সেই চাকরটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ঘণ্টা ছয়েক অবিরাম চলার পর, দূরে পাহাড়ের কোলে ছবির মত একখানি গ্রাম দেখা গেল। চারিপাশে বড় বড় জংলা গাছ, তারই ফাঁকে মাটির পাঁচিল-ঘেরা একটি গ্রাম।

জমাল বললে—ওই দেখুন, ওইটেই আবাতীদের গাঁ। ওই গাঁয়েই আপনার বন্ধুদের আটকে রাখা হয়েছে।

—ওর মধ্যে থেকে বন্ধুদের রক্ষা করা তো মুস্কিল হবে।

—তা একটু হবে বৈকি, তবে আমরা লুকিয়ে যাব। চাকরটি বলছে ও একটা সুড়ঙ্গ-পথ জানে। একেবারে কালীমন্দিরের মধ্যে আমরা গিয়ে পড়বো। তখন আপনার বন্ধুদের উদ্ধার করা শক্ত হবে না। আমি একটি লোককে পুলিশে খবর দিতেও পাঠিয়েছি।

কথা বলতে বলতে তারা একটি ঝোপের পাশে এসে থামলো।

চাকরটি বললে—এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সন্ধ্যার অন্ধকার না হলে তো আর সুবিধা হবে না।

তিন জনে ঝোপটির মধ্যে বসে রইল। কোন এক সময় তারই পাশ থেকে বড় একটি পাথর ঠেলে সরিয়ে ফেললে। নীচে বেরোলো একটি খাদের সুড়ঙ্গ পথ। অনেক দিনের পুরানো। অন্ধকার। টর্চের আলোয় দেখে দেখে তিনজনে নামতে লাগলো। খাদ যেন আর শেষ হতে চায় না।···

এরপর কিছুক্ষণ বাদে, একটা ছোট নীচু গর্তের মুখে এসে তিনজনে থামলো।

চাকরটি বললে—ওপাশে খানিক নীচুতে লাফিয়ে পড়তে হবে। একটু শব্দ হলে মুস্কিল, আবার পড়ে গেলেও হাত পা ভাঙবে। ওপাশে বড় পাথরটির সংগে একটি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে ভাল হয়। সেই দড়ি বেয়ে তিনজনকে নিঃশব্দে ওপাশে নামতে হবে, কিন্তু খুব সাবধান বাবু, এখন প্রতি পদে পদে বিপদ।

—কিন্তু বিপদ বলে তো এখন পিছিয়ে আসা চলে না—বলে সরোজ পাথরের সংগে একটি মোটা দড়ি বাঁধতে সুরু করে দিলে।

একটু বাদেই নিঃশব্দে দড়ি ধরে তিনটি লোক ওপাশের অন্ধকারে নেমে গেল।

—উনিশ—

নাট-মন্দির। চারিপাশে মশাল জ্বললেও ঘরের অন্ধকার মোটেই দূর হয়নি। সেই আবছা আলোয় জন কয়েক লোক মিলে একটি ছোট সভা করে বসেছে। তাদের সামনে একটি লোক একটি উঁচু জায়গায় বসে, স্পষ্ট ইংরাজিতে সে যা বলে যাচ্ছে, তার অর্থ এই—

> আজ নববর্ষের ত্রৈমাসিক অমাবস্যা। আজ আমাদের মাতৃপূজার দিন। সেজন্য তিনটি মানুষ আমরা সংগ্রহ করেছি। দু'জনকে কলিকাতা থেকে কেনা হয়েছে, আরেকটি সেখানকার সর্দার আমাদের ফাউ পাঠিয়েছে। দেবীকে নরশোণিতে তৃপ্ত করে, আমরা নববর্ষের জন্য নতুন কাজের ব্রত গ্রহণ করবো।

চারিপাশ থেকে প্রশ্ন উঠলো—কি সে ব্রত? কী—কী?

—আমরা একটি গুপ্তধনের ছক্ পেয়েছি, সেইটি এবার উদ্ধার করতে হবে। তোমরা পারবে না?

—নিশ্চয় পারবো,—কেন পারবো না?

—বেশ, তাহলে এদিকে দেবীর পূজা শেষ হোক—বলে তিনি ফিরলেন। ওপাশে কালী প্রতিমার সামনে যে ব্রাহ্মণ বসেছিল, তাকে ইসারা করলেন।

প্রতিমার সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বিনয়, ডেভিড ও সনি পড়েছিল, ব্রাহ্মণ তাদের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলে। ওপাশ থেকে একটি লোক উঠে এলো। প্রকাণ্ড জোয়ান, হাতে প্রকাণ্ড একখানি টাঙি। সনিকে এক হাতে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে সে হাড়িকাঠের সামনে নিয়ে গেল।

এমনি সময় দুম্-দুম্ শব্দ দুটো আগুনের ঝিলিক প্রতিমার পিছন থেকে ছুটে গিয়ে দুটি মশালধারীকে ধরাশায়ী করলে।

সংগে সংগে বাকী মশালধারীরা মশাল ফেলে দিলে। আলোর অভাবে চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ক'জন ছুটে এলো দেবী প্রতিমার দিকে।

সেই হুড়োহুড়ি গণ্ডগোলের মাঝে প্রতিমার পিছন থেকে তিনটি লোক বাহির হয়ে এসে বন্দী তিনজনকে কাঁধে তুলে গা ঢাকা দিলে।

বাইরে এসে সকলের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দেওয়া হলো। দড়ি বেয়ে যখন তারা সুড়ঙ্গের মধ্যে আবার ফিরে এলো, পিছনে তখন 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে একটা ভয়ার্ত চীৎকার উঠেছে।

তারপর—

তারপর সরোজরা নিরাপদে ফিরে এলো কলিকাতায় এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে নিজেদের যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলো।

———

—এক—

খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল একটী খবর ঃ

হাজার টাকা পুরস্কার

আসামের সর্প দেবতা

গৌহাটীর একখানি আসামী পত্রিকায় সম্প্রতি একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী বাহির হইয়াছে। জনৈক বনরক্ষক সাহেবের একজন মুসলমান খানসামা ও একটি নাগা ভৃত্য ছিল, দুজনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। একদিন বিকালে দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া বনের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর চলিয়া যায়, ফিরিয়া আসিবার সময় তাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, ফলে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক পথ খুঁজিয়া পাইবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। আসামের জঙ্গলে রাত্রে হাতী ও চিতাবাঘের ভয় আছে. তার উপর সেদিন আবার অমাবস্যা, জ্যোৎস্নার আলোয় যে পথ খুঁজিয়া লইবার সুবিধা হইবে তাহাও নাই। সংদিক আলোচনা করিয়া শেষে দুইজনে একটি গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিবার মতলব করিতেছে—এমন সময়ে সহসা কোথা হইতে কয়েকজন লোক অতর্কিতে অন্ধকারে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।

এমনভাবে আক্রান্ত হইবার জন্য তাহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, হাতে তাহাদের একগাছি করিয়া শুধু লাঠি ছিল, শত্রুরা অত্যন্ত সহজে তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিল। খানসামাকে বাঁধিয়া রাখিয়া নাগা চাকরটিকে তাহারা একটু তফাতে লইয়া গিয়া টাঙ্গি দিয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলিল। যন্ত্রণায় চাকরটি যখন আর্তনাদ করিতেছে সেই সময় তাহার নাকের ক্ষতস্থানের উপর একটি বোতলের মুখ চাপিয়া ধরিল। বোতলটি রক্তে ভরিয়া গেলে লোকটিকে

ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া গেল। চাকরটি তখন বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা গেল না।

খানসামাটি এতক্ষণ শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, লোকগুলির মশালের আলো অন্ধকারে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেই দাঁত দিয়া সে হাতের বাঁধন চিবাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন গড়াইতে গড়াইতে একদিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের খাঁজ খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে ঘসিয়া ঘসিয়া সে হাতের বাঁধন কাটিয়া ফেলিল।

তারপর পায়ের বাঁধন খুলিতে আর কতক্ষণ লাগে।

বন্ধন মুক্ত হইয়া সে তাহার বন্ধুর কাছে ছুটিয়া আসিল। বন্ধুর দেহ তখন হিমশীতল হইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। কোন উপায় না দেখিয়া বন্ধুর দেহ কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া যে দিকে শত্রুরা গিয়াছে সেই দিকে চলিল। যাইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। খানিকটা আসিয়াই পায়ে-চলা একটা মেঠো পথ পাইল, সেই পথ দিয়া প্রায় আধঘণ্টা অগ্রসর হইবার পর বনের মাঝেই সে একটু ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল। অন্ধকারে ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিল একটা ছোট গ্রামের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। একটি মানুষকে কাঁধে বহিয়া আনিবার জন্য পরিশ্রম তাহার বড় কম হয় নাই। সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণাও পাইয়াছিল খুব, অথচ কাহারও দরজায় ধাক্কা দিয়া যে আশ্রয় চাহিবে সেটুকু সাহসও তাহার ছিল না। যাহারা তাহার বন্ধুটিকে খুন করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই বাড়ীটা যদি তাহাদের কাহারও হয় তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে একটা গাছতলায় কাঁধের বোঝা নামাইয়া সেখানে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লওয়াই সে স্থির করিল। দরকার কি অজানা-অচেনা জায়গায় কাহাকেও ডাকাডাকি করিয়া।

বসিয়া বসিয়া ঘুম পাইতেছিল।

মাঝে মাঝে একবার চাকরটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল তখনও তাহার জ্ঞান হইয়াছে কিনা, কিন্তু জ্ঞান হওয়া ত দূরের কথা, লোকটি সেই যে হিম-শীতল হইয়া পড়িয়া আছে, দেহে এখন পর্যন্ত একটু উত্তাপও দেখা দেয় নাই। লোকটি কি তবে সত্যই মরিয়া গেল নাকি?

খানসামার গা ছম্ ছম করিতে লাগিল। সর্বনাশ…একটি মড়ার পাশে বসিয়া বসিয়া এই অমাবস্যার রাত্রি কাটাইতে হইবে! কিন্তু সত্যই ও মরিয়াছে কিনা তাহার সন্দেহ হইল। নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না নাকে হাত দিয়া যে দেখিবে তাহার উপায় নাই, নাকটা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খানসামা সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ঝিমাইতেছিল। সহসা মুখের উপর একটা আলো আসিয়া পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে ওদিকের একখানি ঘরের একটি জানালা খুলিয়া গিয়া বাহিরে আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

এতো রাত্রে জংলী খাসিয়ারা আলো জবালিয়া করিতেছে কি? যাক্, উহাদের কাছে আশ্রয় চাহিলে হয়তো পাওয়া যাইবে ভাবিয়া খানসামা ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশব্দে জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের বাসিন্দারা কি সব করিতেছে একবার দেখিয়া লইতে হইবে ত!

কিন্তু ভিতরের ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। দেখিল ঃ ঘরের মধ্যে উপবীত-ধারী এক-জন ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘ কালো সাপের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছে, সাপটা ফণা উঁচু করিয়া আনন্দে এদিক-ওদিক দুলিতেছে। ক্রমেই যেন সাপটা একটু একটু করিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্রমে যেন গর্জনের মতো শোনাইতে লাগিল। শেষে কতক্ষণ পরে বাঁ হাতের কাছে যে বোতলটি এতক্ষণ পড়িয়া ছিল, ব্রাহ্মণ সেটি সাপের মুখের কাছে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে সাপটি বোতলের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিয়া কি যেন খাইতে লাগিল। কি খাইতেছিল খানসামা তখন বোঝে নাই, বুঝিল সাপটি মুখ বাহির করিলে। সাপটির মুখের অর্ধেক তখন রক্তে লাল হইয়া আছে। সাপটা তাহা হইলে এতক্ষণ রক্ত পান করিতেছিল। খানসামাটির এবার মনে পড়িল, তাহার বন্ধুর নাক কাটিয়া ওইরূপ একটা বোতলে করিয়াই তো ইহারা রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—এ রক্ত কি তবে সেই রক্ত

খানসামার মনে হইতে লাগিল হাঁটু দুটি যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিতেছে, দেহের ভার সহিবার ক্ষমতা বুঝি আর পা দুটিতে আর নাই। কিন্তু এখন এতটুকু শব্দ হইলেই বিপদ,—জীবন মরণ সমস্যা! কোন রকমে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে তখন বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ব্রাহ্মণ সাপটীর কপালে সিঁদুর অথবা রক্তচন্দন লেপিয়া দিতেছিল। দেখিতে দেখিতে মন্ত্রের জোরেই হোক বা কোন ঔষধের গুণেই হোক, সাপটি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

হইতে লাগিল, শেষে ক্ষীণতম হইয়া একটা সরু দড়ির মতো হইয়া পাশের একটা ছোট টিনের কৌটার মধ্যে গিয়া ঢুকিল। অতবড় একটা সাপ যে একটা এতটুকু কৌটার মধ্যে থাকিতে পারে প্রত্যক্ষ না দেখিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না—করিতে পারিবে না।

কৌটাটি তুলিয়া রাখিয়া এদিকে আসিয়া ব্রাহ্মণ জানালা বন্ধ করিয়া দিবার আগেই নিঃশব্দে খানসামা সরিয়া পড়িল।

কি করিয়া যে সেই অসহায় অবস্থায় অন্ধকারে জঙ্গলের বুকে তাহার রাত্রি কাটিল তাহা সে-ই জানে।

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার বন্ধুকে ভাল করিয়া দেখিল, দেখিল সে বহুক্ষণ মরিয়া গিয়াছে। তখন কাছাকাছি একটা সর্বোচ্চ গাছে উঠিয়া সে পথ ঠিক করিয়া লইল, তারপর কাঁধে বন্ধুর মৃতদেহ লইয়া সে চলিল সাহেবের আস্তানার উদ্দেশে।

বনরক্ষক সাহেব সব শুনিয়া সেই রাত্রেই লোকজন লইয়া সেই গ্রাম ঘিরিয়া ফেলিয়া সর্প সমেত সপরিবারে ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিলেন।

আদালতে বিচার চলিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছে। বিচারপতি এখনও রায় দেন নাই।

স্বীকারোক্তিতে ব্রাহ্মণ বলিয়াছে যে ইহা শুধু তাহার একার ঘটনা নয়, পাহাড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই ধরণের সর্পপূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি অমাবস্যায় একটি করিয়া নাগার রক্ত সর্প-দেবতাকে পান করাইতে হয়। এই জন্যই নাগারা বিশেষ প্রয়োজনেও সংধ্যার পর বাড়ীর বাহির হইতে চায় না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে বহু গ্রামেই এই ধরণের সর্প-দেবতার সন্ধান পাইবেন। তবে অনুসন্ধান গোপনে করিতে হইবে, কেননা নাগারা এই সর্প-পূজক ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-তন্ত্রকে অত্যন্ত ভয় করে। বেশী কথা বলিতে কি, সর্প-দেবতার পূজার জন্য নিজেদের আত্মীয়ের বিনাশ ঘটিলেও ভয়ে তাহারা পুলিশকে জানাইতে চাহে না।

এই ধরণের নরহত্যাকে বন্ধ করিবার জন্য পুলিশের কর্তৃপক্ষ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। যিনি সর্পসহ একজন সর্প-পূজককে ধরিয়া দিতে পারিবেন তাহাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত একজন লোকও পুরস্কার লইতে অগ্রসর হয় নাই। আসামীরা কি তাহলে জানিয়া-শুনিয়াও এই কুপ্রথাকে সমর্থন করিতে চায়?

—দুই—

খবর পড়েই সরোজ লাফিয়ে উঠলো, বললো—বিনয়দা, এতদিনে করবার মত একটা কাজ পেয়েছি, আমি আসাম যাব।

—কি কাজ ?—সকলে অবাক হয়ে মুখের পানে তাকালো, কাগজের খবরটা তখনও কেউ পড়েনি।

—শুনুন তবে কি কাজ—সরোজ খবরটা পড়ে শোনালো।

সনি বললো—হাজার টাকার জন্য কি শেষে আপনি আসামের জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন ?

—হাজার টাকাটাই শুধু দেখলে, কেমন এড্ভেঞ্চার হবে বল দেখি। বসে বসে চা খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে, বায়োস্কোপ দেখে বুড়ো হয়ে গেছি—বেঁচে আছি কি মরে গেছি তা বুঝতে পারছি না।

বিনয়বাবু বললেন—ঠিক কথা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। এমন ভাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

সনি বললো—আমিও যাবো।

ডেভিড বললো—why not I ?

বিনয়বাবু বললেন—না, সকলের যাবার দরকার নাই, সনির কলেজ আছে, তার উপর সামনেই পরীক্ষা, ডেভিডের চাকরী ছেড়ে যাবার দরকার নাই। যাব আমি আর সরোজ।

বিনয়বাবুর কথার উপর আর কেহ কথা বলে না। তথাপি ডেভিড বললো—কিন্তু আপনারা যদি বিপদে পড়েন ?

—যদি সত্যি কোন বিপদে পড়ি তখন তোমাদের টেলিগ্রাম করবো, তোমরা যেও।

—যদি টেলিগ্রাম করার কোন উপায় না থাকে ?

—লোক দিয়ে খবর পাঠাবো সহরে। সে ঠিক ব্যবস্থা করবো, তোমরা ভেবো না। আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে মানুষ-খেকোদের মধ্যে যে লোক স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটিয়ে এসেছে সে কি আর আসামের জঙ্গলে ভয় পাবে ?

এ কথার পর আর কিছুই বলা চলে না।

কথায় আছে শুভস্য শীঘ্রং, বিনয়বাবু ও সরোজ আর দেরী করতে পারলো না, সেই দিনই লটবহর নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলো।

—তিন—

কামরূপ চমৎকার জায়গা।

পাহাড়টীর বুকে অত্যন্ত সাধারণ একটি মন্দিরকে ঘিরে ছোট একটা সহর গড়ে উঠেছে। উঁচুনীচু পথের পাশে উপরে ও নীচে বাড়ীর সারি, আশ্রম আর পার্বত্য গাছ। শেষে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথটী কোথায় নিরুদ্দেশের সন্ধানে ছুটে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে দু'চারজন পাহাড়িয়াকে আসতে কি যেতে দেখা যায়, বুঝা যায় জঙ্গলের ভিতরে পথটি বেঁচে আছে।

দুই বন্ধুতে এখানে এসে উঠেছে।

সরোজের ইচ্ছা এইখান থেকেই খোঁজ-খবর নিয়ে বের হবে। বিনয়বাবু তাতে আপত্তি করেন নি।

প্রথমে কয়েকদিন তো কোন সুবিধা হলো না। পুলিশের কাছ থেকে তো আর সন্ধান পাওয়া যাবে না। তারা জানলে তো নিজেরাই একটা কিছু ব্যবস্থা করতো। সন্ধান নিতে হবে এদেশী জংলীদের কাছ থেকে। তা'ও সহসা কেউ বলবে না, আলাপ জমাতে হবে, বকশিস দিয়ে বশ করতে হবে।

সরোজ আর বিনয়বাবু তেমনি একজন লোকের সন্ধান করছিলেন। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন একজন লোকের সন্ধান মিলে গেল।

বিকেলবেলা দুই বন্ধুতে পাহাড়ের এক কিনারায় বসে দূরের পানে তাকিয়ে ছিলেন। দূরে ব্রহ্মপুত্র এঁকেবেঁকে সোনালি সূর্যের আলো গায়ে মেখে অশ্রান্ত গতিতে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছুটে চলেছে। চারিপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল পাহাড়ের সারি। নরম মাটির বুকে কঠিন পাথর জম্মেছে, জগতের বেদনা ও অত্যাচার সয়ে সয়ে আর সইতে না পেরে মাটীও বুঝি পাথর হয়ে গেছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, জগতের অন্যায়কে বুঝি সে শাসন করতে চায়। আবার সেই কঠিন পাথরের বুকেও রসের সন্ধান নিয়ে ঘাস জন্মেছে। গাছের সারি হাওয়ার দোলায় মাথা দুলিয়ে, শাখা কাঁপিয়ে, পাতার মর্মরধ্বনি তুলে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। তারই পাশে পাশে চোখে পড়ছে দু-পাঁচখানি কুঁড়েঘর আর খানিক শ্যামল ধূসর ক্ষেত। কার্পেটের উপর বোনা ছবির মত সেই দৃশ্যকে দু'পাশে রেখে হুইশ্‌ল্ বাজিয়ে মাঝে মাঝে অজগর সাপের নিঃশ্বাসের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এঁকে-বেঁকে এক একখানি ট্রেন ছুটে চলছে, বিরাট স্তব্ধতার মাঝে এক একবার বিরাম ঘটছে। একদিকে প্রকৃতির সুদৃশ্য অখণ্ড স্তব্ধতা, আরেকদিকে মানুষের হাতে-গড়া ফুঁসিয়া-উঠা গর্জিত রেলগাড়ী, দেখতে ভাল লাগে, চোখ ফিরাতে ইচ্ছা করে না।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

বিনয়বাবু বললেন—দেখ সরোজ, এই ফাঁকে দু'এক দিনের মধ্যে ঐ দ্বীপটা একবার ঘুরে আসতে হবে।

বিনয়বাবু ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটা দ্বীপ লক্ষ্য করে কথাটা বললেন।

সরোজ বললো—ও, ওই দ্বীপটির ওখানে মন্দিরও আছে—উমানন্দ ভৈরব, বেশ জায়গা, আমারও যাবার জন্য লোভ হয়, চলুন-না কাল যাই। কিন্তু ওর এদিকে একটা কতবড় ঘূর্ণী রয়েছে দেখেছেন। এখান থেকে কতবড় দেখাচ্ছে, আমার তো মনে হয় ওর পরিধি এক মাইলের কম নয়।

—ওর জন্য কিছু আটকাবে না বাবু, আপনারা যদি কাল যেতে চান তো বলুন, আমার নৌকা রয়েছে।

দু'জনে চমকে উঠলো—এতক্ষণ একটি লোক যে তাদের কথা শুনছে তারা দু'জনে টের পায়নি। মুখ ফিরিয়ে বিনয়বাবু দেখলেন : একজন সাধারণ মাঝি গোছের লোক, জিজ্ঞাসা করলেন—কতক্ষণ লাগবে দেখে ফিরে আসতে?

আট—সকালে বেরোলে সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারবেন বাবু।

গেছে তারই কালই যাবো—কি বল সরোজ?

প্রকৃতির খে —বেশ?

আকাশের জি আপনাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিন বাবু, কাল সকালে ডেকে তারই এ

দেখে জু লা ; বলে বিনয়বাবু উঠে জুতো পরতে লাগলেন ; সরোজও উঠে সাধ

পথ চলতে চলতে মাঝি বললো—সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবেন বাবু, নে বড্ড চিতার ভয়। তার উপর একটি হুজুগ উঠেছে বাবু, এখানকার একদল বামুন নাকি মানুষের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষে। পশুর হাত থেকে বাঁচা যায় বাবু, কিন্তু মানুষের হাত থেকে বাঁচা শক্ত। এক্সঙ্গে পাঁচ-দশ জন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন বাবু!

—সত্যি? এমন লোক এখানেও আছে নাকি? কই, তাতো শুনিনি—সরোজ এমনভাবে কথাগুলো বললো যেন সে কিছুই জানে না।

—আমিও তো শুনিনি বাবু, তবে ক'দিন ধরে শুনছি এমনি একটা সাপ-পুজা-করা বামুনকে নাকি পুলিশে ধরেছে।

লোকটা মুখে জানি না বললেও সরোজের সন্দেহ হলো যে সে অনেক কিছু জানে কিন্তু তার কাছ থেকে আর কোন কথা জেনে নেবার আগেই মাঝি বাড়ী দেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে ওঠার আগেই তাকে বাড়ী পৌঁছতে হবে। যাবার সময় সে বলে গেল কাল সকাল আটটার সময় আসবো বাবু, তৈরী থাকবেন।

সকালে সবে স্নান শেষ করেছে এমন সময় মাঝি এসে হাজির, বললো—একটু আগেই এলাম বাবু, তাগিদ না দিলে তো দেরী করবেন, সেই জন্য।

তখনও আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী আছে, তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে মাঝির সঙ্গে দু'জনে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমিনগাঁর ঘাটে এসে সরোজ ও বিনয়বাবু নৌকা ধরলো। নৌকায় আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। বেশ সুপুরুষ, জোরালো চেহারা, পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে বুকের ছাতিটা বেরিয়ে আসছে। বয়সও বেশী হয় নি। প্রথম দৃষ্টিতে কেমন যেন আলাপ করতে ইচ্ছা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমলো। তিনি কলিকাতার নাম-করা চোখের ডাক্তার, অত কম বয়সেই চোখ সম্বন্ধে নূতন গবেষণা করে যথেষ্ট সুনাম করেছেন। তিনি নাকি জন্মান্ধেরও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সরোজ তো শুনেই অবাক, বললো—জন্মান্ধ যে, তার কি কখন চোখ হয়?

—নিশ্চয়ই হয়। আমি নিজে পরীক্ষা করে সফল হয়েছি। মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় ডাক্তারদের চোখের সামনে দেখিয়েছি, স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে

আমার সম্বন্ধে ছবি দিয়ে অনেক কথা লিখেছিল, তার কাটিং বিনয়বাবু
আছে, আপনাদের দেখাব'খন।

—কেমন করে তা সম্ভব হয়?

—ডাক্তার না হলে আপনারা তা ঠিক বুঝবেন না। তবে এ- থেকে তো রাখুন যে, যে লোক জন্মান্ধ হয়ে জন্মেছে সে চোখে কিছুতেই দেখ- ব্যবস্থা আর শত চেষ্টা করলেও সে চোখ কোন রকমে শোধরানো যায় না। কেউ যদি কোন লোক পাওয়া যায় যে আগে চোখে দেখতে পেত, তবে সম্প্র- কারণে চোখ খারাপ হয়ে গেছে, কোন দৃষ্টিবান লোকের চোখের মনি খ- নিয়ে সেই চোখে অপারেশন করে ফিট করে দিলেই সে দেখতে পাবে—অন্ত আমার তো এই চেষ্টা সফল হয়েছে।

—আপনিই কি প্রথম এইটা আবিষ্কার করেছেন?

—না, ইউরোপের আর একজন ডাক্তার এই নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন এবং তিনি অনেক অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত এই নিয়ে কেউ কোন চেষ্টা করেননি, সেদিক থেকে আমিই প্রথম।

—তাহলে আপনিই এখন অদ্বিতীয়?

প্রশংসা শুনে ডাক্তারের মুখে হাসি দেখা দিল।

বিনয়বাবু বললেন—কতজনকে সারিয়েছেন আজ পর্যন্ত?

—মাত্র তিনজনকে। সব সময়ে তো আর ভাল লোকের চোখ পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে মুস্কিল। কানা তো বহু, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আর তাদের চোখ দিতে পারছি না। ভাল লোক কে আর স্বেচ্ছায় অপরের জন্য চোখ দিতে চায় বলুন?

—সত্যি কথা—দু'জনে মাথা নাড়লো।

ডাক্তার তখন নিজের গবেষণার কথা ভাল করে ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন।

—চার—

উমানন্দ ভৈরব জায়গাটা সুন্দর।

নদীর বুকে একটা পাহাড়ী দ্বীপ। তার একপাশে একটি মন্দির আর কয়েক ঘর জেলের বাস, বাকীটা পাহাড়ী জঙ্গল। ব্রহ্মপুত্রের জল তীব্র গতিতে ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, মনে হয় এখনি নদীর স্রোতের মুখে দ্বীপটাকে টেনে নিয়ে সামনের ঘূর্ণীটার মধ্যে ফেলবে। ঘূর্ণীর শোঁ শোঁ টানের মুখে মন্দির ও গাছ-পালা কোথায় হারিয়ে যাবে।

মনে ভয় হয়।

কিন্তু দ্বীপের বুকে পা দিয়ে হয় আনন্দ।

দ্বীপ তো নয় যেন একটা পাহাড়ী জাহাজ, জলস্রোতের মাঝে ভেসে চলেছে। এমনি করেই বুঝি অনন্ত নাগের কোলে অনন্ত জলের বুকে সৃষ্টির প্রথম দিনে নারায়ণ ভেসে ছিলেন। চমৎকার! দু'পাশে নদের সীমানা যেখানে শেষ হয়ে

অ্যাডভেঞ্চার অমনিবাস

গেছে তারই কোল ঘেঁসে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি উঠেছে—সীমাহীন প্রকৃতির খেয়ালে মাটি মাথা তুলেছে, মেঘকে ছাড়িয়ে আরো উঠতে চায়, আকাশের ওই নীলপর্দার উপরে, সৃষ্টিকর্তা ভগবান কোথায় লুকিয়ে আছেন তারই একবার সন্ধান নিতে চায়। মাটির উপরে উঠবার এই অপারসীম আগ্রহ দেখে জল নীচের দিকে নামতে চাইছে, ঘুরে ঘুরে ঘন গর্জনে নীচে নামবার সাধনা করছে, পৃথিবীর নীচে এই মাটীর বাধার শেষে কি আছে দেখতে চায় বুঝি। জলে ও মাটীতে প্রতিযোগিতা চলছে—মাটী যদি আকাশে উঁকি মারতে চায় জলই বা পাতালে যাবার চেষ্টা করবে না কেন?

ছোট পাহাড়ের উপর উমানন্দ ভৈরবের মন্দির। মন্দিরের চত্বরে বসে বসে চারিপাশে শুধু চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। মুখের কথা হারিয়ে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে শ্যামল জন্মভূমির প্রতি মমতা জাগে—সোণার ভারতকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

সহসা সরোজ স্বর করে গেয়ে উঠলো :

আমার এই দেশেতে জন্ম মাগো
যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক' তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভুমি।

দুহাত জোড় করে ভারতমাতার উদ্দেশে সে প্রণাম করলো।

বিনয়বাবুও।

ডাক্তার হেসে বললেন— খুব যে দেশভক্তি দেখছি, কবি না এনার্কিষ্ট?

দুজনের কেউই জবাব দিলে না, ডাক্তারের এ ধরণের উপহাস তাদের ভাল লাগলো না।

—পাঁচ—

দুপুরের দিকে সহসা মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হলো।

আশা হয়েছিল কিছুক্ষণ বাদেই বৃষ্টি থামবে, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বাদেও বৃষ্টি থামবার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তবে মাঝে একটু কম পড়লো।

মাঝি বললো—বাবু, এখন না বেরোলে আজ আর পৌঁছানো যাবে না।

— বেশ চলো, আমরা তৈরী।

মন্দিরের পুরুত ঠাকুর বললেন – কিন্তু এখন না গেলেই আপনারা ভাল করতেন। দেখছেন তো আকাশে মেঘের অবস্থা, আবার এখনি হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হবে। তার উপরে সামনে ঘূর্ণী, জল-ঝড়ে ঘূর্ণীর টান আরো বেড়ে গেছে। আজ এখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করলেই পারতেন, আমার বাড়ীতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তার হেসে বললেন—আর তাতে তোমারও দু'পয়সা লাভ হবে, আমরা তো খেয়ে-দেয়ে কিছু না দিয়ে পারবো না।

পুরুত ঠাকুর বললেন—তাই যদি আপনারা মনে করেন বাবু, তবে আপনারা যান।

নৌকায় উঠে ডাক্তার বললেন—বাবা, তোমরা পাণ্ডা, কোথায় কোন্ ফিকিরে পয়সা আদায় করা যাবে তারই খালি মতলব করছ।

পুরুত আর কোন কথা বললেন না।

নৌকো ছেড়ে দিল।

ঘূর্ণীকে পাশ কাটিয়ে নৌকাখানি কিছুদূর আসতে না আসতেই পুরুতের কথা ফলে গেল। আকাশে যে কালো মেঘগুলি এতক্ষণ সূর্যকে ঢেকে অন্ধকার করেছিল, এবার তারা মুষলধারে ঝরে পড়লো। আকাশের চোখের জল মুছাবার জন্য বাতাসের আঁচল এগিয়ে এলো। সে আঁচলের ধাক্কা সয়ে জলের মধ্যে নৌকা ঠিক রাখা কঠিন হলো। নৌকা সামলাতে গিয়ে তীরে পেঁছানো আর হলো না, নৌকা হেলে-দুলে গিয়ে পড়লো একেবারে মাঝ দরিয়ায়। মাঝি একবার জিজ্ঞাসা করলো—বাবুরা সাঁতার জানেন তো?

বিনয়বাবু ও সরোজ মাথা নাড়লো—হ্যাঁ, তবে এখানে কুমীরের ভয় আছে নাকি?

—না বাবু, কুমীর তো বড় একটা চোখে পড়ে না।

ডাক্তার মুখখানি গম্ভীর করে বললেন—কিন্তু মশাই, আমি তো ভাল সাঁতার জানি না।

সরোজ হেসে বললো—ভাল জানেন না তো খারাপ জানেন তো? প্রাণের দায়ে তাই তখন ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁতারের দরকার হলো না। ঘণ্টাখানেক ঝড়-জলের সঙ্গে যুঝে মাঝি মাইল চার পাঁচ দূরে নদীর তীরে নৌকা ভেড়ালো।

সেইখানে নামতে হলো।

একেবারে অচেনা জঙ্গল।

মাঝি বললো—কি করি বলুন বাবু, এই ঝড়-জলে নৌকা যে তীরে ভিড়িয়েছি সেই আমার বরাত জোর।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—তা হলে কি এইখানে আজ রাত্রে পড়ে থাকতে হবে নাকি?

—কি করি বলুন বাবু? ঝড়-জল না থামলে আর নৌকা ছাড়তে ভরসা হয় না। তার উপর রাত্রে অন্ধকারে নৌকা চালাতে এখানে অনেক অসুবিধা আছে বাবু। চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত সবুর করতে হবে।

—চাঁদ উঠবে কি, আজ তো অমাবস্যা!

—অমাবস্যা? তবে?

মাঝির মুখ কালো হয়ে উঠলো।

ডাক্তার এইবার আফশোষ করলেন—তাইতো, আগে এমন জানলে উমানন্দ ভৈরবে থাকলেই হতো।

বিনয়বাবু বললেন—কিন্তু তা যখন হয়নি, এখন সে কথা ভেবে লাভ কি ? (তারপর মাঝির পানে ফিরে বললেন) দেখ মাঝি, একটা উঁচু গাছে চড়ে দেখ ত, কাছাকাছি কোন গাঁ আছে কিনা।

—হ্যাঁ বাবু, এইটাই কাজের কথা—বলে উপর দিকে চোখ তুলে কোন্ গাছটার মাথা অন্যগুলিকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে তাই দেখতে লাগলো।

—ছয়—

গ্রামের সন্ধান মিললো না।

গাছে উঠে মাঝি বললো- কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই বাবু, কেবল জঙ্গল।

—তাহলে উপায় ? তিনটে লোক থাকবো কোথায় ? খাবই বা কি ?

—নৌকার ছাউনির মধ্যে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিন বাবু।

—আজ রাতটা তা'হলে উপোসেই যাবে ?

—আমার তো আর কোন দোষ নেই বাবু এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাই বলুন ?

দুর্যোগ তখনও সমানে চলছে। গাছের নীচে দাঁড়ালে কি হবে ? মাঝে মাঝে গাছের পাতা বেয়ে গায়ে মাথায় জল পড়ে বিরক্ত করে তুলছে।

সকলে মিলে আবার নৌকার ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

মাঝি আরেকটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নৌকাখানা বাঁধলো, স্রোতের টানে রাত্রিতে যেন ভেসে না যায়।

— সাত —

নৌকার ছাউনীর মধ্যে বসে আজগুবি ভুতুড়ে গল্প সুরু হলো।

ডাক্তার বললেন—আমাদের হাসপাতালের মড়াখানায় রাত বারোটার পর যে যেতে পারে তাকে বলি বাহাদুর : সেবার হয়েছিল কি জানেন ···

ছাত্রাবস্থায় ডাক্তার কবে বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে এক ভাঁড় মাংস নিয়ে মড়াখানার চারিপাশে রাত বারোটার সময় একবার ঘুরে আসতে গিয়েছিলেন, ফিরে আসবার সময় কোন নিমগাছের ছায়ায় কে যেন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে হাতের মাংস কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল, তারপর কেমন করে ডাক্তার মাংসের ভাঁড় রক্ষা করেছিলেন, সেই ভীতিজনক কাহিনী ডাক্তার বলে চললেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভুতুড়ে গল্প শুনতে বেশ লাগে। তারপর সরস করে গল্প বলবার ধরণটাও ভারী সুন্দর !

সরোজ বললো—আপনার ওসব ভুতটুত আমি মানিনে। আফ্রিকার অমন জঙ্গলে আমরা কত রাত কাটিয়ে এলাম, কিছু হলো না, আর এ তো কলকাতার সহর ! সে ভুত নয়, মানুষ-ভুত।

বিনয়বাবু হাসলেন।

ডাক্তার ক্ষেপে গেলেন।

সরোজ বললো—ভূত নেই।

ডাক্তার বললেন —আছে! আমি দেখেছি!

অনেকক্ষণ এই সব তর্ক-বিতর্ক করতে করতে শেষে কখন যে তিন জনে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা জানে না।

—আট—

কোন এক সময় কি যেন একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অন্ধকার গভীর রাত। কাছের মানুষকেও ঠিক ঠাহর করা যায় না। বিনয়-বাবু চুপ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ছপ্...ছপ্! ছপ্...ছপ্!

বিনয়বাবু সরোজের গায়ে হাত দিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন —সরোজ!

জবাব হলো —শুনেছি।

—দেখবে?

—অন্ধকারে ঠাহর হবে না।

আবার শোনা গেল —ছপ্-ছপ্ ছপ্-ছপ্—

কে যেন এক হাঁটু জল ভেঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে—

বিনয়বাবু উঠে পড়লেন, বললেন—বাঘ না আর কিছু?

সরোজ বললো—মানুষও তো হতে পারে।

—তাহলে উপায়? হাতিয়ার?

—পেন্সিল-কাটা ছুরি যা পকেটে আছে।

—তাইত, তবে কি করা যায়...হ্যাঁ, ঠিক, ওর চেয়ে ভাল হাতিয়ার আছে নৌকার দাঁড়, এসো বাইরে এসো।

দু'জনে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো। বাহিরে এসে অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হলো না। নৌকার দাঁড় দু'খানি দুজনে তুলে নিলে। ঠিক সেই সময়ে নৌকাখানি সজোরে একবার দুলে উঠলো। তাল সামলাতে গিয়ে সরোজ আর বিনয়বাবু যেই হেলে-দুলে ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি শট্ করে কি যেন একটা তাদের গায়ে এসে লাগলো। মনে হলো একসঙ্গে যেন চোখের সামনে একশো বিদ্যুৎ জ্বলে উঠে পায়ের নীচে মাটি ফেটে গেল, মাথায় যেন বাজ পড়লো, আগ্নেয়গিরির মুখ-নিঃসৃত তরল উষ্ণ ধাতুর মধ্যে সারা দেহের সমাধি হলো, একটা মুহূর্তের মধ্যে জগতের বুকে একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটে গেল বুঝি...

দু'জনে জ্ঞান হারিয়ে নৌকার পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়লো।

—নয়—

অসহ্য বেদনায় সরোজ গুমরে উঠলো—উঃ মাগো!

বিনয়বাবু ডাকলেন—সরোজ!

সরোজ চোখ মেললো।

আবার তখনি চোখ বুজলো। নৌকার ছাউনির ভিতর দিয়ে রোদটা একেবারে চোখের উপর এসে পড়েছে। চোখ খুলতেই চোখ ঝলসে গেল।

তবে কি তারা স্বপ্ন দেখছিল নাকি ?

পর মুহূর্তেই সরোজ বুঝতে পারলো—না, স্বপ্ন নয়। পাশ ফিরতেই বুঝতে পারলো যে হাত-পা বাঁধা।

নৌকা হেলে-দুলে নাচছে। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—নৌকা চলছে বিনয়দা ?

—চল্‌ছে, তবে কোথায় যাচ্ছে কে জানে !

—ডাক্তার কোথায় ?

—আছি—ডাক্তারের কথা শোনা গেল।

সরোজ ও বিনয়বাবু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ওপাশের এক কোণে হাত-পা বাঁধা ডাক্তার পড়ে আছেন, মুখে তার হাসি ফুটেছে—দুঃখের হাসি

সরোজ বললো—হাস্‌ছেন যে, ভয় করছে না ?

—ভয় ? কত মড়া কেটে এলাম তবু রাত্তিরে একদিনও ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি আর আজ কতকগুলি জংলীদের ভয় করবো ? ব্যাটারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বল দিকি ?

বিনয়বাবু বললেন নৌকাটা যেদিকে এগিয়ে চলেছে আর রোদটা যেদিকে বেঁকে এসেছে এই দুই মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে আমরা উত্তরদিকে চলেছি —আসামের আরো গভীর জঙ্গলের দিকে।

সরোজ বললো—কিন্তু আমরা এই বিপদ থেকে এখন আত্মরক্ষা করি কেমন করে ? এরা এখন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোথায় কে জানে, শেষে কি হবে কিছুই তো জানা নেই ?

—তা বটেই, তা দেখ একজনের হাতের বাঁধনটা খুলতে পারলেই আর সকলের হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে দেরী লাগবে না, কিন্তু তারপর ? এই ছোট ছোট জানালা দিয়ে তো আর জলে লাফিয়ে পড়া যাবে না। বাইরে যাবার পথ তো বন্ধ।

সরোজ বললো—তার জন্য কি, আমরা তৈরী হয়ে থাকি, যেই দরজা খুলবে অমনি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বো।

—কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না। আমরা মাত্র তিন জন আর বাইরে ওরা কতজন আছে কে জানে। তাই বলছি সে চেষ্টা এখন থাক্‌। এক কাজ কর দেখি, ওরা আমাদের পকেট থেকে কিছু তো বের করে নেয়নি, তুমি আমার ডায়েরীখানা বের কর দিকি—বলে বিনয়বাবু পাশ ফিরলেন, সরোজ তার পাশের পকেট থেকে বাঁধা দু'হাত দিয়ে ডায়েরীখানা বের করে জিজ্ঞাসা করলো —কি হবে ?

—একখানা চিঠি লিখতে হবে। ডায়েরী থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে ফেল দিকি।

সরোজ পাতা ছিঁড়ে বিনয়বাবুর হাতে দিলে। ডাক্তারের কাছ থেকে ঝর্ণা-কলম চেয়ে নিয়ে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় বিনয়বাবু অনেক কষ্টে লিখলেন—

Doctor

Benoy

Saroj

caught by junglees

Captives carried northwards from Umananda Bhairab

1st January

চিঠি লেখা শেষ হলে বিনয়বাবু নিজের পকেট থেকে একটা নস্যির শিশি বের করলেন, সমস্ত নস্যিটুকু ফেলে দিয়ে চিঠিখানি তার মধ্যে ভরে খুব শক্ত করে ছিপি লাগিয়ে জানালা দিয়ে জলে ফেলে দিলেন।

সরোজ বললো—ও চিঠি কেউ পাবে ?

—সে আমাদের বরাত। যদ্দিন শিশির মধ্যে জল না ঢুকবে তদ্দিন ওই শিশি ভাসতে ভাসতে চলবে। যদি কারও চোখে পড়ে আর সে তুলে নিয়ে ব্যাপার না বুঝতে পেরে পুলিশের কাছে জমা দেয় তাহলেই আমাদের লাভ। ডেভিড ঠিক খবর পাবে।

—ওইটুকুই এখন আমাদের ভরসা—বলে সরোজ দুঃখের হাসি হাসলো।

ডাক্তার বললেন—থাক, ও চিঠি কেউ পাবে কি না তার তো কোন স্থিরতা নেই। এখন উপস্থিত প্রাণরক্ষা হয় কি করে তাই বলুন দেখি ? তেষ্টায় তো বুক শুকিয়ে গেছে।

—দেখুন, এক কাজ করুন, গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে ওই দরজাটায় লাথি মারুন, দরজা যে খুলবে তার কাছে ইসারা করে জল চাইবেন। জল দেয় তো ভাল, আর না দেয় তো কথাই নেই। তবে ব্যাটাদের মনের ভাবটা বোঝা যাবে।

—কিন্তু যদি আমাদের ঠেঙ্গিয়ে দেয় দু-চার ঘা ?

—উপায় নেই, হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাংয়ও লাথি মারে।

—তবে তাই করি বলে ডাক্তারবাবু ওদিকে সরে গিয়ে দরজায় জোড়া পায়ে লাথি মারতে লাগলেন।

বাহিরে কয়েকজন কথা কইছিল শোনা গেল।

আবার লাথি।

—দশ—

কথা থামলো, দরজা খুললো। দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো কালো বেঁটে মজবুত চেহারার একজন নাগা। সে কি বললো বোঝা গেল না। ডাক্তার

ইসারায় জল চাইলেন। লোকটা বুঝলো, হাসলো, তারপর বাইরে আরেকজনকে উদ্দেশ করে কি বললো মিনিট কয়েক পরে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ী করে জল এলো। লোকটা মাটীর ভাঁড়ে করে তিনজনকে জল খেতে দিয়ে চলে গেল। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হলো বটে তবে নদীর ঘোলা জল খেয়ে তৃপ্তি হলো না।

জংলীরা কেন যে তাদের বন্দী করেছে কে জানে? ব্যবহার কিন্তু ভালই বলতে হবে। যে দু'দিন নৌকা চললো তার মধ্যে ক্ষুধার আহার ও তৃষ্ণার জল একদিনও অসময়ে পাওয়া যায়নি. কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে কিছু জানবে তা কেউ কথাই বোঝে না, কাজেই জবাব দেবে কি?

বন্দী তিনজনের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হাত-পা বাঁধা বন্দিত্ব কি কারও ভালো লাগে না কোনদিন লেগেছে।

পরদিন সকালে জংলীদের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে হৈ হৈ পড়ে গেছে। ব্যাপার দেখবার জন্য সরোজ উঠে বসলো। ওধারে একটা জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখলোঃ বাহিরে নদীর তীরে নৌকা ভিড়ছে। আর তীরে দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচশো নাগা। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একখানি করে টাঙ্গী আর কোমরে ছোট এক একটি রুলের সঙ্গে একটি করে লোহার ভাটা ঝুলছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপর টাঙ্গী নাচাতে নাচাতে তারা একসঙ্গে তাল দিয়ে চীৎকার করছে, সেই চীৎকারেই সরোজের ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

বিনয়বাবু ও ডাক্তার উঠে বসে সরোজের মাথার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন ব্যাপারটা কি।

সরোজ বললো—কী বুঝছেন বিনয়বাবু?

বোঝা-বুঝির আর কি আছে, হাত পা বাঁধা!

তিনজনের মুখে দুঃখের হাসি ফুটে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে ছাউনীর দরজা খুলে দুজন লোক ভিতরে এলো। একজন সকলের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে, তারপর ইসারা করে বাহিরে আসতে বললো। হাত বাঁধা তিনটী লোক ধীরে ধীরে ছাউনীর বাহিরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে নাগারা দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করে উঠলো ইয়াত পোয়া, ইয়াত পোয়া!

চীৎকারের তালে তালে হাতের পাঁচশো টাঙ্গী রোদে ঝলসে উঠলো। সেদিকে তাকালে ভয় হবার কথা। তবে বিনয়বাবু ও সরোজ অনেক বিপদের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে বলেই অটলভাবে তীরে এসে নামলো। ডাক্তার ভয় পেয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

—এগার—

তীরে এসে নামতেই চারিদিকে হাততালি দেবার ধুম পড়ে গেল, যেন এতগুলি লোক তিনটে লোভনীয় শীকার পেয়েছে।

নাগারা তাদের ঘিরে ফেললে। এক একজনের হাত ধরে দু'জন করে নাগা ইংরাজি কায়দায় এগিয়ে চললো, বাকী সকলে রইল পিছনে। হাতের বাঁধন তখন খুলে দেওয়া হয়েছে।

চলতে চলতে দিনের আলোতেও ধাঁধা লাগে প্রতি পদে। জঙ্গলের মধ্যে এ যে একটা পথ হতে পারে তা বিশ্বাস করার উপায় নেই। গাছের পাতায় পাতায় মাথার উপরটা এত ঘন হয়ে উঠেছে যে পাতার আড়ালে সূর্য উঠেছে বলে তো মনেই হয় না। তার উপর মাটী ক্রমেই উঁচু হতে সুরু হয়েছে। উঠতে উঠতে হাঁটু টন্‌টন্‌ করে ওঠে, বুকে নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যায়। বাংলার সমতল ভূমিতে যার জন্ম পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গতে পারবে সে কতক্ষণ। কিন্তু তা বলে থামবারও উপায় নেই। নাগারা সমতালে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা তিনেক এমনি ভাবে চলার পর গায়ের কাপড়-জামা যখন ঘামে প্রায় সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে এমন সময় তারা পাহাড়ের মাথায় একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে পৌঁছালো। চারিপাশে ছোট ছোট কুটীর আর ক্ষেত, জংলীদের একটা গ্রাম বলে মনে হয়। এই বনের পিছনে এমন একখানি গ্রাম যে থাকতে পারে তা ভাবা যায় না।

ফাঁকা জায়গাটির মাঝে একখানি ঘর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, নাগার দল এদের সেই ঘরে এনে হাজির করলো। ঘরের মাঝে বেতে বোনা একখানি চেয়ারের উপর একটি লোক বসে ছিল আর তার চারিপাশে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন। যারা সরোজ, বিনয়বাবু ও ডাক্তারকে নিয়ে এলো, তারা সামনে এসে ভক্তিভরে প্রণাম করলো। প্রণাম পর্ব শেষ হলে লোকটি তিনজনকে বসতে ইঙ্গিত করলো, যারা ধরে এনেছিল তাদের সঙ্গে কি কয়েকটা কথা বললো, তারা আবার প্রণাম করে পিছু হাঁটতে হাঁটতে বাইরে চলে গেল।

চেয়ারে বসা লোকটি এবার কথা বললো —তুমিই তো চোখের ডাক্তার, না ?

ডাক্তার বললেন হ্যাঁ।

—আর এরা দু'জন ?

—আমার বন্ধু।

—তোমায় এখানে ধরে আনা হয়েছে কেন, জান ? আমার একটি জন্মান্ধ ছেলে আছে, তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু…

কিন্তুর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দেখতে-পায়-এমন একটি লোকের দুটি চোখ চাই, সে লোক আমার আছে।

পাশের দুজন রক্ষীকে সে কি ইসারা করলো, সঙ্গে সঙ্গে তারা বাইরে থেকে একটা ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে এলো। ছেলেটিকে দেখিয়ে সর্দার বললো —

এই আমার ছেলে, ভবিষ্যতে এই জমুজাতির সর্দার হবে, চোখ দুটি ঠিক আছে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

তিন বন্ধু তাকিয়ে দেখলো; সুস্থ সবল কিশোর, সারা দেহ যেন ভাস্করের তৈরী কালো-পাথরের মূর্তি কিন্তু শুধু চোখ দুটির জন্য তার দেহের লালিত্য মূল্যহীন।

সর্দার তখন বললো – ওই মেয়েটির চোখ নিয়ে একে চোখ দিতে হবে— পারবে না?

এমন পরিষ্কার ইংরাজিতে সর্দার কথাগুলি বললো যে মনে হলো সে উচ্চশিক্ষিত।

তিন বন্ধু মেয়েটির পানে তাকালো ঃ ফুটফুটে সুন্দর বছর বারোর মেয়ে, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি তার লাল হয়ে উঠেছে, মুখখানির পানে তাকিয়ে দেখলে কেমন যেন মায়া হয়।

ডাক্তার মেয়েটির পানে তাকিয়ে বললেন—অমন মেয়ের চোখ দুটি নষ্ট করবো?

—কখনো না – সরোজ বললো।

—থামো—সর্দার গর্জে উঠলো—এখানে তোমাদের কথার কোন মূল্য নেই। আমি সর্দার, আমার কথামত কাজ হবে। ওর উপর দয়া করে কি হবে, ও আমাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে। আগামী অমাবস্যার রাত্রে যক্ষদেবের কাছে ওকে আমরা উৎসর্গ করবো, তখন তো একেবারেই মরবে। তার চেয়ে আমার ছেলের জন্য চোখ দুটো দিয়ে যদি প্রাণে বাঁচে সেটা কি ভাল নয়?

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবলো তারপর মেয়েটিকে কাছে ডাকলো—খুকি, শোন।

মেয়েটি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে সে যা বললো তা সব না বুঝতে পারলেও তিন বন্ধুর চোখে জল এসে পড়লো। চোখ নষ্ট করা হবে সে জানতে পেরেছে, তাই কাতর কণ্ঠে জানাচ্ছে—বাঙালী বাবুরা যেন তার চোখ নষ্ট না করেন।

মেয়েটির কান্না শুনে কারও দৃষ্টি কোমল হলো না, ভয়ে মেয়েটি ডাক্তারের পা দুটি জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলে।

অনেক চেষ্টা করে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে শান্ত করে ডাক্তার পা ছাড়িয়ে নিলে, তারপর বললো—সর্দার, মেয়েটি তো চোখ দিতে রাজী নয়।

—ওর রাজী বা গররাজীতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমার মতে এখন ওকে চলতে হবে।

বিনয়বাবু বললেন—মুখে বললেই তো আর কাজ হবে না, অপারেশনের যন্ত্রপাতি ও ওষুধ-পত্র চাই তো?

—সব ঠিক করা আছে।

সরোজ এবার রাগে ফুলে উঠলো—যদি আমরা বলি এ কাজ আমরা পারবো না সর্দার ?

—তুমি চুপ করো ছোকরা, তোমার পারা না-পারায় আমার কিছু আসে যায় না। তারপর ডাক্তার, কবে কাজ শেষ করবে ?

—আমি পারবো না, সর্দার।

—পারবে না ?

—না।

—পারবে না মানে জান তো ? জীবনে আর কোনদিন তোমরা সূর্যের আলো দেখতে পাবে না. মুক্ত বাতাসের সংগে তোমাদের আর কোন পরিচয় থাকবে না, অন্ধকার কারাগারে পলে পলে মরতে হবে। আর যদি আমার আদেশ পালন করো তাহলে তোমাদের অনেক সোনা-দানা দোব।

ডাক্তারের হয়ে সরোজ জবাব দিলে—তোমরা ভুল বুঝেছ সর্দার, আমরা বাঙালীর ছেলে, যা অন্যায় বলে মনে করবো তার জন্য জীবন দিতে পারবো, তবু তাকে স্বীকার করবো না, বুঝলে ?

সর্দার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—ডাক্তার, তুমি পারবে কিনা ?

—পারবো না।

—এখনও ভেবে দেখ ?

—ভেবে দেখেছি সর্দার।

—বেশ—বলে সর্দার দুটি অনুচরের পানে ফিরে কি যেন বললো, তারা এসে তিনজনের হাত বাঁধলো তারপর সেই ঘরের বাইরে নিয়ে এলো।

—বার—

বাহিরে কিছুদূর যেতেই পাহাড়ের বুকে সুড়ঙ্গের মতো একটা পথ দেখা গেল, তার ভিতরে তিন বন্ধুকে নেমে যেতে হলো। যত নীচে নামে ততই অন্ধকার, বাতাসও নেই। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি! এ তো তারা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে, তিন বন্ধু পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে হাসলো—বড় দুঃখের সে হাসি।

আর একটু গিয়ে একটি গুহার মত ঘর পাওয়া গেল। বাতাস চলাচলের পথ নেই। যে আলো আছে তাতে পাশের লোকটীকে বুঝতে পারা যায় বটে কিন্তু চিনতে পারা যায় না। তার মধ্যে তিনজনকে রেখে দিয়ে বাঁশের বেড়া বন্ধ করে নাগারা চলে গেল।

দম বন্ধ হয়ে আসে। পৃথিবীর আলো হাওয়ার সঙ্গে পরিচয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁচবার উপায়ও তো কিছু নাই।

শেষে বিনয়বাবু বললেন—বড্ড ভয় হচ্ছে, না ডাক্তার ?

— না, ভয় আর কি, তবে একটু ভুল হলো। তখন মুখে অতো কিছু না বলে রাজী হয়ে গেলেই হতো। তারপর ফাঁক বুঝে একদিন পালানো যেত।

সরোজ বললো—ওরা কি এতই বোকা ভেবেছেন? আপনাকে ওরা পালাবার সুবিধা দিত? পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে আরো কত কষ্ট পেতে হ'তো এখন পালাবার চেষ্টা না করে ধরা পড়েছি এই সান্ত্বনা।

বিনয়বাবু বললেন—পালানোর কথা এখন ছাড়ো, এই পাহাড়ী জঙ্গলে যাবেই বা কোথায়? ও কথা এখন থাক। পায়ের শব্দ পাচ্ছি, বাইরে বোধহয় শত্রুপক্ষের কেউ আছে, চুপ করো।

সকলে চুপ করলো, বাহিরে সত্যই লঘু পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—তের—

আবছা অন্ধকারে তিনটি বন্ধু চুপ করে বসে রইল। জীবনের মায়া তখন তাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে। এদিকে সময় বহে যাচ্ছে—অনুপল, বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর, দিন পার হয়ে সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে এলো, পূর্বের অন্ধকার এখন অ-দৃষ্ট নিরন্ধ্র হয়ে উঠেছে। জল নেই, খাদ্য নেই, শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। বাহিরে জগৎ যে বেঁচে আছে এখানে বসে তা আর ভাবা চলে না। এখানে জীবন্ত কবর হয়ে গেছে যেন।

সহসা মনে হলো ঘরের সামনে কে যেন এসে দাঁড়ালো। তার পরেই প্রশ্ন শোনা গেল—আপনারা জেগে আছেন?

বাংলা কথা! তারা স্বপ্ন দেখছে নাকি?

আবার প্রশ্ন হলো—আপনারা জেগে আছেন?

নাঃ, তা হলে স্বপ্ন নয়। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—আস্তে! আমি আপনাদের মুক্তি দেবার জন্য এসেছি কিন্তু আস্তে কথা বলবেন, কেউ যেন শুনতে পায় না।

—আপনি কে?

—আমি বাঙালী।

—আপনি এখন এখানে এলেন কেমন করে?

—স্বেচ্ছায় আসিনি, এরা আমায় ধরে এনেছে। চট্টগ্রামে আমার বাড়ী। তলোয়ার চালাতে পারতুম খুব ভাল, তাই এরা আমায় ধরে এনেছিল আমার কাছে সে বিদ্যা শেখার জন্য। আপনারা তো বাঙালী তাই আপনাদের পালাবার সুবিধা করে দেবার জন্য আমি এসেছি।

—কিন্তু এরা যখন জানতে পারবে আপনার কথা, তখন?

—সে জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আপনারা সময় নষ্ট করবেন না, বেরিয়ে আসুন, দরজা খুলে দিয়েছি—লোকটি দরজা খুলে দিল।

এমন সুযোগ কোনদিন কেউ অবহেলা করতে পারে না, তিনজনে ঘর

থেকে বাহির হয়ে এলো। লোকটি বললো—আমার হাত ধরুন, গুহার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চারজনে হাত ধরা-ধরি করে অন্ধকারের বুকে অগ্রসর হলো। কোথাও এতটুকু শব্দ শোনা যাচ্ছে না, পাহাড়টা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে তারা বাহিরে এসে দাঁড়ালো। মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা যেন নবজীবন ফিরে পেলে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুক্তিদাতাকে ভাল করে দেখতে না পেলেও বোঝা গেল। লোকটির মাথার চুল পেকে গেছে। দুর্ভাবনায় ও অশান্তিতে দেহটী সামনের পানে ঝুঁকে পড়েছে। তবে এখনও দেহের পেশীগুলি ফুলে ফুলে আছে, এক সময় যে তলোয়ার চালাবার মত সবলতা তার ছিল তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তিনবন্ধু তার পানে তাকিয়ে আছে দেখে লোকটি বললো—এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন? তাড়াতাড়ি পালান।

বিনয়বাবু বললেন- আপনি যাবেন না?

—না, আমার পালাবার উপায় নাই, আমি এখানে আছি জমু সর্দারের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য।

—প্রতিশোধ?

—আমার আট বছরের মেয়েকে এরা ভল্লুকের মুখে ফেলে দিয়েছে, আমি বাপ হয়ে তা দেখেছি, তার শোধ আমি নেবো না? নিজের জীবনটাই কি সবচেয়ে বড় হবে? যাক্ সে কথা, ওই দেখুন ওরা মশাল জেলেছে, আপনারা পালান।

—কোনদিকে যাব?

—ওই যে নীচে দেখছেন, ওই দিকে বরাবর নেমে যান। ওই নদীর তীরে বাঁ দিকে মাইল পাঁচেক গেলেই জংলীদের আর এক আড্ডায় গিয়ে পড়বেন, তারা এদের চেয়ে ভদ্র। সেই যে মেয়েটি দেখেছেন, ওটি তাদেরই সর্দারের মেয়ে, এরা চুরি করে এনেছে। তাদের কাছে সব কথা বললে তারা যথেষ্ট সাহায্য করবে—যান, আর এদিকে এক মিনিটও দাঁড়াবেন না। মশালের আলোগুলো কাছে আসছে।

তিনজনে তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে নামতে আরম্ভ করলো।

—চৌদ্দ—

খানিকটা নেমে এসেছে সহসা পাহাড়ের মাথায় হাতের তালি দেবার শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে একটা অস্পষ্ট গণ্ডগোল ও চীৎকারের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের মাথায় মশালে মশালে আলো হয়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন—ছোটো-ছোটো, ওরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে।

তিন বন্ধু প্রাণপণ ছুটতে লাগলো। পথ বলে তো কিছুই নাই। পদে পদে বাধা। পাথর ডিঙ্গিয়ে, বন-বাদাড় ঠেলে, তিন বন্ধু ছুটলো।

পাহাড়ের উপর থেকে মশালের আলো ক্রমেই তাদের দিকে নেমে আসতে লাগলো।

প্রাণের মায়ায় তিনবন্ধু ছুটলো। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, পা যেন আর চলতে চায় না, তবু আবার ওই জংলীদের হাতে ধরা দিতে মন চায় না।

নীচে নদীর জল মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে নজরে পড়ছে, মনে হয় যেন লাফিয়ে পড়লেই হয়। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন- নদীটা আর কতদূর বলুন দেখি?

তা প্রায় মাইল খানেক তো হবেই।

—এখনও এক মাইল, কিন্তু আমি যে আর পারছি না, একটু বসি—বলে ডাক্তার বসে পড়লেন।

সরোজ ও বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন, একজনকে ফেলে তো চলে যাওয়া যায় না। কিন্তু বসবার অবসর কোথায়?

সহসা রাত্রির অন্ধকারে অদূরে গাছের পাতাগুলো মর্মর করে উঠলো। তার-পরেই একটি খস্‌খস্‌ শব্দ। কারা যেন বনের শুক্‌না পাতাগুলির উপর দিয়ে চলে আস্‌ছে। কোন হিংস্র জন্তু হয়তো। কোন অতর্কিত মুহূর্তে ঝুপ করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। হাতে তো একটি অস্ত্রও নেই।

শব্দ নিকটতর হতে নিকটতম হয়ে এলো!

জামু সর্দারের অনুচরেরা নয় তো? মশাল নিভিয়ে তাদের অনুসরণ করছে?

পরমুহূর্তেই হাততালি দেবার শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের ঝোপ থেকে কালো কালো পাহাড়ী মানুষের মুখগুলি ভেসে উঠলো।

আবার সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে বন্দী হতে হবে! এতো করে মুক্তি পেয়েও তারা পালাতে পারলো না। সরোজের মনে দপ্‌ করে একটা কথা ভেসে উঠলো, যে জিনিষটা এতক্ষণ তার কাঁধে এসে লাগছিল ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে দেখলো—গাছের ডাল নয়, বটগাছের জট। দু'হাত দিয়া সেটাকে চেপে ধরে সজোরে একবার নাড়া দিয়ে মজবুত কিনা পরীক্ষা করে নিয়ে সরোজ কয়েক পা পিছিয়ে গেল। দুটি জংলী তখন সরোজ ও বিনয়বাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের চোখে অসহায় দৃষ্টি, হাতে হাতিয়ার নেই, কি করবে। তারা তো আবার বন্দী হলো। সরোজকেও এই ধরে ফেললো বলে! এমনি ভাবে ধরা দিতে হবে? কখনো না।

—চললাম বিনয়বাবু, যদি বাঁচি তো ফিরে আসবো—বলে আরেক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বট গাছের জটটি ধরে সরোজ সামনের দিকে পূর্ণবেগে ছুটে গেল। সেই গতির বেগে তার দেহটা দুলতে দুলতে খানিকটা এগিয়ে যেতেই

সরোজ বটগাছের জট ছেড়ে দিল। নীচেই নদী, তবে কত ফুট নীচে কে জানে!

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, হুস হুস করে সে নীচে নামতে লাগলো। মনে হলো বাতাসের চাপে এখনি বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে, এরোপ্লেন থেকে প্যারাচুট নিয়ে নামা বুঝি এর চেয়েও অনেক সোজা।

কিন্তু সে অবস্থা কতক্ষণই বা! কয়েক পলকের মধ্যে নীচের খরস্রোতা নদীর জলে সরোজের দেহ ডুবে গেল। স্তব্ধ রাত্রির বুকে পাহাড়ের মাথায় ঝুপ্ করে একটা শব্দ হলো শুধু, আর কিছু নয়।

জংলীরা তখন ডাক্তার ও বিনয়বাবুকে ধরে ফেলেছে, দেখতে দেখতে তাদের হাতের মশাল আবার জ্বলে উঠলো।

—পনর—

অতটা উঁচু হতে জলের উপর পড়বার কোনদিন তো অভ্যাস নেই—সরোজের তলপেটে জলের আঘাত লাগলো। কি হলো ভাল করে বোঝবার আগেই সরোজের দেহটা জলের নীচে তলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে স্রোতের টানে যখন সে ভেসে উঠলো তখন সরোজের সংজ্ঞা নাই। স্রোতের টানে অচেতন দেহটা মড়ার মতো ভেসে চললো।

একটা শুশুক ভুস্ করে পাশে ভেসে উঠলো, খাবার জিনিষ মনে করে কাপড়টা কামড়ে ধরে জলের মধ্যে আনন্দে এক ডিগ্‌বাজী খেলে। কিন্তু বেচারার আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না, শুশুকটা যতই ডিগ্‌বাজী খায় কাপড়খানি সরোজের দেহ হতে খুলে গিয়ে ততই পাকের পর পাক তাকে জড়াতে থাকে, শেষে বেচারা ভয় পেয়ে অতল জলে ডুবলো।

—ষোল—

জলের বুকে ভাসতে ভাসতে আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে অল্প অল্প করে সরোজের চেতনা ফিরে এলো।

ভাল করে নিজের অবস্থাটা মনে করতে খানিকক্ষণ সময় লাগলো।

উপুড় হয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে দেখে পেট ব্যথায় টনটন করে উঠছে, ভাল করে পা ছুঁড়তে পারছে না। কাজেই আবার ঘুরে পড়ে চিৎ হয়ে সে সাঁতার কাটতে লাগলো—অনেকটা সহজ বলে মনে হলো।

আধঘণ্টা সাঁতার কেটে সরোজ তীরে এসে পেঁছিল। উঠতে গিয়ে দেখে দাঁড়াতে পারছে না। উঠে আসতে বেশ কষ্ট হলো।

তীরে উঠে দেখলো কাপড় নাই, সে শুধু জাঙ্গিয়া পরে আছে। জামা ও গেঞ্জি খুলে পকেট থেকে রুমাল বের করে গায়ের জল মুছলো। এইবার তার মনে হলো শীত করছে, জ্বর এলো হয়তো। দেখতে দেখতে সরোজের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল, সেইখানেই সে শুয়ে পড়লো।

—সতের—

চমৎকার নরম বিছানা, খালি পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এমন ঘর, সে কি স্বপ্ন দেখছে? নাঃ, স্বপ্ন তো নয়, এতো সত্যি! তবে এ সে কোথায় এসে পড়লো? সরোজ উঠে বসতে গেল, পারলো না, সারা দেহে অসহ্য বেদনা। জ্বর হয়েছে - উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একজন নাগা এসে ঢুকলো, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় সে যা বললো, আসামী ভাষা হলেও সরোজের বুঝতে বিশেষ কষ্ট হলো না, সে বলছে—কিছু খাবে?

সরোজ বললো—না, বড় ব্যথা, উঃ—

সরোজ পাশ ফিরলো। লোকটি সরোজের কপালে হাত দিয়ে দেখলো। তারপর আপন মনে কি সব বকতে বকতে চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কতকগুলি গাছের পাতা নিয়ে লোকটি আবার ফিরে এলো, বললো—এগুলো খাও, জ্বর ছেড়ে যাবে।

সরোজ একবার ভেবে নিলে এগুলো খাওয়া ঠিক হবে কিনা, কিন্তু লোকটী জংলী হলেও তার সংগে সে তো বন্ধু ভাবেই চলেছে, খেলে ক্ষতি কি? আর আসামী জ্বরের ওষুধ আসামীদেরই ভালমত জানা থাকা উচিত। সরোজ পাতাগুলি একে একে চিবিয়ে খেলে। খাওয়া শেষ হলে লোকটি একটি মাটির পাত্রে দুধ নিয়ে এলো। দুধটুকু পান করেই সরোজের মনে হল যেন এবার একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হয়। সরোজ চোখ বুঁজলো।

—আঠার—

সেই দিনই সরোজের জ্বর ছাড়লো।

অবসন্ন দেহে কাজ করবার মত সবলতা ফিরে আসতে আরো দিন তিনেক সময় লাগলো।

সেই ফাঁকে এই সব জংলীদের সংগে হলো বন্ধুত্ব। জংলী সর্দার বললো—জমুদের উপর আমাদের অভিযোগও তো বড় কম নয়, ব্যাটারা সাক্ষাৎ শয়তান। ওই যে মেয়েটির কথা বলেছেন বাবু, ও আমারই মেয়ে। ব্যাটারা সে দিন আমাদের গাঁ লুঠ করে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। চোখ-টোক সব মিছে কথা। কাণা ছেলের কি আর চোখ হয়? ওরা সব ভল্লুকের মুখে যাবে, বাবু।

—ভল্লুকের মুখে যাবে?

—হ্যাঁ, ওরা যকের পূজা করে, ভল্লুক সে দেবতার বাহন। দেবতারা তো কিছু আহার করে না, তাই অনেকগুলো ভল্লুক পোষা আছে, দেবতার ভোগ সেই বাহনকে খাওয়ানো হয়। আপনারা তো বাবু হাওয়াই-পাখীর পেটের মধ্যে বসে আকাশে ওড়েন দেখেছি, আমার মেয়েকে বাঁচান-না, হুজুর! আপনার বন্ধুদের তো বাঁচাবেনই, আমার মেয়েটা কেন বাদ যায়, হুজুর? আমি,—শুধু আমি কেন, আমরা সব আপনার কেনা-চাকর হয়ে থাকবো।

সরোজ হাসলো, বললো—কেনা-চাকরের ত আমার দরকার নেই। এখন কোন রকমে সাহায্য করতে পার, যাতে আমি কামরূপ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছিতে পারি। আমি একা তো আর কিছু করতে পারব না, লোকজন চাইত—গুলি, গোলা, বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র!

—নিশ্চয়ই বাবু, আমার দশ-দাঁড়ি ছিপে আপনাকে কামরূপ পেঁছে দিয়ে সেখানে আমার লোক অপেক্ষা করবে, ওই ছিপই আবার আপনাদের নিয়ে আসবে।

সরোজ বললো—বেশ, কালই আমি যাব।

পরদিন নৌকা প্রস্তুত হলো সরোজকে নিয়ে যাবার জন্য। আবাং সর্দার নদীর তীরে এসে সরোজকে বিদায় দিয়ে গেল, বললো—আপনিই এখন ভরসা বাবু। এমন জিনিস আনবেন যাতে ওই গাঁ সুদ্ধ উজাড় হয়ে যায়—সব খতম্।

সরোজ হেসে নৌকায় উঠে বসলো।

—উনিশ—

পুলিশ মহলে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

কলিকাতার বিখ্যাত চোখের ডাক্তার অজয় চৌধুরী ও তার সঙ্গী দু'জন ধনী বন্ধু কামরূপে উমানন্দ ভৈরব দেখতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

লোক তিনটি ঘূর্ণীর জলে ডুবে গেলেই সকল লেঠা চুকে যেত, পুলিশও পরিশ্রম হতে বেঁচে যে'ত। কিন্তু আসামের কোন এক বনরক্ষক সাহেব সেদিন নৌকা করে সান্ধ্য ভ্রমণ করতে করতে নদীর জলে একটা শিশি ভেসে যেতে দেখে উঠিয়ে নিয়ে তার মধ্যে একখানি চিঠি পেয়েছে। সেই চিঠিখানিতে নিরুদ্দিষ্ট লোক তিনজনের সন্ধান আছে বলে জানা যায়, জংলীরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে বলে প্রকাশ। পুলিশ তাদের উদ্ধার করার জন্য তৈরী হচ্ছে।

খবরের কাগজে খবর পেয়েই কলিকাতায় পুলিশের অনুমতি-পত্র নিয়ে ডেভিড ও সনি কামাখ্যায় রওনা হলো।

আসামী পুলিশেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিল—যে বাঙালী এক ঘণ্টা পাহাড়ের চড়াই উঠে হাঁপিয়ে পড়ে, তারা যাবে কিনা আসামের জঙ্গলে! জানা আছে!

ডেভিড বললো—আমরা দু'জনেই ইংরেজ।

পুলিশের কর্তারা হেসে বাঁচে না, বললো—ধুতি আর পাঞ্জাবী পরা ইংরেজ! ভাল ইংরাজী বলতে পারলে আর চেহারাখানা ফর্সা হলেই বুঝি ইংরেজ হয়?

ডেভিড বুঝলো এদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই, বললো—বেশ, আমরা বাঙালী। তবে বাঙালীদের সাহস আছে কিনা দেখাবার জন্য আমরা শুধু দু'জনে জঙ্গলের মধ্যে যাবো। আপনাদের সাহায্যের দরকার নেই, শুধু সেই চিঠিখানা একবার দেখতে চাই আর বন্দুক, গুলি, বারুদ, যাযা দরকার সব আমরা এনেছি।

—কিন্তু বন্দুক, গুলি-বারুদ তো আপনাদেরকে ছাড়বো না। আপনারা যে এনার্কিস্ট নন্ তার প্রমাণ?

—প্রমাণ? এই দেখুন কলকাতার পুলিশ-কমিশনারের চিঠি।

চিঠিখানা বের করে পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেণ্টের হাতে দিতেই তিনি সাগ্রহে পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন আগে একথা বলতে হয়, আপনারা যে পুলিশের লোক তাতো জানতুম না। তা লোকজন যা দরকার আপনি নিয়ে যান।

—লোকজন একজনও দরকার নেই। আপনি আমাদের বাঙালী বলে খুব অবজ্ঞা করেছিলেন না? তাই আমি দেখিয়ে দেব যে বাঙালীর কত সাহস। আমরা এই দু'জন গিয়ে তিনজনকে ঠিক উদ্ধার করে আনবো।

কিন্তু আপনারা তো বাঙালী নন্ চিঠিতে দেখলুম।

—হ্যাঁ, আমরা দুজনেই ইংরেজ। তবে ইংরেজ হলেই খুব সাহসী হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমাদের যে দু'জন বন্ধুকে জংলীরা ধরে নিয়ে গেছে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী, বুঝলেন? আর আপনি তো একটু আগেই বললেন, ফর্সা চেহারা আর ভাল ইংরাজী বললেই সাহেব হওয়া যায় না, আপনি আমাদের বাঙালী বলেই জানবেন।

পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট খানিকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। অন্য কেউ হলে গলা টিপে থানা থেকে বের করে দিতেন কিন্তু এ যে ধুতি-চাদর-পরা সাহেব তাঁর উপর পুলিশ-কমিশনারের পরিচয়-পত্র কাজেই তিনি চুপ করে রইলেন।

পরদিন সকালে ডেভিড ও সনি গোটা চারেক প্যাকিং বাক্স মুটের মাথায় চাপিয়ে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে, কোমরে ছোরা ও রিভলভার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

—কুড়ি—

সরোজ ফিরছিল।

জংলীদের ছিপ্ চালাবার কৌশল চমৎকার। দ্রুতগতিতে ছিপখানি এগিয়ে চলেছে, একটু দুলছে না, ঢেউ ঠেলে তীরের মত চলছে। দেখে সরোজের মনে হলো বাচ খেলার প্রতিযোগিতা করলে অতি সহজেই এরা প্রথম হতে পারে।

যাক্, পথ বড় কম নয়। ঘুরে-ফিরে যেতে প্রায় দেড় দিন লাগে।

প্রথম দিনটা সরোজের মন্দ কাটে নি। ছিপে উঠে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। দু'পাশে পাহাড় আর জঙ্গলকে পিছনে ঠেলে সামনে আগিয়ে যেতে ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলেই দৃষ্টি আর বেশীদূর চলে না, মনটা ভারী হয়ে উঠে। ডাক্তার ও বিনয়বাবুকে নিয়ে জংলীরা এখন কি করছে, সেই দুর্ভাবনা জাগে। চাঁদ উঠে। নদীর জলে ঢেউয়ের তালে তালে গাছের পাতায়, পাহাড়ের মাথায়, মেঘের কোলে, চাঁদের আলো নেচে চলে, সরোজের তা ভালো লাগে না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে কঠিন পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দুখানি পরিচিত মুখ। আহার না পেয়ে, জল না খেয়ে সে-মুখে ব্যথা ফুটে উঠেছে, তারা শুধু প্রতীক্ষায় কান পেতে আছে, কখন্ বাহিরে পাহাড়ের বুকে সরোজের বন্দুকের কর্কশ শব্দ শোনা যাবে।···

ভাবতে ভাবতে সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠে। তখনই একটা-কিছু করে ফেলতে ইচ্ছা করে। আবার ধীরে ধীরে নদীর ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ঘুম পায়। চোখ বুঁজে একবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করে কিন্তু সরু ছিপে শোবার জায়গা কোথায়? নড়তে-চড়তে ছিপ দুলে ওঠে, মাঝি হাঁকে—হুঁসিয়ার!

সরোজ ঠিক হয়ে বসলো।

মাঝি জিজ্ঞাসা করলো - ঘুমাবেন বাবু? তীরে নৌকা লাগাবো?

বন্ধুরা পাহাড়ী গুহার মাঝে অন্ধকারে পড়ে আছে, এখন তার ঘুমাবার অবসর কোথায়? সরোজ বললো না, ঘুমাবো না, চলো।

কিন্তু বিপদ যখন আসে, একা আসে না। সরোজ আহার-নিদ্রা ছেড়ে অত তাড়াতাড়ি করলে কি হবে, বেশীদূর যেতে-না-যেতেই আবার নূতন বিপদ ঘটলো।

নদীর তীরে দিয়ে একদল হাতী যাচ্ছিল। একটা বাচ্চা হাতী বোধ হয় খেলা করতে করতে জলে গিয়ে পড়েছিল। সুবিধা বুঝে একটা কুমীর তাকে টেনে নিয়ে গেল। কোন রকমেই নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে বাচ্চা হাতীটা প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো। দলের বড় বড় হাতীগুলির মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। দলশুদ্ধ সব জলে গিয়ে নামলো সেই বাচ্চাটিকে রক্ষা করবার জন্য। সমস্ত জল তোলপাড় হয়ে উঠলো। বাচ্চাটিকে তার আগেই

কুমীর জলের অনেক নীচে টেনে নিয়ে গেছে। হাতীর দল বাচ্চাটিকে খুঁজে হয়রান হয়ে, রাগে গর্জে সারা নদী তোলপাড় করে তুললো। শেষে সরোজদের ছিপ-নৌকাখানি চোখে পড়তেই যত অনিষ্টের মূল ওই নৌকাখানি মনে

করে কয়েকটি হাতী সেইদিকে সাঁতরে গিয়ে শুঁড়ে করে নৌকাখানি উল্টে দিলে। তারপর লোকগুলি জলে পড়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে দেখে, শুঁড়ে জড়িয়ে তাদের এদিকে ওদিকে ছুঁড়তে লাগলো—সাঁতারুরা যেমন করে ওয়াটার-পোলো খেলে।

সরোজের তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘটনাটা বুঝে নিতে বেশীক্ষণ লাগলো না। অন্ধকারে যে কোন রকমেই হোক হাতীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে ওপারে গিয়ে উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

সরোজ ডুব্ সাঁতারে নদী পার হচ্ছিল, কিন্তু একেবারে তো আর ডুবে থাকা চলে না, নিঃশ্বাস ফেলা চাইতো। সরোজ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য ভেসে উঠলো একেবারে একটা হাতীর শুঁড়ের ডগায়। আর যায় কোথা, হাতীটা তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিলে।

সরোজ গিয়ে পড়লো আরেকটা হাতীর সামনে। সেও ছুঁড়ে দিলে।

ঝট্পট্ করে নাকে-মুখে জল ঢুকে, ডুবে, ভেসে আঘাত লেগে, কি

যে হলো সরোজ তার কিছুই বুঝতে পারলো না। চোখ চাইতে পারলো না। তার মাথার মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেল। শুধু মনে হতে লাগলো একটা কথা—মৃত্যু···..

মৃত্যু! যে মরণকে এতদিন দুর্জয় সাহস, বুদ্ধি ও সাবধানতায় ফাঁকি দিয়ে আসছে সেই মরণ আজ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, জীবনের ওপারে অন্ধকারে এখনই তাকে টেনে নিয়ে যাবে। মৃত্যু আর অন্ধকার······

—একুশ—

শ্যামল বাংলার সমতল জমির পিছনেই যে এমন দুর্গম ঘন পাহাড়ী জঙ্গল থাকতে পারে, ডেভিড বা সনি এর আগে তা ধারণাও করতে পারেনি, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এক পা এগোনো মুস্কিল। আফ্রিকার জঙ্গলকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে।

নদীর তীরে জঙ্গলটা তবু কিছুটা ফাঁকা। গাছের সারি কম বলে পথ করে চলা সহজ হয়। দুজনে নদীর তীর দিয়েই চললো।

অজানার উদ্দেশে, কতদিন কতদূর যেতে হবে কিছুই জানা নেই। শুধু চলতে হবে বলেই যেন পথ চলা।

—বাইশ—

চলছে তো চলছেই।

রাত্রে আগুন জেলে যাদের পাহারা দেবার কথা, তারা সহসা চীৎকার করে উঠলো—বাবু বাবু, বিপদ—মহা বিপদ!

ডেভিড, সনি ও আর সকলের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে, কি?

—শুনতে পাচ্ছেন না?

শুনতে সকলেই পেয়েছিল, দূরে—বহুদূরে সমুদ্র গর্জনের মত একটা অস্পষ্ট শব্দ। ডেভিড বললো—কি, ঝড় উঠেছে বুঝি?

—না, হাতীর পাল আসছে—এখনি এসে পড়বে, নিন তাড়াতাড়ি!

—কি করবেন? একটা গাছে উঠলে ভাল হয়—উঁচু শক্ত বড় গাছে। (চারি-পাশে দেখতে দেখতে) বললেন—ঐ—গাছটা বেশ মজবুত, না হলে অন্য গাছ হাতীর সামনে টিঁকবে না।

—আর এই বাক্সগুলো? এইগুলি তো আমাদের প্রাণ, ওর মধ্যে গুলি-বারুদ আছে, ওগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে তো যে কাজে যাচ্ছি তাই বিফল হবে।

—সে ব্যবস্থা আমরা করেছি—বলে পাশাপাশি তিন-চারটি গাছে যেখানে একটি ঝোপের মতো করে ফেলেছে সেইখানে বাক্সগুলি ঠিক মত লুকিয়ে রেখে কজনে মিলে গাছে উঠে বসলো। সারাদিনের পরিশ্রম। দেহ মন

শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, কোথায় ভাল করে ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে তা নয় গাছে চড়ে বসে থাকা।

এদিকে মেঘের গর্জন ক্রমেই কাছে আসতে লাগলো। শুনতে শুনতে মনে হয় যেন একটা ভীষণ জলোচ্ছ্বাস গর্জন করতে করতে চারিদিক ভাসিয়ে ছুটে আসছে। যেন প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত। অনন্ত জল এসে নদী, গাছ, বন—সব ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, কেউ বাঁচবে না, কিছুই থাকবে না।

কুলিরাও গাছে উঠে বসলো। দূরের বনে তখন মড় মড় করে গাছ ভাঙ্গছে, থপ্ থপ্ করে হাতীর পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু অন্ধকারের জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সহসা একটা কুলি চীৎকার করে উঠলো—ভল্লুক-ভল্লুক! বাবা গো!

লোকটা পড়ে যায় আর কি! ডেভিড তাকে ধরে ফেললো।

একটা ভল্লুক তার পাশে গাছে উঠে বসে আছে।

ডেভিড বন্দুক বের করলো। কিন্তু গুলি করা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারলো না। ভল্লুকটা যদি গুলি খেয়ে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে তা হলে সবশুদ্ধ নীচে পড়ে হাতীর পায়ের তলায় থেঁৎলে মরতে হবে।

ডেভিড গুলি করতে পারলো না।

নদীর জলে তখন হাতীর মাতামাতি সুরু হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের মাথায় ঝপাৎ করে কি যেন একটা এসে পড়লো। কুলিরা চীৎকার করে উঠলো, গাছ কেঁপে উঠলো। ভল্লুকটি নীচে পড়ে গেল। দু'জন কুলি আর ডেভিডও ঘুরে পড়ে গেল।

—তেইশ—

তারা নীচে পড়েই যেতো শুধু গাছে পা লট্‌কানো ছিল বলে রক্ষা, মাথাটা নীচের দিকে করে ঝুলতে লাগলো।

আবার ঠিক হয়ে বসতে ডেভিডের দেরী হলো না। নিজে উঠে বসে অনেক কষ্ট করে কুলি দু'জনকেও সে তুলে বসালো। তারপর টর্চের আলো ফেলে মাথার উপর কি ঘটেছে একবার দেখলো।—

সাদা জামা কাপড়...মানুষ বলে মনে হচ্ছে। দেখ্‌তো ওটা মানুষ নাকি?

সব কুলি সমস্বরে জবাব দিল—হ্যাঁ বাবু।

—তোরা কেউ গিয়ে লোকটিকে নামাতে পারবি?

—সকাল না হলে পারবো না বাবু।

—লোকটি অমনভাবে সারারাত থাকলে মারা যাবে যে রে?

—মরতে কি আর বাকী আছে বাবু! হাতীর সামনে পড়েছিল, শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়েছে। কোত্থেকে ওই গাছের উপর এসে পড়েছে কে জানে!

ওকি আর এখনও বেঁচে আছে বাবু? আবার ওকে নামাতে গিয়ে আমরা হয়তো অন্ধকারে পড়ে মরবো হাত পা পিছলে, সকাল হোক তারপর দেখা যাবে।

ডেভিড সকাল হবার প্রতীক্ষায় চুপ করে রইল।

সনি জিজ্ঞাসা করলো –রাত ক' প্রহর রে?

—তিন প্রহর বাবু।

সহসা গাছের উপরকার লোকটি একটু নড়ে-চড়ে উঠলো, অস্পষ্ট কথা শোনা গেল—উঃ! বাবা!

লোকটি আর একটু নড়তে গেল, তখন গাছের ডালগুলি তার গায়ে বিঁধতেই লোকটি আবাব কাতর ভাবে বললো—উঃ! বাবা!

– বাঙালী! গলাটা চেনা-চেনা—ডেভিড বললো।

—কে বলুন দেখি?—সনি জিজ্ঞাসা করলো।

—যেই হোক, বেঁচে যখন আছে, তখন এখনই ওকে গাছ থেকে নামাতে হবে। (কুলিদের পানে ফিরে) এখনি নামাতে হবে ওকে। দেখছিস্ না বেঁচে আছে, কথা বলছে।

—এই অন্ধকারে? পারবো না বাবু।

—বকশিস্ দেব এক টাকা করে।

—যদি পড়ি তো মরে যাব যে বাবু! আর সকাল হতে তো বেশী দেরী নেই বাবু। দু'তিন ঘণ্টা পরেই নামাবো—

– ততক্ষণে লোকটি যদি মারা যায়।

—দু'তিন ঘণ্টায় কি লোক মরে বাবু!

—চব্বিশ—

–উঃ বাবা গো! আঃ—

ইস্! একটি লোক অমন ভাবে চোখের সামনে গোঙাবে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে তারা বসে দেখবে—অসম্ভব! ডেভিড বললো—আমি টর্চের আলো ধরছি, তোরা ওকে নামা।

—পারবো না বাবু।

—পারতে হবে। না পারলে, তোদের আমি গুলি করবো, এই জঙ্গলে দেখি তোদের কে রক্ষা করে। (ডেভিড পিস্তল বের করলো) হয় মর্, না হয় হুকুম তামিল কর্—বলে কুলিগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য ডেভিড পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। 'ক্রাক্' করে পিস্তল গর্জে উঠলো, একটা আগুনের শিখা তীরের মত সামনে ছুটে গেল। এবার কুলিরা সত্যই ভয় পেলে। ডেভিড বললো—হুকুম মানবি, না—না?

—মানবো হুজুর।

সকলে গাছ থেকে নামলো, নীচে যে আগুন জ্বলছিল তা ততক্ষণে নিভে এসেছে, কাঠ-কুটো জোগাড় করে আগুনকে আরো উজ্জ্বল করে তোলা হলো। সেই আলোয় তিনজন কুলি দড়ি নিয়ে উপরে উঠে গেল, দড়ি বেঁধে গাছের উপর থেকে লোকটিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হলো।

সনি ও ডেভিড দড়ি খুলতে গিয়ে লোকটির মুখের পানে টর্চের আলো ফেলে দেখে ঃ সরোজ। বিস্ময়ে তাদের মুখের কথা হারিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের একটি কুলি চীৎকার করে উঠলো। সনি মুখ ফিরিয়ে দেখবার আগেই পাশে গাছের শাখায় একটি সাপ ঝুলছিল, ছুপ্ করে সনির ডান হাতে ছোবল মারলো। আর্তনাদ করে সনি সেইখানে বসে পড়লো।

—পঁচিশ—

বিপদের উপর বিপদ। সরোজকে যে দড়ি দিয়ে নামানো হয়েছিল, সেই দড়ি দিয়ে সনির হাতে ডেভিড একটির পর একটি তাগা বেঁধে দিল, বিষের রক্ত যাতে সারা দেহে ছড়াতে না পারে।

দেখতে দেখতে সনির হাতখানি নীল হয়ে উঠলো। রক্ত চলাচল কখনো একেবারে বন্ধ হতে পারে না। দড়ির ফাঁস বাঁধার জন্য বেশী রক্ত চলাচল না হলেও কম করেও তো চলছিল বটে, তার ফলে আকাশে প্রভাতী আলো দেখা দেবার আগেই সনি বিষে জর-জর হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়লো।

কুলি'দের চেষ্টায় সরোজের তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে, বাঁ হাতটা ফুলে উঠেছে, নড়াবার উপায় নেই, ভেঙ্গে গেছে হয়তো। কয়েক লহমার মধ্যেই সুস্থ হয়ে সে উঠে বসলো। ডেভিডকে দেখে বললো—আশ্চর্য, তোমায় আমি এখানে দেখবো আশাই করিনি, খবর পেলে কেমন করে?

—নস্যির শিশির মধ্যে চিঠি দিয়েছিলে মনে আছে?

—ও বুঝেছি (সনিকে অমনিভাবে পড়ে থাকতে দেখে) তা সনির কি হলো, অমনভাবে হাত বাঁধা যে?

—সাপে কামড়েছে।

—ইস্, বল কি, তাইত! (একটি কুলির পানে ফিরে) এই শোন্—সাপে কামড়ানোর ওষুধ জানিস?

—না হুজুর।

—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌তো তোদের মধ্যে কেউ জানে কিনা?

কুলিটি উঠে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে ফিরে এসে বললো—না হুজুর, কেউ জানে না।

—আচ্ছা, এখানে কোন গাঁ আছে কিনা জানিস্?

—আছে হুজুর, পাঁচ ক্রোশ দূরে, এক প্রহরের পথ।

—ছুটে যা, সেখান থেকে সাপের ওঝা ডেকে আন্, নইলে বাবু মারা পড়বে।

—একা? পারবো না বাবু, ভয় লাগে, যা জঙ্গল!

—বেশ দু'জনে যা, ছুটে যাবি আর আসবি, বুঝলি?

কুলিটা তখনই একজনকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা হলো।

ডেভিড একজনকে ডেকে বললো—রুমাল ভিজিয়ে জল নিয়ে আয়—

ডেভিড পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল। কুলিরা রুমাল ভিজিয়ে আনলো। সেই ভিজা রুমাল সনির মাথায় দেওয়া হলো, যাতে বিষের অপকার কম হয়। মুখে কারও কথা নেই। ভবিষ্যতের পানে চেয়ে সকলে চুপ করে বসে রইল। যদি ওঝা না পাওয়া যায়, তাহলে এই জঙ্গলের মধ্যেই সনিকে রেখে যেতে হবে, এ কি কম দুঃখের কথা!

—ছাব্বিশ—

যে দু'জন কুলি নদীর জলে রুমাল ভেজাতে গিয়েছিল। তারা বললো—একটি মানুষ ভাসছে বাবু নদীর কিনারায়…

—মানুষ?—ডেভিড বললো।

সরোজ বললো আমার সঙ্গে যে মাঝিরা ছিল তাদেরই কেউ হয়তো।

—তোমার সঙ্গে মাঝিরা ছিল? তুমি তাহলে জংলীদের হাতে ধরা পড়নি?

—ধরা পড়েছিলাম, পালিয়ে এসেছি। সে অনেক কথা—এখন চল লোকটি বেঁচে আছে কিনা দেখিগে।

—চল—বলে দু'জনকে সনির কাছে বসিয়ে ডেভিড ও সরোজ নদীর তীরে গেল।

নদীর তীর বেশী দূরে নয়। কয়েকটি গাছের আড়াল পার হয়ে নদীর কিনারায় তারা এসে পেঁছিলো। দেখলো, একটি লোক ভেসে এসে চরে লেগেছে। লোকটি এখনও বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্য একটু কাছে গেছে, সহসা মাঝারি আকারের একটি কুমীর ভেসে উঠে লোকটিকে টেনে নিয়ে জলে ডুবে গেল। এত তাড়াতাড়ি কুমীরটা জলে ডুবলো যে, ডেভিড একটা গুলি করবার অবসরও পেল না।

অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু আর কুমীরটা ভাসলো না।

ফিরে যাবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি একটি করুণ চীৎকার কানে এলো, দু'জনে চমকে উঠলো। সনিকে কি অন্য কোন কুলিকে কোন হিংস্র জানোয়ার আক্রমণ করলো নাকি?

তাড়াতাড়ি দু'জনে ফিরে এলো কিন্তু কই কিছুই তো হয়নি। তবে?

যেদিক থেকে চীৎকার শোনা গিয়েছিল সেইদিকে সকলে চললো।

বেশীদূর যেতে হলো না। একটি ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময় সহসা

একটা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ কানে এসে লাগলো, ডেভিড বন্দুক বাগিয়ে ধরলো। সরোজের বাঁ হাত জখম, পিস্তল ছাড়া তার বন্দুক ছুঁড়বার উপায় নাই। ফিরে দাঁড়াতেই দেখতে পাওয়া গেল, একটা লোককে ভল্লুক জাড়িয়ে ধরেছে, ভল্লুকের মিশ্ কালো লোমের ফাঁক দিয়ে মানুষটির একখানি হাত ও একটি পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

—গুড়ুম! গুড়ুম—! কড়াৎ—কড়াৎ!

একজনের হাতে বন্দুক, আর একজনের পিস্তল একই সঙ্গে গর্জে উঠলো। গুলি খেয়ে ভল্লুকটি মুখের শিকার ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'হাউ হাউ' করে একটা চীৎকার করে এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

গুড়ুম—! ডেভিড আর একটি গুলি করলো।

—কড়াৎ—। সরোজের পিস্তল আর একবার গর্জে উঠলো।

কিন্তু হিংস্র পশু তখন ক্ষেপে উঠেছে, কোন বাধাই সে মানলো না। প্রথমে তো এক থাবা মেরে ডেভিডের হাতের বন্দুক সে ফেলে দিল, তার পরেই ডেভিডের উপর লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড চট করে সরে না দাঁড়ালে সে যাত্রা তার রক্ষা পাওয়া কঠিন হতো। ঠিক সেই ফাঁকে যে লোকটিকে এতক্ষণ ভল্লুক জাড়িয়ে ধরেছিল সে উঠে তার একখানি টাঙ্গি পড়ে ছিল, সেটি কুড়িয়ে ভল্লুকটির মাথায় সে এক ঘা বসিয়ে দিল। ভল্লুকের মাথার মধ্যে ধারালো টাঙ্গি বসে গেল, পরমুহূর্তে ঘুরে পড়ে ভল্লুকটি স্থির হ'য়ে গেল।

লোকটি নাড়াচাড়া করে একবার দেখে, তখনি ভল্লুকটির চামড়া ছাড়াতে বসে গেল, তার সারা দেহ থেকে তখন রক্ত ঝরছিল।

সরোজ বললো অতো কাছ থেকে গুলি করা তোমার অন্যায় হয়েছিল, যাক্ খুব বেঁচে গেছ।

চামড়া ছাড়ানো বন্ধ করে লোকটি মুখ তুললো, আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে বললো—আপনারা আজ আমায় খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন সাহেব।

হ্যাফ্ প্যাণ্ট পরা ডেভিডকে সে সাহেব ভেবেছিল।

ডেভিড বললো—তুমিও তো আমায় বাঁচিয়েছ, শোধ-বোধ হয়ে গেছে।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—সাহেব কি বনের কাজ করেন, না শিকারী।

সরোজ জবাব দিলে—বনের কাজেই এসেছিলাম, এসে বিপদে পড়ে গেছি।

—কি হয়েছে?

—আমাদের এক সঙ্গীকে সাপে কামড়েছে।

—সাপে কামড়েছে? কতক্ষণ?

—শেষ রাত্রে।

—চলুন ত দেখি।

—ওষুধ জান নাকি?

—জানি হুজুর, কিন্তু না দেখে বলতে পারি না।

লোকটি এসে সনিকে দেখলো, বললো—বোধ হয় বাঁচবে। তা এতক্ষণ কামড়েছে আর আপনারা চুপ করে বসে আছেন?

—গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছি, ওঝার খোঁজে।

—ওই হোথায়—ওই গাঁয়ে বুঝি? ওখানকার ওঝা তো আমরাই। যাক, ভালই হয়েছে, দেখি একবার চেষ্টা করে। এদিকে এই ফাঁকে আপনার একটা লোক দিয়ে ওই ভল্লুকের চামড়াটি ছাড়াবার ব্যবস্থা করুন তো।

একজন কুলির উপর চামড়া ছাড়াবার ভার দিয়ে লোকটি একটা ওষুধ খুঁজে আনবার জন্য জংগলের মধ্যে চলে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সে ফিরলো, হাতে তার একটা কিসের শিকড় আর একটি পাথরের টুকরো, জল দিয়ে শিকড়টিকে সে পাথরে ঘসতে লাগলো। খানিকক্ষণ ঘসবার পর চন্দনের মত খানিকটা ক্বাথ জমলে সেই ক্বাথ সনির কানে, নাকে ও কপালে লেপে দিলে। তারপর সাপ যেখানে কামড়েছিল সেইখানে মুখ দিয়ে সে রক্ত চুষতে লাগলো। এক মুখ ভরে রক্ত চোষে আর ফেলে দেয়। তারপর আবার চোষে। রক্ত চুষে চুষে সনির নীল হাতখানা যখন একটু ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে বলে মনে হলো তখন সেই ক্ষত স্থানে শিকড়ের বাকী ক্বাথটুকু লেপে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লো, বললো- মাথাটা অবিরাম জল দিয়ে ধোয়াতে থাকুন, দু'দণ্ডের মধ্যে সেরে উঠবে বলে মনে হয়।

তারপর সরোজের পানে ফিরে বললো—আপনার ওই হাতখানা অত ফুলেছে কেন দেখি?

সরোজ হেসে বললো—আগে একটাকে সারাও, তারপর দুটো।

—ওতো সারবেই, আপনারটা ততক্ষণ দেখি,—বলে লোকটি সরোজের বাঁ হাতটি কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে সেই শিকড়টা বুলিয়ে বুলিয়ে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। সরোজের মনে হলো ক্রমে ক্রমে যেন ব্যথা আরাম হচ্ছে, কিছুক্ষণ পরে হাতখানি ছেড়ে দিয়ে সে বললো—সেরে গেছে, দু'দণ্ড জলে ভিজিয়ে রাখুন।

শিক্ষিত বাঙালী, এই সব মন্ত্র-তন্ত্র ও শিকড়ে বিশ্বাসও করতে পারে না, আবার আশাও ছাড়তে পারে না। দু'দিকেই জল চললো—একজনের মাথায়, আরেকজনের হাতে। শেষে তো কুলিরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—আর কতক্ষণ জল দিতে হবে?

লোকটি বললো—দু'দণ্ড তো হয়নি বাবু এখনও।

—দু'দণ্ড মানে?

সরোজ জবাব দিল—দু'দণ্ড মানে আটচল্লিশ মিনিট, চব্বিশ মিনিটে এক দণ্ড।

—বেশ, আমার কোন আপত্তি নাই, আর কতক্ষণই বা বাকি! আমি কিন্তু এ সব বিশ্বাস করি না।

সরোজ বললো—বিশ্বাস আমিও করি না ; কিন্তু এখন সব কিছুই বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

লোকটি এবার বললো—এখনি বিশ্বাস হবে বাবু, দেখুন না।

সত্যই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হলো।

সরোজের হাতের ব্যথা কোথায় চলে গেল, হাত নিয়ে সে বেশ স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, সনিও ধীরে ধীরে চোখ মেললো।

কৃতজ্ঞতায় সরোজ বললো—তোমায় ভাই কি দিয়ে খুসী করবো তাতো ভেবে পাচ্ছি না। এখন তো আমাদের কাছে দেবার মতো কিছুই নেই।

ওঝা (এখন থেকে লোকটিকে আমরা ওঝাই বলবো) বিনীত ভাবে বললো—কিছু দিতে হবে না, আমার গুরুর আদেশ—কিছু নিতে নেই। আর আমি তো কিছুই করিনি, গাছ-গাছড়া জানি, খুঁজে এনে দিলাম, এই পর্যন্ত।

লোকটির বিনয় দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

কথায় কথায় ওঝা জিজ্ঞাসা করলো—খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন এখানেই হবে নাকি ?

—খাওয়া-দাওয়া আর কি ? ডিম সিদ্ধ করবো আর চা।

—তার চেয়ে চলুন বাবু আমাদের গায়ে, আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়লে গাঁ ধন্য হয়ে যাবে !

লোকটি এমন ধরে বসলো যে, কোন ওজর-আপত্তি টিঁকলো না।

সনি তখন উঠে বসেছে। জিনিষ-পত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে সনিকে ধরে দুই বন্ধুতে অগ্রসর হলো, ওঝা আগে আগে পথ দেখিয়ে চললো।

—সাতাশ—

ওঝা অমায়িক। বাড়ী নিয়ে গিয়ে ভাল করে খাইয়ে যত্ন করে কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না, অথচ তার এতটুকু স্বার্থ নাই, বর্তমান যুগে শুধু ভারতবর্ষেই অমন অতিথি-সেবা সম্ভব।

এদিকে সারা গ্রামের বুকে হৈ চৈ পড়ে গেছে—ওঝাদের বাড়ীতে সাহেব এসেছে।

ক'ঘরই বা লোকের বাস। সকলেই ভীড় করে দেখতে এসেছিল, ওঝার ধমক খেয়ে যে যার সরে পড়লো।

ওঝা বললো—বাবুরা দুদিন এখানে থাকুন, কোন কষ্ট হবে না।

সরোজ বললো—থাকার উপায় নেই ভাই, বিশেষ জরুরী কাজ।

—এই জঙ্গলের মধ্যে জরুরী কাজ ?

—হ্যাঁ ! তবে শোন—বলে সরোজ উমানন্দ ভৈরব হতে ফিরে আসা থেকে আরম্ভ করে বুনো হাতীর গাছের মাথায় ছুঁড়ে দেওয়া পর্যন্ত সকল কথা বললো।

সব কথা শুনে ওঝা বললো—বুঝেছি সাহেব, আমরা জানি ওরা যকের পুজো করে, পূর্ণিমার রাত্রে যক দেবতার কাছে মানুষ উৎসর্গ করে ভল্লুক দিয়ে

খাওয়ায়। আসুন বাইরে দেখাচ্ছি—বলে তিন বন্ধুকে ওঝা বাহিরে নিয়ে এলো—ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে অনেক ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওইটি আবাংদের গ্রাম। আর তার পাশে ওই যে একটা হাতীর পিঠের মত পাহাড় দেখছেন, ওরই ওপাশে জমুদের বসতি। ওই পাহাড়টার নীচেই একটা মন্দির আছে, সেইখানেই যকের পুজো হয়। আর মন্দিরের একটু নীচে পাহাড়ের এক গর্তের মধ্যে অনেক ভল্লুক পোষা আছে, সেখানে মানুষগুলোকে ফেলে দিয়ে ওরা মজা দেখে। ভল্লুকগুলো মানুষগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় আর ওরা উপরে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাততালি দেয়। ওদের মুখ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা ভারী শক্ত কথা বাবু।

—আমাদের এই আগুন-অস্ত্রের গুণ দেখেছ ?

—হ্যাঁ বাবু, ওতে আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে না। জমুদের এক রকম ছোট ছোট বর্শা আছে, বাঁশেতে ভরে ছুঁড়ে মারে, একবার লাগলে তার বিষে তখনি মৃত্যু।

—মরতে হয় মরবো কিন্তু তা বলে দু'জন বন্ধুকে মরণের মুখে ফেলে পালাতে পারবো না।

· ঠিক কথা বাবু, নইলে বন্ধু কিসের—তা বাবু আপনারা তাদের রক্ষা করতে পারবেন, আপনাদের সাহস আছে।

যাক্, ওঝার সঙ্গে আর বেশীক্ষণ গল্প-গুজব না করে তারা যাবার জন্য তৈরি হলো। ওঝা বললো—এখনি যাবেন বাবু, কাল রাতে ঘুমাতে পাননি একটু ঘুমিয়ে নিন্ না।

কিন্তু ঘুমাতে কেউ রাজী হলো না। নেপোলিয়ন রাত্রে মাত্র এক ঘণ্টা করে ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে বছরের পর বছর ধরে দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন। আর তাদের দু'এক দিন না ঘুমালে কি এমন ক্ষতি হবে। ওঝার কাছে থেকে সহজ ও সোজা একটী পথ জেনে নিয়ে সকলে বেরিয়ে পড়লো। বিদায় দেবার সময় ওঝা বললো—ফেরবার পথে আমাদের এখানে হয়ে যাবেন কিন্তু, ভুলবেন না যেন। হাজার হোক্ আপনারা আমার জীবন-দাতা।

সনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ওঝা তাকে কি কয়েকটি গাছের পাতা খাইয়ে একেবারে চাঙ্গা করে তুলেছিল। ওঝার কথার উত্তরে হেসে সে বললো—আপনি বুঝি কারও জীবন বাঁচান নি ?

ওঝা হাসলো। তার কাছ থেকে সকলে বিদায় নিল।

আবার সুরু হলো দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে পথ চলা।

—আঠাশ—

ওঝার ঘরের সামনে থেকে আবাংদের গ্রামটি যতটা দূরে দেখিয়েছিল, পথ চলতে গিয়ে কিন্তু আরো দূরে বলে মনে হলো। পথ যেন আর ফুরাতে চায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো পথের মাঝেই।

ডেভিড বললো—হোক রাত্তির, মশাল জেলে চলবো। আজ ওখানে না পৌঁছে আর জিরোবো না।

সরোজ বললো—বেশ, চলো, আমার কোন আপত্তি নেই।

আগে আর পিছে দুটি মশাল নিয়ে তারা অগ্রসর হলো। চলতে চলতে শেষে ব্যথায় পায়ের শিরাগুলি টেনে ধরে, জুতার মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি টনটন করতে থাকে। তথাপি বিরাম নাই, চলছে তো চলছেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন রাত দু'প্রহরে পৌঁছেচে।

সহসা তাদের সামনের পথে অন্ধকারের বুকে মশালের আলো জ্বলে উঠলো। দূরে পাহাড়ের গা বহে একটির পর একটি মশালের সারি নেমে আসছে। কখন মশালগুলো গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ছে, আবার কখন ঘুড়ির-সুতোয় বাঁধা একসারি ফানুসের মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ক্রমে ক্রমে আলো কাছে এসে পড়লো, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল জন পনেরো বর্শাধারীকে নিয়ে মাথায় লাল-পাগড়ী-বাঁধা একটি লোক আগিয়ে আসছে। সরোজ দেখেই চিনলো আবাং সর্দার। সরোজকে পেয়ে সর্দারের তো আর আনন্দ ধরে না, বললো—আসুন, আমরা আপনাদের এগিয়ে আনতেই এসেছি।

সরোজ বললো—যাক ভালই হয়েছে, আমরা মনে করেছিলাম আরো কতদূর যেতে হবে?

—দূর এখনও অনেক তবে সামনেই একটি ছোট খাদ আছে, তার মধ্যে দিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।

—কিন্তু আপনাদের যখন দেখা পেয়ে গেছি তখন আমরা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারি। সেই বিকাল থেকে হাঁটছি এখনও বসিনি।

—বেশ আপনারা বিশ্রাম করুন, রাত বেশি নেই, সকালেই যাত্রা করা যাবে।

সর্দারের উপদেশ মতো কাছাকাছি খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে পরিষ্কার করে নিয়ে পাঁচজন কুলি আর তিনবন্ধু শুয়ে পড়লো।

এত পরিশ্রম। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

—উনত্রিশ—

সহসা হাততালির শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সকলে চমকে উঠে চোখ মেলে দেখে জনকতক লোক বর্শা আর লোহার ভাঁটি নিয়ে সেইদিকে আসছে। আবাং সর্দারের মুখতো এতটুকু হয়ে গেল। সর্দারের অনুচরদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—জমুরা আসছে!

জমুদের সরোজ চিনতো, বললো—জমুরা আসছে তো ভয় পাবার কি আছে? আমরা তো তৈরী! সর্দার আপনাদের অনুচরদের বলুন ঢাল নিয়ে আমাদের সামনে রক্ষা করতে, তারপর আমরা দেখছি—

সর্দারের নির্দেশ মত ঢালগুলি সামনে রেখে তার পিছনে সকলে এসে

দাঁড়ালো। কুলিগুলো তো রীতিমত কাঁপছে। কিন্তু তিনবন্ধু অচল অটল। হাতে বন্দুক নিয়ে তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছে।

জমুরা কাছে এলো।

সরোজ বললো—আগেই গুলি চালাবার দরকার নেই, শুধু ভয় দেখাও।

একটি লোক সামনে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল ডেভিড তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ওই সর্দার বুঝি?

—হ্যাঁ—সরোজ মাথা নাড়লো।

সেই মুহূর্তে ডেভিডের হাতের বন্দুক গর্জে উঠলো। অব্যর্থ লক্ষ্য, সর্দারের টাট্টু ঘোড়াটি একবার সামনের দিকে দু'পায়ে লাফিয়ে উঠে মাটির উপর পড়ে গেল। ঠিক সময়ে লাফিয়ে না পড়লে সর্দারের পা জখম হতো নিশ্চয়ই।

জমুরা স্তম্ভিত হয়ে গেল, এমন হবে তারা আশা করে নি।

ওই একটি গুলিতেই কাজ হলো।

জমু সর্দার দু' হাত মাথার উপর তুলে সরোজদের থামতে বলে দল ছেড়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে বললো—ওগো বাঙালী, তোমাদের অস্ত্র খুব ভাল তা আমরা জানি। তোমাদের ওই একটি অস্ত্রে আমাদের হয়তো সব লোক মারা পড়বে, কিন্তু ওতে তো আর শক্তির পরীক্ষা হবে না। তোমাদের সঙ্গে হাতাহাতি শক্তির পরীক্ষা করতে চাই, হয় মল্লযুদ্ধে এসো, না হলে তলোয়ার?

ডেভিড বললো—আমরা যখন লড়বো সেই ফাঁকে তোমার লোকেরা আমাদের ধরে বন্দী করে ফেলুক!

জমু সর্দার হেসে বললো—দেখুন, জমুরা প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে জানে, আবশ্যক হলে প্রাণ দিয়েও।

ডেভিড বললো – বেশ, তবে ঘুষোঘুষি লড়বে তো এসো?

জমু সর্দার বললো—ওতো আমরা কখনও লড়িনা, ও তো জানিনা। আর ওতে দেহের শক্তির পরিচয় তো পাওয়া যাবে না, শুধু হাতের কায়দা। ও নয়, আমি চাই তলোয়ার, নাহলে মল্লযুদ্ধ।

ডেভিড বকসিং জানতো বলে সে প্রথমে কথা কয়েছিল, তলোয়ার বা কুস্তি সে কোন কালে শেখে নি। তার উপর সে ছাড়া আর কেই-বা লড়বে? আবাং সর্দার তো কাঁপছে বললেই হয়, আর সনির কথা তো বাদ, তার উপর সরোজের একটা হাত দুর্বল, কাজেই লড়বে বললে এখন ডেভিডকেই লড়তে হবে। ডেভিড বললো—কিন্তু তলোয়ার কি কুস্তি তো আমি জানি না।

জমু সর্দার হাসলো, বললো—আপনার দলে আপনি ছাড়া আর লোক নেই নাকি?

ডেভিড বললো—আছে, আরো দু'জন আছে। তবে তাদের একজনকে কাল রাত্রে সাপে কামড়েছিল, এখনও ভালরকম সুস্থ হয় নি। আর একজন কাল রাত্রে বুনোহাতীর সঙ্গে লড়ে বাঁ হাতখানি জখম করে ফেলেছে।

জমু সর্দার বললো—তার মানে আমার সঙ্গে লড়ার সাহস আপনাদের কারও

নেই। শুধু ভাল ভাল কৌশলী অস্ত্রের জোরেই আপনারা সাহস দেখান। নইলে ডান হাতে তলোয়ার চালাবে তো বাঁ হাতের কি?

সরোজ এইবার কথা বললো—ঠিক কথা, তবে কি জান সর্দার, বাঙালীরা বাঁ হাতেও তলোয়ার চালাতে জানে।

—এগিয়ে এসে দেখিয়ে দিন না দেখি—বলে সর্দার ছি ছি করে উপহাসের হাসি হাসলো।

সে উপহাস সরোজ সইতে পারলো না, এগিয়ে গিয়ে বললো—তলোয়ার দাও সর্দার, দেখাচ্ছি।

জমু সর্দার নিজের কোমরে যে তলোয়ারখানি ঝুলছিল, তা খুলে দিলে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কিসে লড়বে সর্দার?

জমু সর্দার বললো—আগে তোমার বাঁ হাতের তলোয়ার খেলা দেখি তারপর লড়বো।

সরোজ বললো—খেলা দেখাতে আসিনি সর্দার, আমি এসেছি লড়তে, এই বাঁ হাতেই আমি তোমার সঙ্গে লড়বো।

—বেশ—বলে জমু সর্দার একজন অনুচরকে ইসারা করতেই সে আরেকখানি তলোয়ার এনে সর্দারের হাতে দিল।

—ত্রিশ—

সেলামী দিয়ে লড়াই সুরু হলো।

একজনের ডান হাতে তলোয়ার, আরেকজনের বাঁ হাতে। একজন সুস্থ সবল, আরেকজন সারা রাত পথ চলে শ্রান্ত, তার উপর আহত বাঁ হাত সবে মাত্র সেরেছে। কিন্তু তার জন্য কি? দু'জনের কেহই কম যায় না।

তলোয়ার ঝিকমিক করছে, আঘাতে প্রতিঘাতে আগুন ঠিকরে উঠছে, একটু উনিশ-বিশ হলেই এখনি একজনের মাথা দেহ থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য, দুজনের মধ্যে কেউ কম নয়।

সহসা দু'জনের কব্জিতে কব্জিতে তলোয়ার বেধে গেল।

সঙ্গীন মুহূর্ত! যার কব্জির জোর কম, যে একটু পিছিয়ে যাবে তাকেই আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে।

সরোজ পিছু হটছে…

ডেভিড ও সানির দৃষ্টি ভয়ে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো। সরোজ বুঝি আর রক্ষা পেল না!

ডেভিড পিস্তল টিপে ধরে বললো—দরকার হলে আমি জমু সর্দারকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো। আমার বন্ধু আহত হলে আমি তার শোধ নেব। কারও কথাই শুনবো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে জমুসর্দার সরোজকে ঠেলে দিয়ে তার ঘাড়ের উপর

লাফিয়ে পড়লো। চকিতে সরোজ সরে গেল। নিজের বেগ সামলাতে না পেরে জম্‌রু সর্দার পড়ে যাবার মত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সরোজ ঘুরে দাঁড়িয়ে তলোয়ার শুদ্ধ জম্‌রু সর্দারের ডান হাতের কব্জি চেপে ধরলো। জম্‌রু সর্দারের পরাজয় ঘটলো।

সরোজ বললো—সর্দার, এবার যদি আমি তোমায় বন্দী করি—তোমার দলের লোকেরা যেমন ভীরু কাপুরুষের মত আমাদের বন্দী করেছিল?

জম্‌রু সর্দার মুখ তুলে চাইতে পারলো না।

সরোজ তলোয়ারখানি কেড়ে নিয়ে হেসে বললো—যাও সর্দার, তোমায় বন্দী করলাম না। তোমার সমস্ত দলের সঙ্গে আমরা শক্তি পরীক্ষা করতে এসেছি, তোমার একার সঙ্গে নয়। আমরা তোমাদের মত ভীরু কাপুরুষও নই যে সুবিধা পেয়ে তোমাদের বন্দী করবো, বুঝলে? যাও—

সর্দার মুখ নীচু করে চলে গেল।

—একত্রিশ—

সানি বললো—আপনি এতো ভাল তলোয়ার খেলতে জানেন তা তো জানতাম না।

সরোজ হাসলো, বললো—শিখেছিলাম গত জার্মান যুদ্ধের সময় যুদ্ধে

যাবার আগে। দেশের চারিদিকে তখন লাঠি ছোরা তলোয়ার যুযুৎসু শেখার ধুম পড়েছিল। সেই সময় পুলিনবিহারী দাসের কাছ থেকে আমি তলোয়ার-খেলা শিখি, আজ সেই শিক্ষা আমার কাজে লেগে গেল।

বাংলার নামকরা লাঠিয়াল পুলিনবিহারী দাসের নাম সনির কাছে অজানা ছিল না। সনি বললো—যাক্, আমায় শেখাতে হবে কিন্তু?

সরোজ হাসলো, বললো—সেকথা পরে, এখন সর্দারকে বল কিছু ফলমূল যোগাড় করতে, খেয়ে তো আবার যেতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফলমূল এলো। জলযোগ সেরে যাত্রা করতে তাদের বেশী দেরী হলো না।

—বত্রিশ—

পাহাড়ের মাথায় ছোট একটি সহর। ঠিক সহর বললে ভুল হবে, একটি বড় গ্রাম। একটি ছোট কেল্লা যেন। চারিপাশের বন ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। চারিদিকে দৃষ্টি চলে বহুদূর পর্যন্ত।

কিন্তু চারিপাশে দেখবার মতো মন তখন তাদের নয়, ভাল করে আহারাদি করে একটু শুতে পারলে তারা বাঁচে।

আবাং সর্দারের বাড়ীতে সকলে গিয়ে উঠলো।

ঝর্ণার জলে স্নান করে পেট ভরে ফলমূল ও দুধ খেয়ে দিব্যি আরামে নরম বিছানায় তিনবন্ধু দেহ এলিয়ে দিলে।

—তেত্রিশ—

ঘুম ভাঙতেই, একটি লোক এসে জানালো—সর্দার আপনাদেরকে সভায় যাবার জন্য ডাকছেন।

সর্দারের নাম করে লোকটি তাদের যেখানে ডেকে নিয়ে এলো সেটা রীতিমত একটা সভা বললেই হয়। মাঠের মধ্যে একটা উঁচু টিবির উপর আবাং সর্দার বসেছে আর তার সামনে জমা হয়েছে গাঁয়ের যত লোক।

সরোজ, ডেভিড ও সনি যেতেই সর্দার উঠে দাঁড়ালো, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বললো,—এই তিনজনের কথাই বলছিলাম, এঁরা তিনজন বাঙালী শিকারী, এঁদের দু'জন বন্ধুকে জমুরা আটকে রেখেছে, তাদের উদ্ধার করার জন্য এঁরা আমাদের সাহায্য চাইছেন, তোমরা সকলে এঁদের সাহায্য করতে রাজী আছ?

আবাংরা ভীরুর মত পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগলো। সর্দার বুঝতে পারলো, বললো—ভয়ের কোন কারণ নেই, তোমাদের লড়াই করতে হবে না। কেননা, এঁদের কাছে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র আছে যে জমুদের দু'তিনটে গ্রাম খুব সহজেই হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া যায়, কাজেই এঁরা লড়বার জন্য লোক

চান না, চান আমাদের বন্ধুত্ব। এঁদের বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করেছি কেননা জমুরা আমাদের প্রতিবেশী শত্রু, তাদের তাড়িয়ে দিতে না পারলে আমাদের শান্তি নেই। এই তিনজন বাঙালী তাদের তাড়িয়ে দেবার ভার নিয়েছেন। এঁদের বন্ধু বলে স্বীকার করতে কি তোমাদের কোন আপত্তি আছে ?

এবার সকলে মাথা নেড়ে জানালো—না, আপত্তি নেই।

—তাহলে তোমরা এঁদের সাহায্য করতে রাজী আছ ?

—হ্যাঁ।

সহসা জনতার মধ্য থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো, বললো—ওদের যে অস্ত্রশস্ত্রের কথা বললেন সর্দার, আমরা আগে তার একটু পরিচয় পেতে চাই।

সর্দার বন্ধু তিনজনের মুখের পানে তাকালো।

সরোজ বললো—বেশ, এই দণ্ডেই আমরা পরিচয় দিচ্ছি।

তিনজনে ফিরে গেল তাদের সেই ঘরে। একটা বন্দুক ও প্যাকিং-বাক্স খুলে সামান্য ডিনামাইট নিয়ে এলো। সকলের সামনে সরোজ বন্দুকটী কাঁধের উপর তুলে নিলে। আকাশে উঁচুতে সারি সারি বক উড়ছিল তাদেরই একটীকে লক্ষ্য করে সরোজ বন্দুকের ঘোড়া টিপলো, দুড়ুম করে শব্দ হতে-না-হতেই লট্‌পট্ করতে করতে রক্তাক্ত একটী বক মাটির উপর এসে পড়লো। তারপর খানিকটা তফাতে পাহাড়ের একটি খাঁজের মধ্যে ডিনামাইটটুকু রেখে পলিতাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলো। ছোট পলিতা পুড়তে কতক্ষণই-বা লাগে। বিরাট শব্দ হয়ে চারিপাশ কাঁপিয়ে পাহাড়ের খানিকটা ধ্বসে পড়লো, তুবড়ীর মতো পাথরের কুচিগুলি চারিপাশে ছিট্‌কে পড়লো।

আবাংরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ।

সর্দার বললো—এইবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা জমুদের গ্রাম ধ্বংস করবে, ওদের দু'জন বন্ধুকে উদ্ধার করবে আর আমার মেয়েকেও বাঁচিয়ে আনবে ওদের হাত থেকে। আমি তাই কথা দিয়েছি সব রকমে আমি ওদের সাহায্য করবো, আমার মেয়েকে আমার ফিরে পাওয়া চা-ই।

সকলে চুপ করে রইল।

সর্দার এবার বন্ধু তিনজনের পানে ফিরে বললো—কবে থেকে কাজ সুরু হবে ?

—আজই হতে পারে, তবে তার আগে জমুদের সব গুপ্ত খবর আমাদের চাই। আমাদের বন্ধুরা কি অবস্থায় আছে, কোথায় আছে, সব জানতে হবে তো ?

—বেশ, আমি এখনি দু'জন গুপ্তচর পাঠাচ্ছি—বলে সর্দার দু'জন লোককে ডেকে কি উপদেশ দিল।

তারপর সেদিনকার মত সভা ভাঙলো।

—চৌত্রিশ—

জনা পাঁচেক আবাং গল্প করতে করতে সভা হতে বাড়ী ফিরছিল সহসা পাশ দিয়ে একটি লোককে চলে যেতে দেখে তারা চমকে উঠলো। লোকটি একেবারেই অপরিচিত। যে রকম তাড়াতাড়ি সে সরে পড়ছিল তা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। কি ভেবে একজন তাকে ডাকলো—ওহে, শোন—

লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলো, তারপরই তীরের মতো বনের দিকে ছুটলো।

পাঁচটি লোকের সঙ্গে একটি লোক কখনও ছুটে পারে? পাঁচজন হৈ হৈ করে তার পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললো।

লোকটি জমুদের গুপ্তচর।

ধরা পড়েই তো সে সর্দারের পায়ে কেঁদে পড়লো—দোহাই সর্দার, প্রাণে মারবেন না, আপনাদের আমি অনেক উপকার করবো।

—কি উপকার করবে শুনি?

—আপনার মেয়েকে উদ্ধার করার পথ আমি বলে দেব। তাদের তো আর দু'তিন দিনের মধ্যে ভল্লুকের মুখে ফেলে দেওয়া হবে, এখনও তাদের বাঁচালে বাঁচাতে পারা যায়। গুপ্ত পথ আমি জানি।

—বেশ, কালই তোমার সঙ্গে আমরা যাব. বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!

লোকটিকে সেদিনকার মত আটকে রাখা হলো।

পরদিন কয়েকজন লোক আর কয়েকটি দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আবাং সর্দার গুপ্তচরের সঙ্গে পথে বাহির হয়ে পড়লো।

সরোজ সনি ডেভিডও তাদের সঙ্গে ছিল। ঘন গভীর জঙ্গল দিয়ে গুপ্তচর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

পাহাড়ের প্রায় নীচে নেমে এসে একটী ঝোপের পাশ থেকে সে একখানি পাথর সরিয়ে ফেললো। পাথরটী সরাতে নীচে একটী গর্ত দেখা গেল, গুপ্তচর বললো—এই পথ।

সরোজ বললো—বেশ, তুমি আগে আগে চল, আমি পিছনে আছি।

গুপ্তচর হাসলো, হেসে হাতের মশালটী জেলে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে প্রবেশ করলো।

—পঁয়ত্রিশ—

অনেক দিনের পুরাণো পথ। অন্ধকার। অমন দিনের আলোতেও অন্ধকার। কে যে সখ করে পাহাড়ের বুকে এমন পথ করেছিল কে জানে। চলতে কষ্ট হয়। কখন উঠে, কখন নেমে, আগাছা ডিঙিয়ে, সাবধানে পা ফেলে ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হলো। কতদিন যে সে পথে লোক চলে নি, তা সেই পথই বলতে পারে।

সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে এক খাদের পাশে এসে। খাদের ওপাশে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবি দেখা যাচ্ছে।

ঢিবিটা দেখিয়ে গুপ্তচর বললো—ওই হচ্ছে জমুদের জেলখানা, ওর ভিতরে আবার সর্দারের মেয়েটাকে আর বাঙালী দু'জনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সরোজ বললো—তাতো বুঝলাম, কিন্তু তাদের উদ্ধার করবো কেমন করে?

—ওটা হচ্ছে জেলখানার ছাদ, সন্ধ্যার সময় বন্দীরা ওই ছাদে হাওয়া খায়, সেই সময় তাদের নিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু এই খাদের ওপারে যাব কেমন করে?

—ওই জন্যই তো দড়ি আর মই সঙ্গে করে আনা হলো। সব মইগুলো একটার পর একটা লম্বা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলুন, তারপর সেই মই এদিক থেকে ওদিকে ফেলে দিন, খাদের এদিকে মইয়ের এক মুখ থাকবে, আর ওই ঢিবির মাথায় আর এক মুখ থাকবে, তারপর সেই মই ধরে ঢিবির উপর গিয়ে আপনারা চুপ করে অপেক্ষা করবেন। সন্ধ্যার সময় বন্দীরা উপরে উঠলেই তাদের নিয়ে পালিয়ে আসবেন।

—পাহারা থাকে না?

—থাকে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবেন। তার উপর আপনাদের কাছে তো আগুন-ছোড়া অস্ত্র আছে, আপনাদের সামনে তারা কতক্ষণ দাঁড়াবে?

সরোজ বললো—বেশ, কিন্তু কে কে যাবে?

ডেভিড বললো—আমি যাব।

সনি বললো—আমি যাব।

সরোজ বললো—বেশ, আর সর্দার চলুন।

কিন্তু সর্দার তখন রীতিমত ঘাবড়ে গেছে, বললো—তাইতো, তাইতো, এত সরু মইয়ের উপর দিয়ে খাদের ওপাশে যাওয়া, যদি পড়ে যাই?

সর্দারের ভাব দেখে সনি তো আর হেসে বাঁচে না।

সরোজও হেসে ফেললো, বললো—বেশ বেশ, আপনাকে যেতে হবে না, আপনি এখানেই থাকুন।

ইতিমধ্যে মইগুলি লম্বা করে বাঁধা হলো। প্রকাণ্ড লম্বা মইখানি ধীরে ধীরে খাদের ওদিকে পাহাড়ের ঢিবির উপর ফেলে দেওয়া হলো। সরোজ ও ডেভিড মই বেয়ে ওদিকে যাবার আগে সনির হাতে বন্দুক দিয়ে বললো—এখানে পাহারা দাও, যদি কেউ সহসা আমাদের আক্রমণ করে, আর আমরা তাকে সুবিধা করতে না পারি তাহলে গুলি চালাবে—বুঝলে?

সনি ঘাড় নাড়লো।

দুই বন্ধু পর পর মইয়ের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে একটির পর একটি করে সিঁড়ি পার হয়ে চললো। দুটি মানুষের দেহের ভারে বাঁশ মচমচ করতে লাগলো। নীচে অতল অন্ধকার খাদ। একবার যদি মইয়ের বাঁধন খুলে যায়,

কিম্বা যদি মইটী উল্টে ঘুরে যায়, তাহলে নীচে—কত নীচে কোথায় গিয়ে যে পড়বে কে জানে! পাথরের বুকে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো হয়ে কিভাবে যে মরবে তা ভাবতে গেলেও মাথার মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

কিন্তু ভয় পাবার ছেলে তারা নয়।

ওপারে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে যখন দু'জনে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল কিরণ গায়ে মেখে দুটি লোক ধীরে ধীরে পাহাড়ের মাথায় এসে দেখা দিল। তাদের সঙ্গে দু'জন রক্ষী। পিছনে একটি মেয়েও এসে উঠলো। রক্ষী দু'জন এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারী করতে লাগলো, বন্দী দু'জন পাথরের একটি ঢিবির উপর বসলো, মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। ইতিমধ্যে বন্দীদের একজন গান ধরলো ঃ

আমার সোনার বাংলা মাগো, আমি তোমায় ভালবাসি—
তোমার মুখের শ্যামল হাসি
যায় কি ভোলা, অবিনাশী,
তাইতো আমি তোমার বুকে বারে বারে ফিরে আসি—
আকাশ ভরা মেঘের মায়ায়
জোছ্না ধারায় আশীষ ছড়ায় গো।

দুই বন্ধু ক্ষণেকের জন্য নিজেদের কাজ ভুলে গেল।

সরোজ বললো—ডাক্তার গাইছে।

ডেভিড বললো—চমৎকার গলা।

সত্যই সুকণ্ঠ। সুরের ঝংকার চারিপাশের আকাশে বাতাসে কেঁপে কেঁপে মনে ধাক্কা দিয়ে যায়. ফুলের গন্ধের চেয়ে এই গানের সুর ভাল লাগে, মনে হয় শুধু বসে বসে শুনি।

ডাক্তার গাইছে ঃ

শ্যামল ছায়ার স্বপন দেখি হেথায় আমি পরবাসী
আমার সোনার বাংলা মাগো, আমি তোমায় ভালবাসি—

ডেভিড সরোজের একটি হাত ধরে চাপা গলায় বললো—গেট্ রেডি!

সুরের জগৎ থেকে সরোজ বাস্তব জগতে ফিরে এলো। দেখলো যে-রক্ষী দু'জন বন্দীদের পাহারা দিচ্ছে, তারা পিছু ফিরে গল্প করছে—এই সুযোগ!

পাথরের আড়াল হতে দু'জনে নিঃশব্দে যে ঢিবিটায় বন্দীরা বসেছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, সরোজ বিনয়বাবুর কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললো—চুপ! যদি বাঁচতে চাও তো তাড়াতাড়ি এসো—

বিনয়বাবু ও ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো, মেয়েটির পানে ফিরে সরোজ বললো—তুমিও এসো—

কিন্তু এসো বললেই কি আসা এত সহজ। সহসা ডাক্তারের গান বন্ধ হতেই রক্ষীরা ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু তারা কিছু করার আগেই ডেভিডের এক ঘুসি এসে পড়লো একজনের মুখের উপর, সে পড়ে গেল। দ্বিতীয় রক্ষী

ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছুটে গিয়ে চীৎকার করতে সুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে আরো জন কয়েক জমু-রক্ষী পাহাড়ের উপর এসে পড়লো।

চারজন তখন সবেমাত্র মইয়ের উপর বুক দিয়ে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। ডেভিড সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো, বললো—তোমরা তাড়াতাড়ি এগোও আমি ততক্ষণ এদের ঠেকিয়ে রাখছি।

হাতের পিস্তল বাগিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথমেই যে ক'জন জমু তাড়া করে এসেছিল তাদের একজন দেখতে দেখতে বুকে হাত চেপে ছিট্‌কে ঘুরে পড়লো, ডেভিড তাকে গুলি করেছিল।

জমুর দল একবার শুধু থম্‌কে দাঁড়ালো তারপর যেমন করে জলের ঢেউ এগিয়ে আসে তেমনি করে এগিয়ে এলো। ডেভিডও চুপ করে রইল না, তার হাতের পিস্তলের ঘোড়া অবিরাম খট খট করে শব্দ করে চললো।

একটি একটি করে জমু গুলি খেয়ে শুয়ে পড়তে লাগলো তথাপি এগিয়ে আসতে তারা ছাড়লো না। ডেভিডের কাছে গুলি বেশী ছিল না। দেখতে

দেখতে তারা ডেভিডের অত্যন্ত কাছে এসে পড়লো। চারজন তখন এদিকে কিনারায় প্রায় এসে পৌঁছেচে।

ডেভিড এবার পিস্তলটি বেল্টে গুঁজে সিঁড়ির উপর লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু বুকে হেঁটে লোকে আর কত তাড়াতাড়ি যেতে পারে? একটি জমু ছুটে গেল তাকে ধরতে, শেষে ধরতে না পেরে বল্লমের খোঁচা মেরে ডেভিডকে মইয়ের উপর থেকে ঠেলে দিল। ঠিক সেই সময় ওপার থেকে সনির বন্দুক গর্জে উঠলো। ডেভিডকে যে ফেলে দিচ্ছিল সে-ও গুলি খেয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। কিন্তু ডেভিডকে রক্ষা করতে পারা গেল না, সে তার আগেই পড়ে গেছে।

—ছত্রিশ—

সরোজ, ডাক্তার, বিনয়বাবু ও আবাৎ সর্দারের মেয়ে—চারজনেই এদিকে এসে পৌঁছালো। মই টেনে নেওয়া হলো। সনি গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্য অবিরাম বন্দুকের ঘোড়া টিপে চললো—একটি জমুকেও সে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না।

বিনয়বাবু হায় হায় করতে লাগলেন, অমন বন্ধু আর পাবেন না, নিজের জীবন দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে গেল। হায় হায়!

ওদিকে কয়েকটা গুলি খাবার পরেই জমুরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সনির আর গুলি চালানো হলো না।

সরোজ বললো—আমার কোমরে একটি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও দিকি, আমি নীচে গিয়ে দেখবো ডেভিডের কি হলো।

আবাৎ সর্দার হেসে বললো—পাগল নাকি! এই রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবেন? এ খাদ কি দু' এক হাত নাকি? শুনি এই খাদ নাকি পাতালে গেছে, আর এই অন্ধকারে আপনি কি দেখবেন?

—মশাল নিয়ে নামবো।

—সেই মশালের আগুনে যদি আপনার কোমরের দড়িটাই পুড়ে যায়? দিনের আলো হলে সে এক কথা ছিল, কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে……

কথাটা সত্য। সরোজকে অগত্যা নিরস্ত হতে হলো, এই অন্ধকারে খাদের মধ্যে মশালের আলোয় কতদূরই বা দেখা যায়, টর্চেই বা কি হবে।

বন্ধু হারিয়ে শোকে দুঃখে গুম্ হয়ে সকলে ফেরার পথে পা বাড়ালো।

—সাঁইত্রিশ—

পরদিন সকাল থেকে সরোজের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার সঙ্গে চারজন কুলিও নিরুদ্দেশ।

খুঁজে খুঁজে সকলে হয়রাণ হয়ে গেল।

শেষে বিনয়বাবু বললেন—আজে-বাজে সবই তো দেখা হলো, আমার মনে হয় সে খাদের মধ্যে ডেভিডের খোঁজ করতে গেছে।

সকলে মিলে তখন চললো সেই খাদের ধারে।

সুড়ঙ্গ পথের মাঝামাঝি এসে সরোজের সঙ্গে দেখা, সে তখন ফিরছে, বিনয়বাবুকে দেখে বললো—ডেভিড যে কোথায় গেল, আশ্চর্য !

সকলে সরোজের মুখের পানে তাকালো।

সরোজ বললো—নীচে নেমেছিলাম—একেবারে নীচে। খুব গভীর তো নয়, খুব বেশী হলে পাঁচশো ফুট হবে। যত জল আর কাদা জমে আছে ওখানে। একটি জায়গায় মানুষের দেহের মত কাদার উপর একটি দাগও দেখলাম, পায়ের দাগ দেখলাম, কিন্তু ডেভিড গেল কোথায় কিছু তো বুঝতে পারছি না।

—কোন জানোয়ারে টেনে নিয়ে যায়নি তো ?

—জানোয়ার পাচ্ছ কোথায় ? দু'পাশে খাড়া পাহাড়, ওখানে জানোয়ার যাবে কেমন করে, আর সে রকম কাদায় একবার নামলে উঠে আসা মুস্কিল। সে-কাদায় পড়লে মানুষ মরে না। ডেভিড মরেনি, মরলেও তো তাকে ওখানে দেখতে পেতাম, কিন্তু সে গেল কোথায় ?

—মানুষের পায়ের দাগ দেখলে ত—সেটা কোথায় গেছে দেখলে না ?

—ওধারে খাদের গায়ে গিয়ে লেগেছে, তারপর আর দাগ নেই।

—তাহলে ওধার থেকে জমুরা রাতারাতি খাদে নেমে তাকে তুলে নিয়ে যায়নি তো ?

—কিন্তু রাত্রে এ খাদের মধ্যে নামতে কি ওরা সাহস করবে ?

—কিন্তু বাংলা মুল্লুকের লোক হয়ে তুমি সাহস করেছ, আর ওরা এদেশের পাহাড়ী জাত হয়ে সে সাহস রাখবে না ?

—না, কারণ ওদের কুসংস্কার আমাদের চেয়ে বেশী।

—চল, আগে সর্দারের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করে দেখি।

—কিন্তু সর্দার মেয়েকে ফিরে পেয়ে কাল রাত থেকে তাকে নিয়েই তো ব্যস্ত।

—তা বলে তো আর ডেভিডের সন্ধান না নিয়ে আমরা এখান থেকে নড়ছি না। সর্দার মেয়েকে ফিরে পেলে কাদের জন্য, আমাদের জন্যই তো ? না হলে তো ভল্লুকের পেটে যেত, সে কথা তো ভুললে চলবে না।

সরোজরা সর্দারের কাছে চললো।

—আটত্রিশ—

ডেভিডের মাথা ঘুরে গেল।

সিঁড়ির উপর থেকে এমনভাবে তাকে ফেলে দেবে তা যদি আগে জানতো তা হলে জমুদের হাতে বন্দী হওয়াও তো ভাল ছিল।

এরোপ্লেন থেকে ডেভিড বহুবার লাফিয়েছে। তবে এমনভাবে কোনদিন পড়তে হয় নি। তখন ছিল প্যারাচুট, নীচে কোথায় নামতে হবে তাও চোখে

দেখা যায়। পড়বার আগে মনকেও তৈরী করে নেওয়া যায়। আর এ কি হলো, কোথায় কত নীচে পাথরের বুকে পড়ে থেঁৎলে যাবে—ওঃ!

পতনের বেগে ডেভিডের দম বন্ধ হয়ে এলো, ভয়ে চোখ বুজে সে যীশুর নাম স্মরণ করলো।

শুধু কয়েকটী মুহূর্ত।

ডেভিডের সারা দেহের মধ্যে -শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্তের তালে তালে কি যেন একটা ঘটে গেল, সারা পৃথিবী বুঝি বারোটা সূর্যের তেজে পুড়ে গেল, একটি আগ্নেয়গিরি বুঝি চারিপাশ বিদীর্ণ করে ফেটে গেল, সর্বসংহারী ভূমিকম্পে জগৎ বুঝি চুরমার হ'য়ে গেল, খণ্ড প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবী প্রলয় করে অনন্ত নাগের বুকে বসে নারায়ণ বুঝি অট্টহাসি হেসে উঠলেন। চারশো চল্লিশ ভোল্টের ইলেকট্রিক যেন শক মারলো, মাথার মধ্যে যেন অসংখ্য আলো জ্বলে উঠলো, ডেভিড পড়লো—ডেভিড মরলো।

—উনচাল্লিশ—

মৃত্যুর পরেও যে মানুষ বাঁচে তা কে জানতো?

তবে কি সে মৃত্যুর ওপারে গিয়ে পেঁছিলো নাকি?

না। পরলোকে কি এমন সুন্দর খড়ের বিছানা পাওয়া যায়? তবে তো সে মরে নি। অমন পাহাড়ী খাদের মধ্যে পড়েও সে মরে নি—বেঁচে গেছে! খাদের নীচে এমন খড়ের গাদা!

ডেভিড উঠে বসলো।

তৎক্ষণাৎ দু'জন লোক এসে তাকে ধরলো। লোক দু'টিকে দেখে ভয় হবারই কথা। কালো পাথর কেটে কে যেন দুটি মানুষ গড়েছে।

ডেভিডকে তারা বাইরে নিয়ে এলো, সূর্য তখন প্রায় ডুবতে বসেছে।

ডেভিডকে ধরে তারা স্নান করালো, এক রকম গাছের ছাল পরতে দিল, তারপর অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে রাত্রির অন্ধকারে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। সারা দিন আহার নেই, তার উপর স্নান করা, পাহাড়ী পথ চলা—শরীর আর বয় না।

কিন্তু ডেভিড না চলতে পারলে কি হবে, তাকে যেতেই হবে।

একটা গুহার মধ্যে তাকে নিয়ে আসা হলো!

ভিতরটা অন্ধকার, ধূপ-ধুনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় পূর্ণ। প্রথমেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। খানিকক্ষণ পরে চোখে সয়ে গেলে দেখতে পেলে সেটা ঠিক গুহা নয়, একটি মন্দির বললেই হয়। একদিকে দুটি প্রদীপ জ্বলছে, সামনে দেওয়ালের গায়ে পাথরের বুকে খোদাই করা প্রকাণ্ড এক মূর্তি—দেবতার কি দানবের তা বোঝা যায় না। মাথার উপর একটি ঘণ্টা ঝুলছে, ডেভিডের এক সঙ্গী সেই ঘণ্টার দড়ি টেনে ঢং ঢং করে বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—আগচ্ছ!

ডেভিডকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার ডেভিড দেখতে পেল, একটি লোক জটায় মুখ ঢাকা, চোখ দুটির পানে তাকাতে ভয় করে। কালো মিশমিশে দাড়িগোঁপের ফাঁক থেকে লাল দুটি চোখ যেন জ্বলছে।

লোকটি কি কতকগুলি কথা বিড় বিড় করে বলতে বলতে ডেভিডের কপালে বড় বড় কয়েকটা সিঁদুরের ফোঁটা দিলে, তারপর লতাপাতা জড়ানো একটি পাগড়ি পরিয়ে দিলে ডেভিডের মাথায়, একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে পাগড়ির উপর বসিয়ে দিলে। তারপর তারা ডেভিডকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। ডেভিডের একবার মনে হলো প্রদীপটা মাথা নেড়ে ফেলে দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখবার কৌতূহল ছিল তার অপরিসীম, সে শান্তভাবে চললো।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি চলেছে। কত সিঁড়ি তা কে বলবে? পায়ের শিরাগুলি যখন টেনে ধরার উপক্রম হয়েছে, এমন সময় একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। জায়গাটি দেখলে এম্ফিথিয়েটারের কথা মনে জাগে। নীচে সমতল জমি ঘিরে পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাড়ের গায়ে এমনভাবে একটা বেষ্টনী দেওয়া আছে যেন বারান্দা। চাঁদের আলো থাকলে ডেভিড বুঝতে পারতো তাকে দেখবার জন্য সেই বারান্দার উপর কত লোক জমা হয়েছে। জায়গাটীর মাঝখানে বাঁশের

খুঁটি ছিল, তার সঙ্গে ডেভিডকে তারা বেঁধে ফেললো। ডেভিড কোন বাধা দিলে না, দিলেও সে পারতো না।

ডেভিডকে বেঁধে দু'জনে চলে গেল।

পাহাড়ী বারান্দায় লোকের চীৎকার জাগলো, একে একে অবিরাম মশালের আলো জ্বলে উঠলো। ডেভিড তাকিয়ে দেখলো চারিদিক থেকে লোক তাকে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েছে।

তারপর কি হলো সে ঠিক বুঝলো না, একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে নীচে চোখ নামিয়ে দেখে দুটি কালো কালো প্রকান্ড ভল্লুক মাথা দোলাতে দোলাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পিছনে আসছে আরও দুটি। তার পিছনে আরো···

ভল্লুকের দল এখনি তাকে ছিঁড়ে খাবে। কোন উপায় নেই মৃত্যু—অসহ্য যাতনা সয়ে তাকে মরতে হবে অনিবার্য!

ডেভিড চোখ বুঁজলো।

—চল্লিশ—

এদের দেখে আবাং সর্দার তো লাফিয়ে উঠলো, বললো—কোথায় ছিলেন আপনারা? এই মাত্র আমি লোক পাঠালাম আপনাদের খোঁজে। আমাদের গুপ্তচর দু'জন ফিরে এসেছে। জরুরী খবর এনেছে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন, এখনই আমাদের বেরুতে হবে।

—কোথায়?—বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—সে অনেক কথা, পথে যেতে যেতে বলবো। এখন শুধু জেনে রাখুন আপনাদের সেই বন্ধুটীকে রুমুরা আজ রাত্রে ভল্লুকের মুখে ফেলে দেবে। তাকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের এখনি যেতে হবে।

সরোজের মুখের বিমর্ষভাব একেবারে কেটে গেল, সে বললো—আমি তৈরী।

—কিন্তু আপনাদের তো এখনও স্নান আহার হয়নি।

সরোজ বললো—ও কিছু না, আমরা ঠিক আছি।

বিনয়বাবু বললেন—আমরা এখনই যাবো সর্দার।

ডাক্তার বললো কিন্তু খানিকক্ষণ জিরিয়ে আহারাদি করে যাওয়াটাই কি ভাল নয়?

সরোজ বললো—বেশ, তবে আপনি থাকুন, আমরা ঘুরে আসি।

ডাক্তার বললো—না, আমি ভীরু নই। আপনাদের পাশে না হয়, পিছনে দাঁড়াবার সাহস আমার আছে। তবে কি জানেন? ডাক্তার হিসাবে দেহের উপর দৃষ্টি রাখা আমার প্রধান কর্তব্য।

তখনি তারা যাত্রা করবার উদ্যোগ করলো।

আবার পাহাড়ী পথ।

সুড়ঙ্গ না হলেও পথটা সুড়ঙ্গের মতই সঙ্কীর্ণ। এ পথে কোনদিন মানুষ চলেছিল বলে তো মনে হয় না। কখনও লাফিয়ে, কখন হামা দিয়ে, কখন দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে সকলে নেমে এলো। সেটা উপত্যকা কি খাদ ঠিক করে বলা শক্ত। সামনে দিয়ে ঝিরঝির করে ঝর্ণা বয়ে চলেছে, চারিপাশেই ছোট বড় নানা গাছ গজিয়ে ঘন জঙ্গল করে ফেলেছে। যে গুপ্তচরটি পথ দেখাচ্ছিল, সে বললো—ওই ঝর্ণা বেয়ে এবার উপরে উঠতে হবে।

ঝর্ণা বেয়ে উপরে ওঠা যে কি কঠিন, তা ধারণাও করতে পারা যায় না। পাথরের গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, এত পিচ্ছিল যে পা রাখা যায় না। তবে সঙ্কীর্ণ ঝর্ণা, স্রোতের টান কম—এই যা কথা।

খানিকটা উঠতেই সামনে এক প্রশস্ত চত্বর দেখা গেল, গুপ্তচর বললো,—এটা হচ্ছে যকের জঙ্গল, ওই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন, ওই হচ্ছে যকের মন্দির, ওই খুঁটির সঙ্গে......

গুপ্তচরের কথা বেধে গেল।

এরা সকলে চেয়ে দেখলো মাঠের মাঝে খুঁটির সঙ্গে ডেভিড বাঁধা, আর কয়েকটা ভল্লুক চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করেছে, এখনি ছিঁড়ে খাবে হয়তো। গুলি করার সুযোগ নেই। সরোজ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, ভোজালিখানি কোমর থেকে টেনে দিয়ে ছুটে গেল।

একটা ভল্লুক তখন ডেভিডের উপর লাফিয়ে পড়েছে। সরোজ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে প্রকাণ্ড ভোজালিখানি ভল্লুকের চোখে বসিয়ে দিল। ভল্লুকটি

ডেভিডকে ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং চকিতে সরোজকে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে। দু'হাতের নখ দিয়ে গায়ের কোটটা টেনে ছিঁড়ে ফেললো। আবাং সর্দার সেই সময় প্রকাণ্ড টাঙ্গিখানা নিয়ে ছুটে না গেলে কি হতো বলা যায় না। বিনয়বাবুর বন্দুকও গর্জে উঠলো।

গুপ্তচরটা ছুটে গিয়ে ডেভিডের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে। ডেভিডের তখন জ্ঞান নেই। সে মাটির উপর পড়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার তাকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন। ভল্লুকের নখের আঘাতে ডেভিডের কাঁধ থেকে তখন রক্ত ঝরছে।

ভল্লুকের মুখ থেকে সর্দার কোন রকমে সরোজকে তো রক্ষা করলো, কিন্তু ভল্লুক কি একটা! সবক'টি ভল্লুক তখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এলো।

পাহাড়ের উপর থেকে যারা মজা দেখছিল, তাদের মধ্যে তখন হৈ হৈ পড়ে গেছে। বিনয়বাবু বললেন—আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না, সরোজ ডিনামাইট!

সরোজ ডাকলো সনি?

—ইয়েস্!

—রেডি?

—রেডি!

সনি এতক্ষণ একটু তফাতে গিয়ে পাহাড়ের একটি ছোট গুহার মধ্যে একটি প্যাকিং বাক্স্ রেখে তার চারিপাশে ঠিক করে পাথরের টুকরো ও গাছপালা দিয়ে চাপা দিচ্ছিল। বাক্সের সঙ্গে দুটি ইলেকট্রিকের তার লাগানো ছিল, সে দুটি এনে সনি সরোজের হাতে দিলে।

সামনে তখন ভল্লুকের দল।

মাথার উপর থেকে জমুরা বল্লম ও পাথর ছুঁড়ছে।

সকলে তাড়াতাড়ি ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলে গাছের ছায়ায় এসে বল্লমের হাত থেকে বাঁচা গেল বটে, কিন্তু ভল্লুকের মুখ থেকে অত সহজে তো আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তবু অবসর পেয়ে সরোজ হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলে দিয়ে ইলেকট্রিক তারের দুটি মুখ ব্যাটারীর দু'দিকে চেপে ধরলো।

তিন সেকেণ্ডও পার হলো না। একটা ভীষণ শব্দে সারা পাহাড়টা কেঁপে উঠলো। সামনের পাহাড়টা আগুনের গোলার মতো উপরে উঠে গিয়া তুবড়ীর মত ফেটে পড়লো। দু'একটা পাথরের কুঁচি ছিটকে এসে লাগলো তাদের গায়ে।

আবাংরা নেচে উঠলো। জমুদের যকের মন্দির টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেলো। কত জমু মরলো। যেমন পাপ তার তেমনি সাজা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর মানুষের কোলাহলে চারিদিক মুখর

হয়ে উঠলো। অজ্ঞান ডেভিডকে কাঁধে নিয়ে চার বন্ধু ফিরলো নিরাপদ আস্তানায়।

—বিয়াল্লিশ—

অসম্ভব খাটুনি গেছে, গায়ে হাতে পায়ে সব ব্যথা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে আর ইচ্ছে করে না। সকাল হয়ে গেছে, তথাপি চোখ বুজে সবাই বিছানায় পড়ে আছে।

সহসা দরজায় ঘা পড়লো,—খট্ খট্! খটাখট্!

—কে?

—আমি সর্দার।

—সর্দার? এতো সকালে?—সরোজ উঠে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার ভয়ানক। ওদের যক্ষ দেবতার মূর্তি এসে পড়েছে আমাদের সহরের মাথায়। সেই মূর্তিকে উদ্ধার করার জন্য দলে দলে জমুরা আসছে আমাদের আক্রমণ করতে।

—সত্যি?

—আর সত্যি মিথ্যার কি আছে মশাই, বাইরে এলেই ত সব বুঝতে পারবেন।

সকলে বাহিরে এসে দাঁড়ালো। আবাং সর্দার দেখিয়ে দিল সামনের পাহাড়ের উপর যক্ষ দেবতার প্রকাণ্ড পাথরের মুণ্ডটি এসে পড়েছে। প্রকাণ্ড মুণ্ডটা হাঁ করে তাদের পানে তাকিয়ে আছে, সজীব হলে এখনি তাদের গিলে খেতো বুঝি, দেখলে ভয় হয়।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—জমুরা কৈ?

—ওই যে দূরে বনের গাছপালা কাঁপছে দেখছেন—ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা আসছে—বলে সর্দার দূরে একটা জঙ্গল দেখিয়ে দিল। তার গাছপালাগুলি সামান্য নড়ছে বটে, কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ সেদিকে সকলে চেয়ে রইল। শেষে বিনয়বাবু বললেন—অত ভয় পাচ্ছ কেন সর্দার, তোমার সৈন্য নেই?

—আছে, কিন্তু......

সহসা একটি লোক ছুটে এসে জানালো—সর্দার, জমুরা এক ক্রোশের মধ্যে এসে পড়েছে।

—ঢাক পিটিয়ে সকলকে সাবধান করে দাও, সৈন্যরা যেন তৈরী থাকে, আমি এঁদের নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটি চলে গেল, একটু বাদেই দুম্ দুম্ করে দামামার শব্দ শোনা গেল।

বন্ধু পাঁচজন সর্দারের সঙ্গে অগ্রসর হলো।

জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি ঢিপি। ঢিবি হলে কি হয়, তার উপর থেকে অনেক নীচে পর্যন্ত বেশ দেখতে পাওয়া যায়। শত্রুদের উপর গুলি চালাবার এমন সুবিধা আর কোথাও নেই। ক'জন জমু জঙ্গলের বাহিরে আসতেই সরোজ গুলি ছুঁড়লো। লক্ষ্য তার কখনও ব্যর্থ হয় না। ক'জন তো সেখানেই শুয়ে পড়লো, আর ক'জন আবার জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

তারপর আর একটি জমুরও দেখা নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

সরোজ বললো—ব্যাটারা গুলি খেয়ে ভেগেছে!

সর্দার বললো—ভাগার লোক তারা নয়, দিনের আলোয় সুবিধা হবে না দেখে গা ঢাকা দিয়েছে, রাত্রের অন্ধকারে আবার আসবে।

—কিন্তু রাত্রে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোক এলে কি করে জানবো? আলোর কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

—আলো—মশালের আলো আছে।

সরোজ বললো—আমাদের টর্চ আছে তো?

সনি বললো—টর্চ জ্বলবে না, ঠাণ্ডায় সব ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেছে।

—তাহলে এখন কি করা যায়?

সকলে সেইখানে বসলো পরামর্শ করতে।

ডেভিড বললো—এবার ওরা আমায় ধরতে পারলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে।

সরোজ বললো—ধরতে পারলে তবে তো?

—রাত্রে ওরা এলে কি করবে শুনি?

কি করবে সরোজ নিজেই জানে না, বলবে কি?

শেষে ঠিক হলো সামনের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে তারা অপেক্ষা করবে। কোন জমু সেই অগ্নিব্যূহ ভেদ করে এলেই গুলি চালাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আগুন লাগাতে হলো না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে না উঠতেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আগুন-বাঁধা তীর এসে পড়তে লাগলো চারিপাশের গাছপালার উপর। দেখতে দেখতে চারিপাশের জঙ্গল আগুনে লাল হয়ে উঠলো।

সরোজ দু' একটি গুলি ছুঁড়লো, তাতে জমুরা ভয় পেল কিনা কে জানে।

ওদিকে আবাংদের সারা গ্রামের বুকে হৈ হৈ পড়ে গেল, মারামারি সুরু হয়ে গেছে। জমুরা এতক্ষণে তাহলে আক্রমণ করেছে। অন্ধকারে তাকিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—শুধু শোনা যাচ্ছে চীৎকার, হৈ হৈ রৈ রৈ আর হল্লা। আবাংদের কাছে গিয়ে যে সাহায্য করবে তার উপায় নেই। চারিপাশে আগুন জ্বলছে, বাইরে যাবার পথ নেই। সিংহ যেন শিকারীর জালে বাঁধা পড়েছে।

—তেতাল্লিশ—

রাত্রি শেষ হবার অনেক আগেই চীৎকার থেমে গেল।

আগুন জ্বলতে জ্বলতে অনেকটা পিছিয়ে গেছে।

সর্দার এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করছিল, এবার বললো—চলুন বাইরে গিয়ে দেখে আসি আমাদের লোকজনেরা কি করলো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

কি করে যে পোড়া গাছের গুঁড়ি আর জ্বলন্ত জঙ্গল পাশ কাটিয়ে বাইরে এলো তা তারাই জানে। সনি বললো—উঃ, কি তেষ্টাই না পেয়েছে! এবার একটু জল খেয়ে বাঁচবো।

কিন্তু জল খেতে আর হলো না। বাইরে আসতে না আসতেই চারিপাশে যে জমুর দল দাঁড়িয়েছিল, তারা একেবারে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। পিস্তলের গুলি চালাবার অবসর মিললো না, লোহার ভাঁটা খেয়ে একে একে সকলে শুয়ে পড়লো। ভাল করে রুখে দাঁড়াবার মত সময়ও পাওয়া গেল না। একটা ঝড় বহে গেল যেন।

—চুয়াল্লিশ—

বিচার সভা।

মাঠে একটা বেতের মোড়ার উপর জমু সর্দার বসেছে, তার চারিপাশে জমু সৈন্য। মাঝে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দী আবাং সৈন্যের দল। সকলের পিছনে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা—সরোজ ও সনি, ডেভিড ও ডাক্তার, বিনয়বাবু ও আবাং সর্দার।

বিচারের সময় যে সব আবাং শপথ করে জমুদের দাসত্ব করতে রাজী হলো তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। আর যারা রাজী হলো না তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার আদেশ হলো—তবে সংখ্যায় তারা নেহাৎ নগণ্য।

সব শেষে এরা ছ'জন।

জমু সর্দার বললো—তোমরা আমাদের, মানে জমু জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। তোমাদের কৌশলে আমরা আমাদের যক্ষ-দেবতাকে হারিয়েছি। তবে তোমাদের সাহস ও বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি। কত বাঙালীকে আমরা যক্ষ-দেবতার কাছে বলি দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের মত বাঙালী আমি দেখিনি। তোমরা যদি আমার পূর্বের কথামত আমার ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললো—পারবো না। একজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দুটো চোখ উপড়ে নিয়ে তোমার ছেলের চোখ দিতে আমি পারবো না।

—তাহলে ওদের মত তোমাদেরকেও আগুনে পোড়ানো হবে, ভেবে দেখ?

—ভেবে দেখেছি, সর্দার। অন্যায়কে স্বীকার করতে আমরা শিখিনি, আমাদের দেশে কি বলে জানো সর্দার ?—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

সর্দার গম্ভীর হয়ে বললো—কথাটি ঠিক-ই। তোমাদের দহনের ব্যবস্থাই তাহলে করি। তারপর অনুচরদের পানে ফিরে বললো—খুঁটি ঠিক কর, এদের সব জীবন্ত পোড়ানো হবে, আমি নিজের চোখে দেখবো।

জমু সর্দারের তখনকার মুখের পানে তাকালে বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

দেখতে দেখতে কয়েকটি বড় বড় খুঁটি এসে পড়লো। মাটি খুঁড়ে খুঁটি-গুলির গোড়ার দিকটা পুঁতে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। এক একটি খুঁটির নীচে শুকনো ডালপালা লতা-পাতা জড়ো করলো। তারপর এক একটি লোককে এক একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। এইবার শুধু নীচে আগুন দিলেই হয়।

—পঁয়তাল্লিশ—

কয়েকজন এবার প্রাণের মায়ায় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, কাতর স্বরে বললো—আমাদের পুড়িয়ে মেরো না সর্দার, আমরা তোমার কুকুর হয়ে থাকবো।

জমু সর্দার কোন কথা বললো না, শুধু একটু হেসে হাতের ইসারা করলো মাত্র। মশাল হাতে নিয়ে একটি লোক এগিয়ে এলো।

ডেভিড বললো—ডাক্তার, একটা মুখের কথা তো শুধু, বলই না যে ছেলেটার চোখ ঠিক করে দোব। তা হলে এই জীবন্ত পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচা যায়।

ডাক্তার মাথা নাড়লো, বললো— না, আমি তা পারবো না। বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র গান্ধীর দেশের লোক আমি,—সত্যের জন্য জীবন দোব তবু মিছে কথা বলতে পারবো না।

এর উপর আর কথা নেই।

জমু সর্দার জিজ্ঞাসা করলো—আমার কথায় এখনও তোমরা রাজী কিনা ?

ডাক্তার বললো—না !

—এই শেষ কথা ?

—হ্যাঁ। এই শেষ কথা।

—বেশ।—বলে সর্দার অনুচরদের পানে ফিরে বললো—আগুন লাগাও।

—ছেচল্লিশ—

সহসা আবাং সর্দার চীৎকার করে উঠলো—আমার মেয়ের কি হলো সর্দার ?

হি-হি করে সর্দার হেসে উঠলো, বললো—তোমার মেয়ে? মরবার আগে মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে দেবতার নাম কর!

—না সর্দার, মেয়ের খবরটা একবার বল—শান্তিতে তা হলে মরতে পারি।

—বেশ তবে শোন, তোমার পাপে আমাদের দেবতাকে আমরা হারিয়েছি, তাই তোমার মেয়ের রক্তে বেদী ধুয়ে দেবতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে,—বুঝলে?

—না না সর্দার, তাকে মেরো না। সে ছেলেমানুষ, সে তো কোন দোষ করেনি!

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জম্বু সর্দার অনুচরকে আদেশ দিলেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? আগুন লাগা!

দেখতে দেখতে শুকনো খড় ডাল পাতা ধু ধু করে জ্বলে উঠলো।

সরোজ বললো—এইবার সকলে ভগবানের নাম করে নাও, এ জীবনের তো এইখানেই শেষ হলো।

পায়ে আগুনের আঁচ এসে লাগলো। মাঝে মাঝে দু' একটা স্ফুলিঙ্গ গায়ে পড়ে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগলো। পুড়ে মরবার আগে সব ক'টি বন্ধু চোখ বুঁজে ভগবানের নাম করতে লাগলো। এবার মৃত্যুর সামনাসামনি এসে পড়েছে আর পাশ কাটাবার কোন উপায় নেই।

যতই হোক বাঙালী তো! শেষ মুহূর্তে ডাক্তার চীৎকার করে উঠলো—এমনভাবে মরতে পারবো না সর্দার, তোমার ছেলের চোখ ফিরিয়ে দোব

—সাতচল্লিশ—

সর্দারের মুখে হাসি ফুটলো। অনুচরদের কি বলতেই তারা ছুটে এসে বড় বড় লাঠির খোঁচা মেরে আগুন সরিয়ে পাঁচজনকে মুক্তি দিলে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—আবাং সর্দার?

—ওকে অমনিভাবে মরতে হবে, ওর জন্যেই আমাদের এতো ক্ষতি।

—না, না, ওকেও বাঁচান!

—আপনি কি ভাবেন, আমি আপনার কথা মতো চলবো?

ডাক্তার আর কি বলবে ভেবে পেলে না। আগুন তখন আবাং সর্দারের প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঠেলে আসছে। আগুনের তাপে আবাং সর্দার কুঁকড়ে উঠছে, সে দৃশ্য দেখতে পারা যায় না। সরোজ ক্ষেপে গেল। হাতের বাঁধনটা খোলা পেয়েই সামনের এক অনুচরের হাত থেকে একগাছি লাঠি কেড়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে আবাং সর্দারের পায়ের নীচে থেকে জ্বলন্ত কাঠ-কুটোগুলো সরিয়ে ফেললো।

জম্বু সর্দার চীৎকার করে উঠলো,—বাঁধো, ওই বাঙালীটাকেও বাঁধো, আবাং সর্দারের সঙ্গে দু'জনে এক সঙ্গেই নরকে যাক্।

জম্বুগুলো হা হা করে ছুটে এলো।

সনি চুপ করে থাকতে পারলে না। সেও এক জমুর হাত থেকে একখানা লাঠি কেড়ে নিয়ে ছুটে গেল সরোজকে সাহায্য করতে। সরোজের সাহায্যের কিন্তু দরকার ছিল না। লাঠি হাতে সে একাই একশো।

জমুরাও কম যায় না। সংখ্যায় তারা অনেক বেশী। সনি লাঠি ভাল করে চালাবার আগেই দশ জন তাকে ঘিরে ফেলে এমনভাবে থামিয়ে দিল যে হাতের লাঠি হাতেই রইল, চালাতে আর হলো না। তবে সরোজের হাত পাকা, কিন্তু সেই বা কি করবে, অবিরাম বাধা পেয়েও ছ'জনকে জখম করলো, তার হাতের লাঠিও জমুরা ছিনিয়ে নিলে।

জমু সর্দারের হুকুম মতো আবার সনি ও সরোজকে খুঁটির সংগে বেঁধে ফেলা হলো, জ্বলন্ত খড়গুলি টেনে আনা হলো পায়ের নীচে। ডেভিড ও বিনয়বাবু সেদিকে তাকাতে পারলেন না, জনকয়েক জমু তাদের পাহারা দিচ্ছিল। আগুনের তাপে সরোজ ও সনি কুঁকড়ে উঠলো। নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেবার আগে সরোজের মুখে হাসি ফুটলো, ডেভিড ও বিনয়বাবুকে লক্ষ্য করে সে বললো—আবার দেখা হবে, দুঃখ কিসের ?

সরোজ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে সুরু করলো ; কিন্তু যাতনায় মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। আগুনের তাপে ভাল করে সে আর কথা বলতে পারছিল না। তার দেহে তখন আগুনের তাপ লাগছে।

সহসা গুড় গুড় করে শব্দ হলো। পায়ের নীচে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠলো। বাসুকির ফণায় দোলা লাগলো বুঝি !

একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ করে পাহাড় ফেটে গেল। ধ্বসে পড়লো। মানুষের কাতর আর্তনাদে চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো। যারা বিচার করছিল, যারা পুড়ে মরছিল—সব একাকার হয়ে গেল। পাহাড়ের প্রকাণ্ড এক একটি খণ্ড গাছ-গুলা আর মানুষগুলিকে নিয়ে কোথায় যে ধ্বসে পড়লো কে তার হিসাব রাখে। কি যেন একটা হয়ে গেল। ভাল করে বুঝবার, ভাল করে উপলব্ধি করবার আগেই সনি, ডেভিড, ডাক্তার, আবাংরা, জমুরা—সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। পায়ের নীচের পাথর সরে গেল। কোথায় কে তলিয়ে গেল।

কি হলো, কে কোথায় গেল,—তা ভাল করে বুঝবার আগেই পাথরের গায়ে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন মানুষগুলি পাহাড়ের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূমিকম্পে পাহাড় দুলতে লাগলো।

—আটচল্লিশ—

উনিশ-শো চৌত্রিশ সালের পনেরোই জানুয়ারী সারা ভারতের বুকে ভূমিকম্পের যে সংহার মূর্তি দেখা দিয়েছিল, সেই দুঃসংবাদের ফাঁকে খবরের কাগজে আমাদের জানবার মত যে ক'লাইন ছাপা হয়েছিল, তাই এখানে তুলে দিলাম ঃ

"মজঃফরপুর ও মুঙ্গেরে ভূমিকম্পের শোচনীয় মৃত্যুলীলার খবর পাইয়া

দমদম এরোড্রোম হইতে জনকয়েক বাঙালী পাইলট ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পূর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক এবং মর্মান্তিক। তাঁহারা বলিয়াছেন, শুধু রেলপথ ধ্বসিয়া গিয়া, বাড়ী-ঘর ভাঙিয়া পড়িয়া

প্রকাণ্ড সহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় নাই, সেই সব ধ্বংসস্তূপের নীচে হইতে মুমূর্ষুদের আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। আর যাহারা আহত হয় নাই তাহারা পাগলের মত সহরের পথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এখনই শত শত সাহায্যকারী গিয়া না পড়িলে, বড়-বড় সহরগুলির অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

ফিরিবার পথে বৈমানিকেরা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আসামের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসেন। ভূমিকম্পের বেগ আসামেও বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছে, তাহা গৌহাটীর খবরে প্রকাশ পাইয়াছে। তার উপর এঁরা বলেন অনেক পাহাড় ফাটিয়া গিয়া বড় বড় খাদ হইয়া গিয়াছে। দুই এক স্থানে পাহাড় কিছু কিছু ধ্বসিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাহাড়ের উপর দুই একখানি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ তাঁহাদের নজরে পড়িয়াছে। বৈমানিকেরা কয়েকখানি ছবিও তুলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ফিরিবার সময় ব্রহ্মপুত্রের বুকে অনেকগুলি মনুষ্যদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গৌহাটীর জল-পুলিশ বিভাগে তাঁহারা খবর দিয়া যান। পুলিশ সেই ভাসমান লোকগুলিকে উদ্ধার করিয়াছে। সেই দলে কয়েকজন বাঙালী আছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা কিছুদিন পূর্বে আসামের জঙ্গলে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। ভূমিকম্পের ফলেই পাহাড় ধ্বসিয়া গিয়া তাহারা জলে পড়েন, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা মরেন নাই। তবে সকলেই গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন, অবস্থা আশঙ্কাজনক।"

—ঊনপঞ্চাশ—

"পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, বাঙালী কয়জন ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চোখের ডাক্তার শ্রীঅজয় সেন, যিনি কিছুদিন পূর্বে উমানন্দ ভৈরব দেখিয়া নৌকা করিয়া ফিরিবার পথে ব্রহ্মপুত্রের বুকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন তাঁহাকেও এই দলে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমাদের প্রতিনিধির কাছে আসামী জংলীদের সম্পর্কে তিনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, দুর্দান্ত জংলীরা তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুগণকে পুড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিয়াছিল, শুধু এই প্রবল ভূকম্পনের জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বারান্তরে আমরা প্রকাশ করিব।"

দিন কয়েক পরে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ডাক্তার শ্রীঅজয় সেনের যে কাহিনী ছাপা হয়েছিল—আমরা তা জানি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাই পড়লাম, আবার নূতন করে বলতে গেলে তার পুনরাবৃত্তি হবে। সেই ভয়ে এইখানেই এই কাহিনীর যবনিকা টেনে দিলাম।

—শেষ—

সহসা আর্তনাদ তুলে মোটরটা থেমে গেল।

গাড়ীতে আরোহী ছিল একজন। ভিতরে বসে কলকব্জা কয়েকবার নাড়াচাড়া করেও গাড়ী যখন আর আধ ইঞ্চিও অগ্রসর হলো না, তখন সে বাহিরে এসে দাঁড়ালো। হাতের টর্চ-লাইটের আলোয় ভিতরের মেশিনটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে গাড়ীটা চালাবার চেষ্টা করলো, মোটর কিন্তু চললো না।

—ইস্, নতুন গাড়ী নিয়েও পথের মাঝে এমন বিপদে পড়তে হবে কে জানে, এই রাত্রে এখানে এখন করি কি ?—আপন মনে কথা কয়টি বলে চারিপাশে সে একবার তাকিয়ে নিলে। পিছনে অন্ধকারে গাছের ফাঁক দিয়ে পথটি এগিয়ে এসে সামনের রহস্যময় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। একটা কেরোসিন তেলের আলো পথের ওপাশে মুমূর্ষু রোগীর মত ঝিমুচ্ছে। পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে গঙ্গার কালো জল। আর এক পাশে ছোট ছোট উঁচুনীচু আল্ ঘেঁষে ধান ক্ষেত। মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু চারিপাশ ঘিরে অন্ধকার জমাট বাঁধছে।

হাতঘড়ির উপর টর্চের আলো ফেলে সে দেখলো রাত সওয়া এগারোটা বেজে গেছে। নিজেকে সে একটু বিপন্ন মনে করলো। নিমন্ত্রণ খেতে এসে এমন বিপদে পড়তে হবে কে জানতো। কাছাকাছি কোথাও যে এই রাতে সাহায্য পাওয়া যাবে এমনও তো মনে হয় না, কি করবে খানিকক্ষণ ভেবেও সে স্থির করতে পারলো না।

সহসা দূরে একটা আলো তার নজরে পড়লো। তবে কি কাছাকাছি কোন লোকের বসতি আছে, সেই দিকে সে অগ্রসর হলো।

বেশীদূর নয়। মিনিট চার-পাঁচ যেতেই আলোটার খুব কাছে এসে পড়েছে বলে মনে হলো। কয়েকটা গাছের ফাঁক মাত্র ব্যবধান। উঁকি মারতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো, তাতে তার মাথা পর্যন্ত চন্চন্ করে উঠলো।

সে দেখলো, গঙ্গার তীরে দুটি লোক একটী লোককে কাঁধে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। খানিকদূর গিয়ে একটা স্থান বেছে নিয়ে লোকটিকে সেখানে তারা নামিয়ে রাখলো। তারপর দু'জনে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেইদিকেই ফিরে গেল।

তবে কি এরা কাউকে খুন করে রাত্রির অন্ধকারে মৃতদেহটি ফেলে রেখে

সরে পড়ছে? সে এদের অনুসরণ করবে নাকি? ঘটনাটা কতদূর কি হয় দেখাই যাক্ ভেবে সরোজ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আহাঃ, আজ যদি পিস্তলটা সে সঙ্গে নিয়ে আসতো!

একস্থানে এসে দুজনের একজন দাঁড়ালো এবং অপরকে আদেশ করলো—কারণ নিয়ে এসো, আর ত্রিশূল। পরে আর সব জিনিষ আনলেও চলবে।

দ্বিতীয় লোকটি নীচে নেমে সরোজের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। একটু পরে উঠে এলো একটি হাঁড়ি আর একটি ত্রিশূল নিয়ে। প্রথম লোকটি সেগুলি হাতে নিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে এলো। ততক্ষণে আকাশে ক্ষীণ একফালি চাঁদ উঠেছে। যা এতক্ষণ সরোজের চোখে স্তিমিত ছায়ার মত মনে হচ্ছিল, এবার তা স্পষ্টতর হয়ে দৃষ্টির সামনে ধরা দিল।

প্রথম লোকটি এবার কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে শবটির উপর কয়েকবার কারণ ছিটিয়ে দিল, তারপর চারিপাশে ত্রিশূলের একটা গণ্ডী টেনে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—জয় মা, কালী করালী লোল-জিহ্বা বিকট-দশনা মা!

গঙ্গার তীরে সেই স্তব্ধ রাত্রির বুকে সেই চীৎকার এমন বিকট এতো ভয়ঙ্কর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সরোজের কানে এসে বাজলো যে সরোজের সারা দেহ যেন কেঁপে উঠলো, দুঃসাহসী সরোজেরও বুকের মধ্যে ছম্‌ছম্ করে উঠলো।

দ্বিতীয় লোকটি একটা ঝুড়ি করে ততক্ষণে আরো কতকগুলি কি জিনিষ নিয়ে এসেছে। সেগুলি পাশে নামিয়ে রাখবার নির্দেশ দিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে প্রথম লোকটী আদেশ দিল— যাও, নৌকায় গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করগে।

লোকটি চলে গেল।

প্রথম লোকটি এবার কারণের হাঁড়িটা মুখের উপর তুলে ধরে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা কারণ গলায় ঢাললো। তারপর মৃতদেহটীকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে মৃতদেহটির বুকের উপর এসে বসলো, আরেকবার চীৎকার করে উঠলো—জয় মা, কালী করালী করাল-বদনা বিকট-দশনা মা!

তারপরেই একবার মাতালের মতো তীব্র কণ্ঠে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ—

সেই বিকট চীৎকার ও সেই অট্টহাস ক্ষণেকের জন্য সরোজের চারিপাশের জগৎকে যেন বিভীষিকাময় করে তুললো। কেমন-যেন ভয়ে তার স্নায়ুগুলির বোধশক্তি লোপ পেল। তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মতো হলো। ওই শবটি বুঝি তারই মৃতদেহ, তারই মৃতদেহের বুকে বসে ওই ভীষণদর্শন কাপালিকটি শব-সাধনার আয়োজন করছে, আর নিজের সাধনার আনন্দে উল্লসিত হয়ে মাঝে মাঝে পিশাচের মত অট্টহাসি হেসে জয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠছে—বিকট-দশনা করাল-বদনা মা—!

সহসা কোথা হতে একটা আর্ত চীৎকার সেই রাত্রির অন্ধকারকে আহত করে তুললো। কোথায় একটি লোক অসহনীয় যন্ত্রনায় একটু সাহায্যের ভরসা করেই বুঝি অমন করে পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো।

একবার...দুবার...তিনবার......

তৃতীয়বারের সে চীৎকার যেন অপরিসীম যন্ত্রণার, ক্ষীণ অথচ তীব্রতম, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের আর্তনাদ।

সরোজের সারা দেহ শিউরে উঠলো। এই নির্জন নদীতীরে রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ কাউকে হত্যা করছে নাকি? সরোজ চারিপাশে

দেখে নিলে, সামনে পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে ওই মৃতদেহের উপর উপবিষ্ট তান্ত্রিকটি ছাড়া আর তো কাউকে চোখে পড়ে না। তবে কি ওই মৃতদেহটির মধ্যে পিশাচের অধিষ্ঠান হবার পরে ওই মৃতদেহটিই অমন করে চীৎকার করে উঠলো?

সরোজের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো, মনে হল অন্ধকারে তারই চারিপাশে অসংখ্য অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করলো না, ধীরে ধীরে নিজের মোটরের কাছে চলে এলো। মোটরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় কে যেন সহসা তার কাঁধে হাত রাখলো। চমকে খানিকটা সরে গিয়ে সরোজ পিছনে ফিরলো, ফিরেই স্তব্ধ নিশ্চল কাঠের পুতুলের মতো তার সারা দেহ স্থির কঠিন হয়ে গেল। সরোজ দেখলো একটি লোকের দুটি জ্বলন্ত চোখ তার মুখের পানে চেয়ে আছে। সে জ্বলন্ত দৃষ্টির আকর্ষণ থেকে

সরোজ চোখ-ফেরাতে পারলো না, অনড় অচল হয়ে গেল। আদেশ হলো—এসো—!

আদেশের সংগে সংগে কাঠের পুতুলের মত আদেশকারীর অনুসরণ করে রাত্রির অন্ধকারে বনানীর ফাঁকে সরোজ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'দিন পরে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো:

মোটর আরোহীর আকস্মিক অন্তর্ধান

দুঃসাহসী নাগরিক নিরুদ্দেশ

"কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে 'সাহিত্য সেবক সমিতির' এক মজলিশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সরোজবাবু রাত সাড়ে দশটার সময় মোটরে করিয়া ফিরিতেছিলেন। মোটরে তিনি একা ছিলেন। নিজেই মোটর চালাইয়া ফিরিতেছিলেন। ফিরিবার পথে কি ব্যাপার ঘটে জানা যায় নাই। রাত্রে তিনি আর বাড়ী ফিরিয়া আসেন নাই।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, পরদিন সকালে কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে নন্দীগ্রামের পথে গঙ্গার তীরে মোটরখানি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। মোটরের মধ্যে কোনও আরোহী ছিল না। স্থানীয় লোকেদের কেমন যেন সন্দেহ হয়, তাহারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারে যে, ওই মোটরেই সরোজবাবু বাড়ী ফিরিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ সরোজবাবুর কোন সন্ধান পায় নাই।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত একমাসের মধ্যে এই অঞ্চলের এগারো জন লোক এমনিভাবে অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, অধিক রাত্রে জটাধারী এক সাধুকে গঙ্গার তটে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাঁহারা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে এই সাধু কাপালিক ছাড়া আর কেহ নন। এতোগুলি লোকের অর্ন্তধানের সঙ্গে এই সাধুরই কোন চক্রান্ত আছে। নন্দীগ্রামের বাসিন্দাদের মনে এই ব্যাপারে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এতো বড় ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরেও পুলিশ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেছে না। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য সরকার যে বিরাট পুলিশ বাহিনী পুষিতেছেন, গুপ্ত রহস্য ভেদ করার জন্য যে গোয়েন্দা বিভাগ রহিয়াছে,—তাহাদের কি কর্তব্য ছিল না যে নন্দীগ্রামের অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য এগারো জন নিরুদ্দিষ্ট হইবার অনেক আগেই এই রহস্য সমাধান করিয়া ফেলা। পুলিশ এখনও কি করিতেছে তাহাই আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি।"

উপরের খবরটি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল দু'দিন পরে। এই দু'দিন সরোজের সন্ধান পাবার জন্য বিনয়বাবু ও ডেভিডের ছুটাছুটি করেই কেটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ডেভিড ফিরতেই বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো?

—দেখা করে সব কথাই তো বললাম। কিন্তু কমিশনার সাহেব তো আমার কথায় বিশেষ কোনই উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, যে ক'জন ছেলে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে, ওরা এনার্কিস্ট দলে ছিল। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকাতি করে বেড়াতো। শেষে আর সুবিধা করতে না পেরে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন করেছে। একদিন-না-একদিন তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, আজ পর্যন্ত যে ক'জন লোক নিরুদ্দেশ হয়েছে তারা সকলেই যুবক। কাপালিকদের দ্বারা এই ধরণের মানুষ চুরি হলে যুবকদের চেয়ে বালকদের ধরে নিয়ে যাওয়াই বেশী সহজ হত এবং কাপালিকেরা সাধারণতঃ তাই করে থাকে, ইত্যাদি।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সরোজের কথা কি বললেন? সেও কি ওই এনার্কিস্ট দলেরই একজন নাকি?

—না, তা নয়। বললেন—একা পেয়ে নিজেদের দলবৃদ্ধি করার জন্য, নাহলে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে। গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করলে হয়তো খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, কি মাটিতে পুঁতে ফেলেছে, কিছুই বলা যায় না। এনার্কিস্টরা সব কিছুই করতে পারে। বড় সাহেবের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আমরা আর কোন দিনই সরোজকেখুঁজে পাব না।

—সরোজ মারা গেছে, একথা আমি ভাবতেও পারি না।

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—ও-সব সেণ্টিমেণ্টের কথা এখন থাক, সরোজের সন্ধান নেবার কতটুকু কি তুমি করতে পেরেছ তাই বল?

—ব্যাপারটা বড়সাহেব সি-আই-ডি ডিপার্টমেণ্টের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

—কিন্তু ওদের ওপর আমার আস্থা কম, অত্যন্ত ঢিলে দিয়ে ওরা কাজ করে। এদিকে আমার বিশ্বাস সরোজকে যারা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে আর দেরী না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—সে কথাও আমি বড় সাহেবকে বলেছি। তিনি হেসে জবাব দিলেন—'ইচ্ছা করলে তোমরাও সন্ধান করতে পার। আমার তাতে আপত্তি নেই।' সি-আই-ডির মুখ চেয়ে বসে না থেকে আমি মতলব করেছি আজই একবার সরোজের সন্ধানে বেরুবো। আপনি কি বলেন?

—আমারও তাই ইচ্ছা।

রাত তখন প্রায় দশটা।

ডেভিড ও বিনয়বাবু বাহির হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন—এখন মোটরেই যাই, শেষে নন্দীগ্রামের মাইল-খানেক আগে একটা সুবিধামত জায়গা দেখে মোটর রেখে হেঁটে এগোবো।

ডেভিড বললো—আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো—সরোজের জন্যে আমি সব কিছুই করতে রাজী আছি, সরোজকে খুঁজে বের করা চাই!

—নিশ্চয়ই! অমন বন্ধু আমাদের আর হবে না।

—বন্ধু !

সহসা পিছনে সরোজের গলা শুনে দু'জনে চমকে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে দেখে পিছনে সরোজ দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে পিস্তল।

পিস্তলটা ডেভিড ও বিনয়বাবুর কপালের দিকে তুলে ধরে রুক্ষ কণ্ঠে সরোজ বললো—আমি আর তোমাদের বন্ধু নই। বন্ধুত্বে আমার আর দরকার নেই, এখন থেকে তোমরা আমার পরম শত্রু বলেই জানবে।

কথাগুলি এমন রূঢ় এবং সরোজের মতো বন্ধুর মুখ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত যে ডেভিড কি বিনয়বাবু কারও মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা জোগালো না।

শেষে ডেভিড কথা বললো, বললো—আরে ! থিূ চিয়ার্স ফর ইউ, হুররে ! তোমার জন্য এখনি আমরা নন্দীগ্রাম যাবার যোগাড় করছিলাম, খুব সময় এসে পড়েছ যাহোক !

—হ্যাঁ, খুব সময়েই এসে পড়েছি ! কেন এসেছি জানো ? তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তোমাদের সব টাকাকড়ির এক তৃতীয়াংশের মালিক আমি। তোমাদের দু'জনে শঠতা করে আমায় এদ্দিন ফাঁকি দিয়ে এসেছ, আজ সেই অংশ বুঝে নিয়ে চললাম।

ডেভিড্ ভাবলো সরোজ এতক্ষণ তাদের সঙ্গে থিয়েটারী কায়দায় অভিনয় করে যাচ্ছে, হেসে বললো—ঠাট্টা রাখো, এসো, বসো,—আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি ? বলা নেই, কহা নেই, একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিলে কোথায় ?

আগের মত রুক্ষ স্বরে সরোজ বললো—তোমাদের সঙ্গে অতো কথা বলার মতো যথেষ্ট সময় আমার এখন নেই। আমি চললাম। সিন্দুক খুলে গয়না-পত্র সব নিয়ে যাচ্ছি, আমার ন্যায্য পাওনা সব মিটে গেল—বলে সরোজ যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ বাহির হয়ে গেল।

ডেভিড্ ও বিনয়বাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার আগেই বাইরে মোটরে স্টার্ট দেবার শব্দ হলো। বিনয়বাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ছুটে বাহিরে এসে হাঁকলেন—সরোজ ! সরোজ !!

—দুম্ ! দুম্ !!

দুই ডাকেরই জবাব এলো। তবে মুখের কথায় নয়, পিস্তলের গুলিতে।

গুলি দুটি চলতি মোটর হতে ছোঁড়া হয়েছিল বলেই সে-যাত্রা বিনয়বাবু বেঁচে গেলেন। না হলে কি যে হতো, বলা যায় না।

বিনয়বাবুর পিছনে ডেভিডও ছুটে বাহিরে এসেছিল। তাদের পাশ দিয়ে দুটি গুলি দেয়ালে এসে ধাক্কা খেল। দেয়ালে নীলাভ সাদা দুটি দাগ পড়লো। তাদের লক্ষ্য করে যে সরোজের হাতের পিস্তল হতে গুলি ছুটে আসতে পারে, তা ডেভিডের জীবনে শুধু বিস্ময়করই নয়, ধারণারও অতীত।

সরোজের মোটরের পিছনের লাল আলোটি পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে কিছুক্ষণ তারা সেই ভাবেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আচম্বিতে উপর হতে সনির গলা পেয়ে তারা চমকে উঠলো—কাকামণি ! কাকামণি !

সনি যে একা উপরে আছে, সরোজের আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময়ে ডেভিড ও বিনয়বাবু তাহা ভুলেই গিয়েছিলেন। সনির ডাকে দুজনের বিস্ময়ের তন্দ্রা টুটে গেল। মুখে কেউ কোন কথা বললো না, তরতর করে একেবারে উপরে উঠে গেল। উপরের ঘরে ঢুকে দেখে সিন্দুক খোলা। সনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। মুখেও বাঁধন ছিল, সেটা টেনে সরিয়ে সে চীৎকার করে তাদের ডেকেছে।

সনি গরগর করে অনেক কথাই বললো, বললো—সবে পড়তে বসেছি এমন সময় বাইরের বারান্দায় কিসের যেন একটা শব্দ শুনলাম। ভাবলাম আপনারা কেউ হবেন হয়তো। সহসা পিছনে সরোজদা'র চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—'চুপ করে থাকো, নাহলে অনিষ্ট হবে!' পিছু ফিরে দেখি সরোজদা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের চেহারা দেখে সত্যি আমার ভয় হলো। সেই ফাঁকে 'সরোজদা' আমার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো।

তারপর আমায় এখানে ফেলে রেখে, সিন্দুক খুলে যে সব গয়নাপত্তর ছিল—সব বের করে নিয়ে একটা এটাচি-কেসে ভরে নীচে চলে গেলো। ভাবলাম নীচে আপনাদের সাবধান করে দিই কিন্তু চীৎকার করার উপায় ছিল না, মুখের মধ্যে কাপড় ঠাসা ছিল। ইতিমধ্যে পিস্তলের শব্দ পেলাম। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। এদিকে ততক্ষণে চেষ্টা করে মুখের বাঁধনটা সরিয়ে ফেলেছি। মুখের ভিতর থেকে কাপড় বের করে আপনাদের ডাকলাম।

সনির বাঁধন খুলে দিয়ে সকলে সিন্দুকের কাছে গেল। সিন্দুক খালি। সিন্দুক ভর্তি গহনা ছিল। স্বর্গগতা মায়ের গহনাগুলি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বিনয়বাবু যত্ন করে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। সেগুলি সব সরোজ নিয়ে গেছে।

সনি বললো—গয়না তো সব নিয়ে গেছে, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র?

—সেগুলো নিলেই তো আর টাকা পাওয়া যাবে না, বরং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে আনার সময় ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী—ডেভিড বললো।

বিনয়বাবুর মুখ তখন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, লাল-নীল ভেলভেটের গহনার খালি বাক্সগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—সরোজ শেষে এমন করলে! সরোজের কাছ থেকে এতটা তো আমরা আশা করিনি। আমায় বললেই তো নগদ টাকা দিয়ে দিতাম,—দোব না তো কখনও বলিনি! আমার মায়ের গয়নাগুলো এমনভাবে নিয়ে গেল!

ডেভিড বললো—সবটাই যে সরোজের দোষ, আমার তা ঠিক মনে হয় না। ব্যাপারটায় আমার কেমন যেন খট্‌কা বাধ্‌ছে। সরোজ তো এই ধরণের মানুষ নয়, আমি তো জানি!

—জানি মানে? চোখের সামনে দেখেও তুমি তোমার বন্ধুকে 'গুড্‌ ক্যারেকটার'-এর সার্টিফিকেট্‌ দেবে?

—না না, তা নয়। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি কি, যে-লোক নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আমাদের জীবন রক্ষা করেছে, সে কখনও স্বেচ্ছায় আমাদের অনিষ্ট করবে,—এ কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না।

—চোখের সামনে দেখেও তুমি অস্বীকার করবে?

—অস্বীকার করছি না, তবে স্বীকার করার আগে সরোজের চরিত্রের হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন হলো সেই কারণটা অনুসন্ধান করে দেখতে চাই।

—আমাদের আর অনর্থক হয়রাণ হয়ে লাভ কি? পুলিশে খবর দিলেই তারা সব বের করবে।

—পুলিশে খবর দিলেই কি গয়নাগুলো উদ্ধার হবে,—হয়তো সারা জীবনেই গয়নাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারবে না।

—তবে তুমি কি করতে বল?

—নতুন কিছুই নয়, আমাদের যেমন কথা ছিল তেমনি ভাবেই কাজ করতে বলি।

—এই ঘটনার পর তুমি কি পুলিশে খবর না দিয়ে আগে নন্দীগ্রাম যেতে বল?

—হ্যাঁ। পুলিশ তো খবর পেয়ে এখনই গয়নাগুলো উদ্ধার করে আনবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডায়েরী করলেও তো চলবে। এখন আগে আমাদের নন্দীগ্রামে যাওয়াই দরকার। সেইখান থেকেই সরোজ নিরুদ্দেশ হয়। ওইখানেই কোথাও একটা আড্ডা আছে। সরোজ এইসব গয়না-পত্তর নিয়ে যদি কোথাও যায় তো খুব সম্ভব সেই নন্দীগ্রামের আড্ডাতেই যাবে। এখনই যদি আমরা পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটর চালাই, তাহলে চাই কি শেষ পর্যন্ত সরোজের মোটর হয়তো পথেই ধরে ফেলতে পারি। তাহলে তো আজ এখনই গয়নাগুলো উদ্ধার হবে। পুলিশ কি তা পারবে? আর এখন যদি পুলিশ ডাকেন তো কথার পর কথার জবাবদিহি করতে করতে রাত বারোটা বাজবে। এদিকে গয়নাগুলো উদ্ধারের আশাও কমে যাবে।

—বেশ তুমি যখন বলছ, তাই চলো।

মোটরে দুজন যাত্রী—ডেভিড ও বিনয়বাবু।

ডেভিডের পায়ে মোটরের গতি, হাতে চলার নির্দেশ। ঝড়ের মত মোটর ছুটছে।

মুখর কলিকাতা মূক হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার শহরের গলা টিপে ধরে কণ্ঠরোধ করেছে। পথের আলোর নীচে চলন্ত নাগরিকের ভীড় আর নেই। দুপাশের বিপণির চাকচিক্য এখন আর চোখে ধাঁধা লাগায় না। এই খানিক আগেও যে গৌরব নিয়ে মহানগরী ঝলমল্ করছিল, সহসা যেন আলাদিনের কোন মায়াপ্রদীপের স্পর্শে সে সব উবে গেছে। সঙ্গীহীন ইলেকট্রিকের আলোগুলি বিষণ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শহর এখন মরে গেছে। মৃত শহরের বুকে অতীত জাঁকজমকের সাক্ষ্য দিচ্ছে মাঝে মাঝে দু-একখানি পান-বিড়ির দোকান, খাবারের দোকান, থিয়েটার ও বায়োস্কোপ গৃহগুলির রঙীন আলো। সব পিছনে ফেলে মোটর ছুটছে। পায়ের মৃদু আঘাতে চারখানি চাকা নিঃশব্দে ঘুরে চলছে,—বিরাম নাই। রাজপথের বুক চিরে মোটর ছুটছে ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে। সামনের সুদূর পথ নিকট হতে নিকটতর—নিকটতম হয়ে চাকার নীচ দিয়ে পিছনে আবার দূরতম হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পিচ্ঢালা শহরের পথ দেখতে দেখতে পল্লীর ধূসর পথে এসে মিলে গেল। মেঠো পথের ধুলায় মোটরের পিছনে ধূসর হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ-বাতির পর গ্যাসের আলো, শেষে তাও ফুরিয়ে এখন কেরোসিন তেলের স্তিমিত-প্রায় লণ্ঠন দেখা দিয়েছে। কোন এক স্থানে দোতলা তিনতলা বাড়ীর সারি শেষ হয়ে শ্যামল বনানীবহুল পথের পাশে মাঝে মাঝে দু' একখানি কুটীর চোখে পড়ে। বর্তমানকে ফাঁকি দিয়ে এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার জাঁকজমক, বাড়ী-গাড়ী-আলো থেকে মোটরখানি যেন পুরোণো যুগে ফিরে যাচ্ছে।

কতক্ষণ চলার পর একটা লেভেল্-ক্রসিংয়ের কাছে তারা এসে পড়লো। এইমাত্র একখানি ট্রেণ চলে গেছে, এখনও তার হুম্হুম্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রসিংয়ের ফটক এতক্ষণ বন্ধ ছিল। সামনে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। ফটক খুলে দিতেই সামনের মোটরখানি তীরের মত ছুটে চলে গেল। ডেভিডের মোটর তখনও ক্রসিংয়ের কাছে আসে নি। আগের ছুটন্ত মোটরখানি দেখে বিনয়বাবু বললেন—ওখানা সরোজের মোটরের মতো, না ?

—হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

সামনের মোটরের লাল আলোটীর পশ্চাতে পিছনের মোটরটি ছুটে চললো।

সামনের মোটরখানি যেন ঝড়। অন্ধকারে মেঠো পথের উপর দিয়ে যে ভাবে ছুটে চলেছে তাতে যে কোন মুহূর্তে কোন গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে, কি খানায় পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ওই মোটরখানির পিছনে অতো বিপজ্জনক ভাবে গাড়ী চালাতে ডেভিড ভয় পেল, বললে—এই অন্ধকারে অমন

বিশ্রীভাবে মোটর চালাচ্ছে, সুস্থ মনে এমনভাবে কেউ মোটর চালাতে পারে না।

—আমাদের খুব সম্ভব ভুল হয় নি। ওইটে নিশ্চয়ই সরোজের গাড়ী। আমাদের চোখের আড়ালে পালাবার জন্যেই অমনিভাবে গাড়ী চালাচ্ছে, দেখো কোন মতেই ও যেন চোখের আড়ালে যেতে না পারে।

—কিন্তু এই বিশ্রী অজানা পথে এই অন্ধকারে অতো জোরে মোটর চালাই কেমন করে?

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—তুমিই না যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন চালাতে? আর এই সামান্য পথ, তার উপর আগে-আগে একখানা মোটর তো পথ দেখিয়েই চলেছে।

সহসা প্রথম মোটরখানির গতি কমে গেল। ডেভিডদের মোটরখানি তার কাছে এসে পড়তেই প্রথম মোটরখানি থেকে একখানি মুখ বাহির হলো, হেড্ লাইটের আলোয় সে-মুখ দেখেই বিনয়বাবু ও ডেভিড এক সঙ্গেই বলে উঠলো—সরোজ!

সেই মুহূর্তে ফট্‌ফট্ করে কয়েকটি গুলি এসে মোটরের সামনের কাচখানি ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে দিল। তারপরেই সরোজের গলা শোনা গেল—get back, you fools, get back!

ডেভিড চীৎকার করে ডাকলো—সরোজ—সরোজ!

উত্তরে একটা অট্টহাসির রেশ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

পরমুহূর্তেই সরোজের মোটর আবার পূর্ণবেগে ছুটতে সুরু করলো।

তারপর আবার সেই রাত্রির অন্ধকার, সেই উঁচু নীচু মেঠো পথ...সামনে ও পিছনে সেই দুখানি ছুটন্ত মোটর গাড়ীর রেস্...সেই ঝড়ের গতি...সেই পূর্ণবেগে ঘূর্ণ্যমান চাকার ঘস্‌ঘস্ শব্দ...সেই বনানীর মর্মর...সেই মেঠো ধুলার ঝাপ্টা...এ বুঝি আর থামবে না।

বিনয়বাবু বললেন—দেখো ডেভিড মোটরখানা ধরা চাই-ই চাই, ও কতক্ষণ চলে চলুক না, পেট্রল তো একবার ফুরোবেই।

ডেভিড হাসলো, বললো—ওদের আগে ফুরোবে কি আমাদের আগে ফুরোবে কি করে বুঝলেন?

—তা বটে।

—আহা-হাঃ, সামলে! লাফিয়ে পড়ুন—লাফিয়ে পড়ুন—বলে ডেভিড আর দাঁড়ালো না, অপেক্ষা করার অবসরও তখন আর ছিল না, মোটরের দরজা খুলে সে ছিট্‌কে লাফিয়ে পড়লো।

দুর্যোগটী সরোজ ইচ্ছা করেই ঘটালো। যখন সে দেখলো পিছনের মোটর-খানিকে কোন রকমেই ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে না, এদিকে পেট্রলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে তখন মরিয়া হয়ে সহসা একটা প্রশস্ত পথের মোড়ে

ক্ষিপ্রভাবে মোটরখানি সে ঘুরিয়ে নিলে, তারপরেই পিছনের মোটরের মুখোমুখি এগিয়ে এলো।

সরোজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ডেভিড বিনয়বাবুকে সাবধান করে দিয়ে ব্রেক কষেই মোটর হতে লাফিয়ে পড়লো। বিনয়বাবু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হতচকিত হয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরী করে ফেললেন। তারপর যখন সবেমাত্র দরজা খুলে পাদানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় সরোজের মোটর এসে তাদের মোটরে ধাক্কা মারলো। বিনয়বাবু ছিটকে পড়ে গেলেন। মোটরখানি উল্টে গেল। একটা প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দে রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ পল্লী সচকিত হয়ে উঠলো।

পথের পাশে নালার মধ্যে পাঁক জমে আছে, তার উপর থিতিয়ে আছে নর্দমার নোংরা দুর্গন্ধময় জল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ডেভিড লাফিয়ে পড়েছিল এই নালার ঢালু কিনারার উপরে। সহসা ঢালু জমির উপর পড়লে দেহের সমতা রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে, ডেভিডও নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না, একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পড়লো নর্দমার পাঁকের মধ্যে।

পাঁকের মধ্যে পড়লো বলেই ডেভিড সে-যাত্রা রক্ষা পেল, না হলে হাত-পা ভেঙ্গে কি যে হতো বলা যায় না। যাক, প্রথম ঝাঁকিটা কেটে যেতেই খানিকক্ষণ চেষ্টা করে ডেভিড যখন নালার পাঁক হতে উপরের পথে উঠে এলো তখন

বেচারার কাপড় জামার রং একেবারে বদলে গেছে। সর্বাঙ্গে পাঁকের উৎকট দুর্গন্ধ। আঙ্গুল দিয়ে জামা কাপড় থেকে খানিক পাঁক চেঁছে ফেলে, রুমাল দিয়ে মুখটি মুছে নেবার পরও পাঁকের সে গন্ধ যেন কিছুতেই আর দেহ থেকে ছাড়তে চায় না। দুর্গন্ধ না ছাড়ুক, ওই দুর্গন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ডেভিডের তখন নেই। অন্ধকার রাতে এই গেঁয়ো পথে মোটরখানি ধাক্কা খেয়ে

অচল হয়ে যাবার পর এখন তার কি কর্তব্য ডেভিড তাই ভেবে নেবার চেষ্টা করলো।

দূরে একখানি মোটর চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার মাঠ, বনানী আর আকাশের তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কতো দূরে কোন পথ দিয়ে একখানি মোটর চলে যাচ্ছে, নিস্তব্ধ পল্লীর আকাশ বাতাস সচকিত করে তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। আহা, ওই মোটরখানি যদি এই পথে আসতো! হতাশভাবে ডেভিড একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

মোটরটি কিন্তু সেই পথেই আসছিল। পুরাণো মোটরের ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। ডেভিডের মনে আশার সঞ্চার হলো। পল্লীর এই অন্ধকার পথে দেবতার আশীর্বাদের মত মোটরখানি এই দিকেই আসছে, সাহায্য পাবার হয়ত সুবিধা হবে।

দেখতে দেখতে অত্যন্ত কাছে ঘস্‌ঘস্‌ করে ব্রেক কষে মোটর থামার শব্দ হলো। মোটর থামলো। এতো রাতে এই গেঁয়ো পথে মোটর চালাচ্ছে অথচ একটিও আলো নেই? তবে কি এদের কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে? তাই যদি হয়, তা হলে প্রথমেই এদের কাছে সাহায্য চাইতে না গিয়ে, আড়ালে লুকিয়ে এদের চালচলন লক্ষ্য করাই উচিত। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ডেভিড আবার পথের পাশে নালায় গিয়ে নামলো।

একটু পরেই টর্চের আলো দেখা গেল। ধাক্কা-লাগা মোটর দুখানির পাশে টর্চের আলো ফেলে দুটি লোক কি যেন দেখলো। তারপর তারা বিনয়বাবুর অচৈতন্য দেহ নিজেদের মোটরে রেখে এসে আবার টর্চের আলোয় কার যেন খোঁজ করতে লাগলো।

একজনের গলা শোনা গেল—ওদের গাড়ীতে দু'জন ছিল, না একজন?

—দু'জন দেখেছিলাম।

—আরেকজন গেল কোথায়? এমন মোটরের ধাক্কা সামলে এর মধ্যেই পালালো?

—একজন অজ্ঞান বন্ধুকে ফেলে পালাবার ছেলে সে নয়। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে। আসুন দিকি একবার ওপাশের নালাটা দেখি।

লোক দু'টি নালার দিকে আসছে দেখে ডেভিড চোখ বুজে শক্ত হয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে রইল।

পায়ের শব্দ নালার পাশে এসে থামলো।

এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়লো ডেভিডের মুখের উপর।

কেউ কোনো কথা বললো না। দু'টি লোক এগিয়ে এসে ডেভিডকে তুলে নিয়ে এলো মোটরে। তারপর মোটর ছাড়লো।

যেমন অন্ধকারে মোটরখানি এসেছিল, তেমনি অন্ধকারেই মোটরখানি ফিরে চললো।

সাবধানে সন্তর্পণে ডেভিড মিট্‌মিট্‌ করে তাকালো। ভাল করে কিছুই বুঝতে পারলো না। সহসা একচোখো একটা ভূতের মতো পথের পাশে কেরোসিন তেলের একটা আলো মোটরের পাশ দিয়ে পিছন দিকে ছুটে গেল। সেই ক্ষণিক স্তিমিত আলোয় আবছায়ার মতো ডেভিড দেখতে পেল ছুটন্ত মোটরের মধ্যে পিছনের সিটের পা-রাখার জায়গায় সে পড়ে আছে। উপরের বসবার আসন থেকে খানিকটা কাপড় ঝুলে পড়েছে তার গায়ের উপর। অন্ধকারে একটা হাত চকিতে একবার উপরে তুলে ডেভিড সেই কাপড়টা সাবধানে একটা টান মারলো। টানটা বোধ হয় একটু জোরেই হয়েছিল, থপ্‌ করে কি একটা জিনিষ একেবারে এসে পড়লো ডেভিডের মুখের উপর। ডেভিড চমকে উঠলো। চোখ বুঁজলো।

চুপচাপ ক'মিনিট কেটে গেল। মুখের উপর থেকে জিনিষটা না সরালে আর স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ডেভিড একবার মাথা নাড়লো। এক ঝট্‌কা মারলো। তথাপি মুখের উপর থেকে সেটা সরেও না, পড়েও না। ডেভিড্‌ হাত দিয়ে জিনিষটা সরাবার চেষ্টা করলো। হাত দিয়েই সে বুঝলো, এতক্ষণ সে যা ভেবেছিল তা নয়, তার মুখের উপর যা এসে পড়েছে, সেটা একটি লোকের হাত। যা সে কাপড় মনে করেছিল, তা পাঞ্জাবীর হাতা—খদ্দরের পাঞ্জাবী। খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা হাত।···তা হলে এ আর কারও নয়, বিনয়বাবুরই। তারই উপরের বসবার আসনে বিনয়বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

কিছুটা পথ এসে মোটর থামলো।

চালকের আসন থেকে দুটী লোক নেমে এসে অন্ধকারেই বিনয়বাবুর অজ্ঞান দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল—কাছাকাছি কোথায় যেন রাখতে গেল।

তারা বিনয়বাবুর অজ্ঞান দেহটি ধরাধরি করে মোটর হতে নামবামাত্রই ডেভিড উঠে বসলো। তারপর মোটর থেকে নেমে তাদের পিছু পিছু অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল।

বড় বেশী হলে মিনিট দুয়েক হবে।

দু-মিনিট পরে একটা চীৎকার সেখানকার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ডেভিডের কানে এসে ধাক্কা দিল। সে রকম করুণ চীৎকার ডেভিড কোনদিন শোনেনি। কি যেন এক আতঙ্কে গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো।

ডেভিড আর সেখানে দাঁড়ালো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে চললো। চলতে চলতে তার কানে এসে বাজলো জলস্রোতের মৃদু ছল্‌ছল্‌ শব্দ, গায়ে এসে লাগলো জলো হাওয়া। ডেভিড বুঝলো, গঙ্গার তটের কাছাকাছি কোথাও সে এসে পড়েছে –এখানে তো আর অন্য কোন নদী নেই।

সহসা পিছনে সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, আর তারই সঙ্গে শুনতে পেল লোকের কথা—কি রে, লোকটি কি এক মিনিটে উবে গেল নাকি ?

—তাইতো দেখছি, একেবারে ভোজবাজী !

—ভোজবাজী না ছাই, এই ফাঁকা মাঠে কোথায় পালায় দেখছি, টর্চটা জ্বালতো ?

ডেভিড ততক্ষণে ছুটতে সুরু করেছে। খানিকটা এসেই ঢালু ভিজে মাটি। সেখান দিয়ে তরতর করে নেমে ডেভিড একেবারে জলের কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই টর্চের আলোয় গঙ্গার তট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় পিছনের লোক দুটি গঙ্গার তটের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা ডেভিডকে স্পষ্ট দেখতে পেল—ওই যে, - ওই !

লোক দুটি ছুটে এলো ডেভিডকে ধরতে।

ডেভিড একবার পিছনের পানে চাইল, তারপর চাইল সামনের জলের পানে -মৃদু-ছলছলে কালো রহস্যময় জল অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন মিশে গেছে। এই রাত্রে ওই জলের মধ্যে নামতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এখন সেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবার সময় নাই। ডেভিড ঝুপ করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। লাফিয়ে পড়েই ডুব। কালো জলের বুকে ডেভিডের মাথাটা আর চোখে পড়লো না।

লোক দুটি এগিয়ে এলো। টর্চের আলো ফেলে গঙ্গার জলস্রোতের বুকে কিছুক্ষণ নজর রাখলো। ডেভিডের মুণ্ডু কিন্তু ভাসলো না।

—লোকটি কি ডুবে গেল নাকি ?

—হয়তো ডুব-সাঁতার কেটে সরে পড়েছে।

—থাকগে, ব্যাটা যখন গ্যাছে যাক্ !

লোক দুটি ফিরে গেল।

তটের অদূরে একখানি নৌকার আড়ালে ডেভিড তখন লুকিয়ে আছে।

লোক দুটি চলে যাবার পর ডেভিড জল হতে উঠে এলো, তারপর সেই ভিজা কাপড় জামা নিয়ে কত যে কষ্ট সয়ে ডেভিড কলিকাতায় পেঁছালো, তা সে-ই জানে।

পরদিন —

সকাল তখন ন'টা হবে।

নন্দীগ্রামে গঙ্গার ধারে একটি ছোট একতালা বাড়ী ভদ্রবেশী কয়েকজন পুলিস এসে ঘিরে ফেললো।

বাড়ীটির ভিতরে ঢুকতে কোন হাঙ্গামা হলো না। সামনেই বৈঠকখানা। ডেভিডই প্রথমে গট্‌গট্‌ করে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পুরাদস্তুর সার্জেণ্টের পোষাক। পিস্তলটা পকেটে চেপে ধরে আছে, প্রয়োজন হলেই বাহির করবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে যাকে সে দেখতে পেল, তাকে সেখানে দেখবার সে মোটেই প্রত্যাশা করেনি। দেখলো সামনেই একখানি চেয়ারে বসে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ইজেলে আট্‌কানো একখানি কাগজের উপর সরোজ তুলির আঁচড় টেনে চলেছে। ঘরটির চারিপাশের দেয়াল নানা রংয়ের হাতে-আঁকা ছবিতে ভরা।

ডেভিড ক' সেকেণ্ড থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অতগুলি লোকের পায়ের শব্দে শিল্পীর তন্ময়তা তখন ভেঙ্গে গেছে, ছবি হতে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো—কে আপনারা? কি চাই?

—আরে সরোজ, আমি!

—আপনি কে?

সরোজ যে একদিন তাকে চিনতে পারবে না বা ইচ্ছা করে চিনবে না, ডেভিড তা কোন দিন ভাবতে পারেনি। বিস্ময়ের উপরেও যদি কোন অবস্থা থাকে ডেভিডের মনের তখন সেই অবস্থা।

যে ইনেসপেক্‌টার সঙ্গে এসেছিল, সে ডেভিডকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো—ইনিই কি আপনার বন্ধু সরোজবাবু যিনি কাল রাত্তিরে আপনার বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন?

ডেভিড মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ?

ইনেসপেক্‌টারবাবু সরোজের কাছে গিয়ে বললে—সরোজবাবু, অপেনাকে ডাকাতি করার অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম।

—সরোজবাবু?—সরোজবাবু কে?

—আপনি!

—আমি? সরোজবাবু আমার নাম নয়।

—বেশ। তাহলে আপনার নাম কি?

—আমার নাম রবি দত্ত। আর্টিষ্ট রবি দত্ত। আমার আঁকা ছবি আপনি দেখেন নি 'ভারতবর্ষে' 'প্রবাসীতে'?

—না, আপনার ছবি দেখবার আমার দরকার হয়নি।

—এঁ্যা, আমার ছবি আপনি দেখেন নি? আমার ছবি দেখে রবিঠাকুর, অবনীঠাকুর, নন্দলাল বোস, ও-সি-গাঙ্গুলি কত প্রশংসা করেছেন, আর আপনি বলছেন আমার ছবি দেখেন নি! আমার অমন সব আর্টিষ্টিক ছবি—

—ও সব আর্টের কথা এখন ছাড়ুন।

—বলেন কি, আর্টের মধ্যেই তো জাতির কালচার, জাতির সভ্যতা ফুটে ওঠে—আর্ট ছাড়া কোন্ জাতি বাঁচতে পেরেছে আজ পর্যন্ত, আর্টই হচ্ছে জাতির প্রাণ।

—থাক, আর্টের ব্যাখ্যা শুনতে আমি আপনার কাছে আসিনি, আমি এসেছি আপনার বাড়ী সার্চ করতে।

—আমার বাড়ী সার্চ করতে? কেন?

—শুধু সার্চ করতে নয়, আপনাকেই গ্রেপ্তার করতে।

—আমি কি অপরাধ করেছি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—কাল রাত্তিরে একটা ডাকাতি করেছেন।

—আমি ডাকাতি করেছি? অবিশ্বাস্য, একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আর্টিষ্ট কখনো ডাকাত হতে পারে? একটা মিথ্যা সন্দেহে আপনারা আমাকে অনর্থক হয়রাণ করবেন। শিল্পী কখনো লোকের বুকে ছুরি মারতে পারে না? তা পারলে বাংলার অসংখ্য শিল্পীকে আজ দৈন্যের মাঝে অনাহার-অর্ধাহারে, কাটাতে হতো না। ডাকাতি করতে জানলে আজ আমরা ব্যবসাদার হতাম, শিল্পী হয়ে না খেয়ে মরতে বসতাম না।

—ওসব বক্তৃতা রেখে এখন চলুন দেখি, আপনার বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলো সব সার্চ করে আসি।

—বেশ চলুন। আপনারা যখন ধরেছেন, সহজে তো ছাড়বেন না।

আর্টিষ্ট গজগজ করতে করতে পুলিশের লোকজনদের নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

বাড়ীতে একটি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই।

সার্চ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। তবে দেখার মতো জিনিষ ছিল: নামকরা শিল্পীদের আঁকা অসংখ্য ভাল ভাল বাঁধানো ছবি।

ইনেস্পেক্টার ডেভিডকে বললো—লোকটাকে খাঁটি আর্টিষ্ট বলেই তো মনে হচ্ছে, একে থানা' পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি মানহানির মামলা করে?

—আমার দায়িত্বে আপনি ওকে গ্রেপ্তার করুন, মামলা যদি হয় আমি বুঝবো।

—বেশ, কিন্তু আপনার বাড়ী ভুল হয়নি তো? রাত্রির অন্ধকারে দেখেছেন?

—না, বাড়ী আমার ভুল হয় নি। তাছাড়া ওকে যে আমি চিনি। ও নিজেকে আর্টিষ্ট বলুক আর যাই বলুক, ও যে সরোজ সে সম্পর্কে আমার চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।

—বেশ!

ডেভিডের দায়িত্বে ইনেসপেক্টার আর্টিষ্ট রবি দত্তকে গ্রেপ্তার করলো।

সেই দিনই বিকালের কথা—

কাশীপুর থানার হাজত ঘরে আর্টিষ্ট রবি দত্ত তখন চুপ করে বসে ছিল। বাড়ীর চাকরটা একটা টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এসে দারোগাবাবুর কাছ থেকে অনুমতি চাইল—কিছু খাবার এনেছি দাদাবাবুর জন্য, আপনি যদি অনুমতি করেন—

দারোগাবাবু বললেন,—কি আছে দেখি?

—গোটা দুয়েক ডিম, কিছু মোহনভোগ আর ক'খানা লুচি।

—দেখি, এদিকে নিয়ে এসো।

দারোগাবাবু টিফিন-কেরিয়ারটি খুলে একবার দেখে নিলেন। চাকরটি মিথ্যা বলে নি, হালুয়া, লুচি এবং ডিম ছাড়া আর কিছুই নেই। একজন আর্দালীকে ডেকে বললেন—এই, লে যাও হাজতমে, আর্টিষ্ট বাবুকে পাশ।

আর্দালী টিফিন-কেরিয়ারটী রবি দত্তকে পেঁছে দিয়ে এলো।

খাবার পেয়ে আর্টিষ্ট সানন্দে খেতে বসে গেল। কয়েকখানা লুচি খাবার পর একখানা লুচি ছিঁড়তেই, তার ভিতর থেকে একখানি কাগজ বাহির হলো। কাগজখানি বাহির করে আর্টিষ্ট দেখলো—একখানি চিঠি। তখনই আর্টিষ্ট চিঠিখানি পড়ে ফেললো—তিনটি লাইন মাত্র চিঠিতে লেখা আছে:

সন্ধ্যাবেলার কালো বাস
সামনের দিকে ডাইনের কোণ
টিলা তক্তার নীচেই পথ

আর্টিষ্ট একবার পড়লো, দু'বার পড়লো, তিনবার পড়লো, একটু হাসলো। সহসা আর্দালীর জুতার শব্দ পেয়ে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে আবার খেতে শুরু করলো।

সেইদিনই আর্টিস্ট রবি দত্তকে লালবাজারে চালান দেবার ব্যবস্থা হলো।

সন্ধ্যাবেলা লালবাজারের কালো রঙের চারিপাশ-ঢাকা প্রকাণ্ড বাসটি আর্টিষ্টকে তুলে নিয়ে যখন লালবাজারের দিকে আসছিল, পথে শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে কয়েকখানি গরুর গাড়ী সামনে পড়ে যাওয়ায়, জেলের গাড়ীর চলা বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ীটি থেমে যেতেই ভিতরে একটি লোক উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সে

যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বসবার আসনের তক্তাখানা ধরে একটু টানাটানি করতেই তক্তাখানা ফস করে খুলে গেল, সেই ফাঁক দিয়ে নীচের পথ দেখতে পাওয়া গেল। লোকটি সেই ফাঁক দিয়ে তখনই নীচের পথে টুপ্ করে নেমে গেল। চারিদিক ঘেরা জেলের গাড়ীর ভিতরের অন্ধকারের মধ্যে একটি কয়েদী যে এত সহজে সরে পড়লো ও-পাশের এক কোণে বসে-থাকা পাহারাওলাটি তার কিছুই টের পেলে না।

আর্টিষ্ট রবি দত্ত পাশের এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অর্ডার করলো—রুটি আর মাংস।

আর্টিষ্ট নিশ্চিন্ত মনে রুটি আর মাংস খেতে সুরু করেছে, ইতিমধ্যে পথের ওপাশে জেলের বাসখানি ঘিরে গোলযোগ সুরু হলো। আর্টিষ্টের পাশে যে কয়েদীটি বসেছিল, রবিদত্ত বাহির হয়ে যাবার পরে সে যখন বাহির হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় বাহিরের পথের বৈদ্যুতিক আলোর যে অস্পষ্ট আভাষটুকু গাড়ীর ভিতরে এসে পড়েছিল, সেই আলোর আভাষে ভিতরে উপবিষ্ট একটা পুলিশের কেমন যেন সন্দেহ হয়। সে উঠে এসে লোকটিকে ধরে ফেলে। তখনই জানাজানি হয়ে যায় যে আরেকজন তার আগেই সরে পড়েছে।

পুলিশটি এসে জানালো—সা'ব, এক আদমী ভাগ্ গিয়া।

—ভাগ্ গিয়া!

ডেভিড ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল, তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। কোন্ পথ দিয়ে সরোজ পালিয়েছে দেখতে এসে বৈদ্যুতিক মশালের আলোয় ভাঙা তক্তাখানির পাশে একটুকরো কাগজ সে কুড়িয়ে পেল, তাতে লেখা :

সরোজকে বন্দী করে চালান দেবার মতো
জেলের গাড়ী আজও তৈরী হয়নি

লেখাটি পড়ে ডেভিড রেগে আগুন হয়ে গেল। পাহারাওলাটিকে বললো—তুমকো খেয়াল নেহি থা? গাঁজা পিয়া?

—আঁধারমে কুছ্ ঠাহর নেহি হুয়া সা'ব।

—উয়ে বাৎ ম্যায় শুন্‌নে নেহি মাংতা, যাঁহাসে মিলে মেরে আদ্‌মি লাও!

জেল-ভ্যান ঘিরে কৌতূহলী জনতা মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। হৈচৈ সুরু হলো।

বাড়ী ফিরে ডেভিড সনিকে বলছে—দেখ, তোমায় এখনি একটা কাজ করতে হবে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া সে কাজ আর কেউ করতে পারবে না। পুলিশের উপর আমার বিশ্বাস কম। তারা মাইনে-করা লোক, কাজ করে পয়সার খাতিরে। আর ক্ষতি হয়েছে আমাদের, আমরা কাজ করবো প্রাণের টানে। সেইজন্যই পুলিশের চেয়ে আমাদের সফল হবার সম্ভাবনা বেশী।

—বেশ, বলুন কি করতে হবে ?

—এখনি তোমায় একবার বেরুতে হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে সব ক'টি বাড়ীর ওপর তোমায় নজর রাখতে হবে। ওইখানেই কোন একটি হোটেলে কি বাড়ীতে সরোজ লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। কখন্ কোন ফাঁকে সে সেখান থেকে সরে পড়বে। সেই সময়েই তাকে ধরতে হবে। তুমি ছাড়া সরোজকে চট্ করে আর কেউ চিনতে পারবে না, তাই তোমারই ওপর এই কাজের ভার দিচ্ছি। কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত আমি এক মিনিট বিশ্রাম পাইনি, এখন একবার স্নান করে আমি খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিই, নাহলে আমি আর পারছি না।

—তার জন্য কি, আমি এখনি যাচ্ছি—এ তো সামান্য কাজ।

—এই তো তোমার ভুল, কাজটি মোটেই সামান্য নয়। শত্রুর সামনে যখন তুমি যাচ্ছ, তখন যথেষ্ট সাবধান হয়েই তোমার যাওয়া উচিত।

—সে আমি ঠিক থাকবো'খন।

—যত সহজে কথাটা বললে, কাজে অত সহজ নয়। এই বাঙালী জাতটা সব কাজেই 'ঠিক করছি', 'ঠিক করবো' করে, বেশী কাজই বে-ঠিক করে বসে। মনে রেখো যারা প্রিজন্-ভ্যান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের দলটি মোটেই সহজ নয়।

—বুঝেছি বুঝেছি, আপনাকে আর অত করে সাবধান করে দিতে হবে না—বলে হাসতে হাসতে সনি বাহির হয়ে গেল।

শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মুখে একটি দোকানের সামনে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। ফুটপাতে চলাফেরা মুস্কিল হয়ে উঠেছে। লোকগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর গান শুনছে। বেতারে তখন গান হচ্ছে :

—আমার দেশের মাটী
ও ভাই, সোণার চেয়েও খাঁটী
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে
আসে কত জাতি।
ও ভাই, এই দেশেরই ধুলোয় পড়ি
মাণিক যায়রে গড়াগড়ি
ও ভাই, বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো
এই দেশেরই জীবন কাঠি।
এই মাটী এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
ও ভাই, সভ্য হলো নিখিল-ভুবন
দিব্য পরিপাটি।
—আমার দেশের মাটি।

সনি সেইখানেই দাঁড়ালো কিছুক্ষণ, যেন কতই গান শুনছে কিন্তু আসলে তার দৃষ্টি ঘুরছিল চারিপাশে। চারিদিকের বাড়ী ও দোকানগুলি সে চঞ্চল দৃষ্টিতে বারবার তন্ন তন্ন করে দেখছিল। কানের পাশে বেতারের সুর ঝঙ্কার তুলে চলেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নার্স যেমন স্থিরভাবে প্রলাপ শুনে যায়, কোন কথাই কাণের ভিতর দিয়ে তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না, সনিও যেন তেমনিভাবেই বেতারের প্রলাপ শুনছিল। সহসা গানের কয়েকটি লাইন তার কানে এসে লাগলো ঃ

এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
ও ভাই, সভ্য হলো নিখিল-ভুবন
দিব্য পরিপাটী—
—আমার দেশের মাটী !

সনি ধীরভাবে শুনলো। খানিকক্ষণ সে সরোজের কথা, বিনয়বাবুর কথা, সব ভুলে গেল। গানের প্রত্যেকটি লাইন তাকে মুগ্ধ করলো। এমন মধুর গান সে কখনও শোনেনি।

গানের কথা ভাবতে ভাবতে বাঙালী জাতির উপর সনির অনুকম্পা হলো। এই জাতিটি শত অসুবিধা শত বাধা ঠেলে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনে আজও মাথা তুলে সকল সভ্যজাতির সংগে সমতলে পা ফেলে চলেছে। এত দুঃখ ও দারিদ্র্য না থাকলে বাঙালীর সাধনায় হিন্দু সভ্যতা আজ হয়তো জগতের সকল জাতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত !

সহসা পাশের একটি বাড়ী থেকে বাহির হয়ে একটি লোক গট্‌গট্‌ করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। লোকটির মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সনি চমকে উঠলো —সে মুখ সরোজের !

সরোজ ! সনির শরীরে যেন ইলেকট্রিকের শক্‌ লাগলো, সেই মুহূর্তেই সে সরোজের পিছু নিল।

তারপর সুরু হল লুকোচুরী খেলা।

সরোজ বোধ হয় টের পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক করে কতবার পথের ভীড়ে সে মিশে যাবার চেষ্টা করলো, সরু গলির এ-মুখ দিয়ে ঢুকে অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ ফুটপাত থেকে ও দিকের ফুটপাতে গেল, কিন্তু কিছুতেই যখন সনির তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলো না, তখন এক-খানি ছুটন্ত বাস দেখতে পেয়ে সে ছুটে গেল বাস ধরার জন্য।

তাড়াতাড়ি বাসখানি ধরতে গিয়ে সরোজ কোন দিকে তাকায়নি। বাসের এ পাশ দিয়ে সমান্তরালে একখানি মোটর ছুটে আসছিল, বাস ধরতে গিয়ে সরোজ সেই মোটরখানির সামনে গিয়ে পড়লো। তখনই ব্রেক কষলেও বেগবান যান্ত্রিক চাকা কয়েক পাক ঘুরে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল। সরোজকে ধাক্কা মেরে মোটরখানি থামলো। ধাক্কা খেয়ে বেচারা ছিট্‌কে পড়লো, পড়েই অজ্ঞান।

মহানগরীর রাজপথ। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল।

জনতার মধ্যে একটি লোক সরোজকে দেখে চমকে উঠলো, বললো—ইস্‌ এ যে আমার বন্ধু।

সকলের দৃষ্টি পড়লো তার উপর।

ভীড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে লোকটি সরোজের পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—বিশেষ কোথাও চোট লেগেছে নাকি?

—না না, ধাক্কা লেগে ছিট্‌কে পড়েছেন ভীড়ের মধ্যে থেকে অনেকে একসঙ্গে জবাব দিল—ওই যে মোটর…

মোটরখানি দাঁড়িয়েছিল, লোকটি তার নম্বর টুকে নিল। তারপর বললো—আপনারা কেউ দয়া করে আমায় একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে দেবেন?—হাসপাতালে নিয়ে যাব।

চারিপাশে জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ট্যাক্‌সি করে, তার মধ্যে সরোজকে তুলে নিয়ে মোটর ছেড়ে দিতে বোধ হয় দুমিনিটও লাগলো না।

সনি তখন ভীড়ের বাহিরে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সনির মুখে সব শুনে ডেভিড তখনই ফোন ধরলো—ক্যাল্‌কাটা মেডিক্যাল কলেজ!

—ইয়েস্‌।

—শ্যামবাজারের মোড়ে একটু আগেই যে একটা মোটর এক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, সেখান থেকে ওখানে কেউ ভর্তি হয়েছে?

—না।

—আপনি ঠিক জানেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানবো না তো আর কে জানবে বলুন? তবে আপনি আর-জি-করে একবার খোঁজ করে দেখুন, আমি এখান থেকে কনেক্‌শন করে দিচ্ছি।

আর-জি-কর হাসপাতাল থেকেও সেই একই উত্তর।

টেলিফোন ছেড়ে ডেভিড হতাশ ভাবে চেয়ারে বসে পড়লো, বললো—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—হাসপাতালের ধাপ্‌পা দিয়ে দলের কোন লোক তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

—তাতে তাদের লাভ?

—লাভ কিছুই নেই, তবে লোকসান থেকে বেঁচে গেল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাছাড়া পুলিশের নজরে পড়ারও ভয় আছে।

—কিন্তু মোটরের ধাক্কা লেগে সরোজদা যে অজ্ঞান হয়ে গেল তার চিকিৎসার কি হবে?

—কেন, হাসপাতাল ছাড়া কি চিকিৎসা হয় না?

ব্যাপারটা আলোচনা করে ডেভিড ও সনির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

ধীরে ধীরে সরোজ চোখ মেললো।

একখানি সাজানো-গোছানো সাধারণ ঘর। দেওয়ালে ক'খানা পুরাণো ছবি টাঙ্গানো। ছবিগুলি নামকরা বিদেশী চিত্রকরদের বিখ্যাত ছবির নকল। ঘরের ওদিকের কোণে একটি লম্বা টিপয়ের উপর একটি ফুলদানি, তাতে কয়েকটি সূর্যমুখী ফুল এমন ভাবে সাজানো রয়েছে, যে সহসা দেখলে কাগজের ফুল বলে মনেই হয় না—এই ফুলগুলির পানে চেয়েই সরোজ প্রথম চোখ মেললো।

চোখ মেলেই সরোজ তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজলো। জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে ফুলগুলির উপর পড়েছে। তীব্র রঙীন কাগজের পাপড়িগুলির উপর রোদ প্রতিফলিত হয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই সরোজের চোখ ঝলসে গেল। যেমন সহসা সে চোখ খুলেছিল তেমনই সহসা সে চোখ বুঁজলো।

ক' সেকেণ্ড পরে আবার সরোজ চোখ চাইল।

ক্রমশঃ সেই রোদের তীব্রতা সরোজের চোখে সহ্য হয়ে গেল। সরোজ বিছানার উপরে উঠে বসলো। সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাহিরের পানে চাইল : শুধু গাছের সারি। সবুজ পাতার পর পাতা। সেই ঘন পাতা আর ডালপালার ভীড়ের ফাঁকে চক্‌চকে খানিকটা জলও চোখে পড়ে, তার বেশী আর দৃষ্টি চলে না।

সরোজ খাট হতে নামলো। মাটিতে পা দেওয়ামাত্র তার মাথা ঘুরে গেল। খাটের একটা বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিল। তারপর মাথাটা অত্যন্ত ভারবোধ হওয়ায় হাত দিয়ে দেখে, প্রকাণ্ড এক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ব্যাণ্ডেজ? ব্যাণ্ডেজ কেন? কি হয়েছে? সরোজ ধীরে ধীরে দরজার দিকে গেল। দরজা বাহির থেকে বন্ধ। সরোজ দুম্‌ দুম্‌ করে দরজায় দুটো চাপড় মারলো। সেই দুটো চাপড় মারার পরিশ্রমে তখনই তার মাথার মধ্যে চন্‌চন করে উঠলো। তাড়াতাড়ি যেমন রকমে ফিরে এসে সে বিছানার উপর বসে পড়লো।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হলো।

দরজা খুলে যিনি ভিতরে এলেন সরোজ তাকে কোন দিন দেখেনি।

লোকটি ঘরে ঢুকেই হেসে জিজ্ঞাসা করলো—আমায় ডাকছিলেন কেন? এখন কেমন আছেন? মাথায় কোন যাতনা নেই তো?

—যাতনা? না, যাতনা কিছুই নেই। কিন্তু আমার মাথায় কি হয়েছে বলুন তো?

—কেন, আপনার কিছু মনে পড়ে না?

—না।

—সে অনেক কথা, বলবো এখন পরে। এখন আপনি বড় দুর্বল।

—তা হোক, আপনি বলুন। আমি এত দুর্বল এখনও হইনি যে আপনার কথা শুনে হার্টফেল করবো।

—না, হার্টফেল করার কথা নয়, অন্য কারণও আছে।

—কি কারণটা বলুনই-না শুনি ?

—নেহাৎ যখন শুনতে চান, তখন বলি। আপনার দাদা আপনাকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি বারণ করে দিয়েছেন কোন কথা বলতে।

—আমার দাদা ?

সরোজ বিস্মিত হলো। তার দাদা যে কেউ আছে তা সে কোন দিন জানে না। এই লোকটি কাকে তার দাদা বলছে, সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

লোকটি হাসলো, হেসে বললো—হ্যাঁ, আপনার দাদা বিনয় রায়।

লোকটি হাসে চমৎকার। হাসতে হাসতে পিঠের কুঁজটি দুলে দুলে ওঠে, সারা দেহের বাহার খুলে যায়, বলে—আপনার দাদাকে আপনি চেনেন না ? হিঃ হিঃ হিঃ !

সরোজের মনে হলো লোকটির গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে তার ওই কদাকার দাঁতগুলি সব ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু মনে যা ভাবা যায়, সব সময় কাজে তা করা উচিৎ নয় বলেই সরোজ সংযত কণ্ঠে বললো—না, আমার দাদাকে আমি চিনি না। তিনি কে ? কেন আমাকে এখানে এনে রেখেছেন ?

—তিনি একজন ডাক্তার, এটা তাঁর বাগানবাড়ী, জায়গার নামটা আপনাকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন।

—তার মানে ? আমায় তাহলে এখানে 'গুম্' করে রাখা হয়েছে ?

—আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আপনার ভালর জন্যই এখানে কিছুদিন আপনার লুকিয়ে থাকা দরকার বলেই তিনি এখানে আপনাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

কেন- বলুন তো ?

—সেটা আমি ঠিক জানি না, বড়বাবু সে কথা তো আমায় কিছু বলেন নি। যাক্, আমি এখন যাই, আপনার কোন দরকার হলেই আমায় ডাকবেন, --বলে লোকটি বেরিয়ে গেল, যাবার সময় দরজাটা বাহির হতে শিকল তুলে বন্ধ করে যেতে ভুললো না।

সরোজের মাথায় তখন চিন্তার ঝড় উঠেছে। তার দাদা এই বিনয় রায় লোকটি কে ? এমনি ভাবে তাকে আট্কে রাখার উদ্দেশ্য কি ? সরোজের দাদা হবারই বা তার এত সখ্ কেন ?

কিন্তু ভেবে ভেবে কোন কথারই জবাব মিললো না।

বন্দী পাখী খাঁচার অল্প পরিধির মধ্যে ছট্ফট্ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অসীম আকাশের নীলিমা, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, শ্যামল বনানীর মায়া, বন্দী পাখীর মনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মুক্তির সন্ধানে উদাস দৃষ্টি মেলে খাঁচার দরজার পানে পাখী তাকিয়ে থাকে-- যদি খাঁচার দরজাটি একবার খুলে যায়, তা হলে ওই আকাশের বুকে মাঠের শেষে, বনানীর মাথার উপর দিয়ে পাখা মেলে

একবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হয়ে পড়ে। মানুষের মিষ্টি ব্যবহার, ভাল খাবারের লোভ, কিছুই আর বন্দী পাখীর মনকে পিছনের পানে ধরে রাখতে পারে না। তা না পারলেও, খাঁচার দরজাটি দৈবাৎ খোলা পাবার সৌভাগ্য সকল পাখীর জীবনে আসে না।

সরোজের অবস্থাও এই খাঁচার পাখীর মত।

এই বাড়ীর এই দেওয়ালের বেষ্টনী পার হয়ে পথে বাহির হবার আকাঙ্ক্ষায় মন উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কোন দিন সে নীচের তলায় নামতে পারে নি, তা বাড়ীর বাহিরে যাওয়া তো অনেক দূরের কথা।

বন্দী সরোজের ঘরের মধ্যেই দিন কাটে, রাত্রি কাটে। ঘরের সামনে একটি কোকিল মাঝে মাঝে একটানা চীৎকার করে ডাকতে থাকে—কু-উ! কু-উ!! কুউ-উ!!! পোষ-মানানো বন-ছাড়া বন্দী কোকিলের সে কান্না সরোজের মনকেও বিষণ্ণ করে তোলে। শুয়ে শুয়ে ভাবে কি করে মুক্তি মিলবে? তার এই বন্দীনিবাসের সন্ধান ডোভিড্, বিনয়বাবু ও সনি কি করেই বা জানবে?

সহসা সেদিন কোকিলের ডাক শুনে একটি কথা সরোজের মনে পড়লো: যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। পায়রার পায় ছোট ছোট চিঠি বেঁধে সৈনিকেরা ছেড়ে দিয়েছে। শত বন্দুকের গুলিকে ফাঁকি দিয়ে পায়রা ঠিক চিঠি এনে দিয়েছে যেখানে খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু এ তো পায়রা নয়, এ যে কোকিল। তা হোক্, পাখী তো বটে।

সেই দিন থেকে সরোজ কোকিলটিকে আদর করতে সুরু করলো। যখন-তখন খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যা পায় আদর করে পাখীটিকে খেতে দেয়। কুঁজো লোকটী দেখে, মুখে কিছুই বলে না। আড়ালে উপহাস করে মুখ ভ্যাংচায়।

একদিন কুঁজোকে সরোজ বললো—দাদা আমায় আটকে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন কি?

—কেন, কি খাবেন বলুন?

—ভাল বিস্কুট খাওয়াতে পারেন, আর চা?

—নিশ্চয়। আজই আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে চা-বিস্কুট আনবার ব্যবস্থা করছি।

—তবেই আমি খেয়েছি!

—তার মানে? আজ বিকালেই যদি আমি আপনাকে চা-বিস্কুট না খাওয়াতে পারি, তো কি বলেছি!

সত্যই সেদিন বিকালে এক টিন বিস্কুট এনে সে সরোজের হাতে দিলে। চা-ও সে এনেছিল। সরোজ এ-ই চাইছিল। তখনই বিস্কুটের টিন খুললো। চা বিস্কুটের দস্তুরমত ভোজ লেগে গেল। সরোজের মুখে হাসি ফুটলো।

সরোজের মুখে হাসি ফুটলো চা-বিস্কুট খেয়ে নয়, বিস্কুটের টিনের মধ্যে কাগজ পেয়ে। পেন্সিল কি কলম দিয়ে তো সে-কাগজে লেখা যায় না, আর

পেন্সিল ও কলম সরোজের কাছে ছিলও না। আগে থেকে একটি আল্‌পিন্‌ সে যোগাড় করে রেখেছিল। পরদিন দুপুরে অবসর বুঝে বিস্কুটের টিনের এক টুকরো সাদা কাগজে আল্‌পিন্‌ দিয়ে সারি সারি ছিদ্র করতে বসলো।

কিছুক্ষণ বাদে কাগজের টুক্‌রোটি চোখের সামনে আলোয় তুলে ধরতেই সারি সারি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কতকগুলি অক্ষর দেখা গেল – কয়েক লাইন ইংরাজীতে লেখা ঃ

Please have pity for an unfortunate man to send this news to Surgeant David, Lalbazar, Calcutta. I am a prisoner in a two-storied red-brick house surrounded by a garden and a wall. A pond just outside the wall. Do not know in what part of the country I am.—Saroj.

[হতভাগ্য পত্রলেখকের প্রতি দয়া করে এই চিঠিখানি কলিকাতার লালবাজারের সার্জেন্ট ডেভিডের কাছে পৌঁছে দেবেন। আমি প্রাচীরবেষ্টিত একটি দোতলা বাগান-বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। লালরঙের ইঁট-বের-করা বাড়ী। পাঁচিলের বাইরের একটি পুকুর আছে। কোথায়, কোন অঞ্চলে রয়েছি,—কিছুই জানি না। ইতি—সরোজ।]

চিঠিখানি সরোজ ইংরাজীতে লিখলো, কেননা অবাঙালীর হাতে পড়লেও মারা যাবে না।

লেখা শেষ করে কাগজখানিকে ভাঁজ করে সরোজ যতটা পারলো ছোট করে

ফেল্‌লো। তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে কয়েকটা সুতা নিয়ে চিঠিখানি বেঁধে পকেটে রাখলো। . . .

সেই দিন থেকে পাখীটীকে আদর করার ছলে সরোজ শুধু সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

একদিন সুবিধা পেয়ে খাঁচা থেকে কোকিলটাকে বাহির করে সরোজ সেটীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো। তারপর তার এক পায়ে চিঠিখানি বেঁধে জানালা দিয়ে পাখীটীকে উড়িয়ে দিল। শৃঙ্খলিত পাখী সহসা মুক্তি পেয়ে আনন্দের উল্লাসে সুনীল আকাশের বুকে ডানা মেলে কোথায় উড়ে গেল. পায়ে-বাঁধা চিঠির অস্তিত্ব সে ভুলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় সরোজ চেয়ে রইল ঃ সেই কালো কোকিলটী দুপুরের নীল আকাশের কোলে মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সরোজ জানালার কাছ হতে ফিরে এসে নিজের বিছানার উপর বসে পড়লো। ওই পাখীটার মতো কবে সে মুক্তি পাবে কে জানে !

কলিকাতা হতে কয়েক মাইল দূরে বরাহনগরের এক নির্জন পল্লীতে একটি বাগানের এক গাছের গুঁড়ির উপর হেলান দিয়ে একটি যুবক গঙ্গার পানে তাকিয়ে বসেছিল। যুবকটী বসে বসে গঙ্গার পানে চেয়ে শিস্ দিচ্ছিল··· ফিফিফি, ফিফিফি—। তার শিশ্ দেওয়ার সঙ্গে তাল রেখে নদীর জলও যেন তটে এসে ঘা খাচ্ছিল—ছল্-ছল্, ছলাৎ-ছল—।

যুবকটী বসে বসে দেখতে থাকে, নদীর জল যেখানে ওপাশের বড় বড় গাছ-গুলির কাছে গিয়ে মিশেছে। গাছগুলির আশেপাশে মাঝে মাঝে এক একখানি ছোট-বড় বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে একপাশে কারখানার চিমনীর ধোঁয়ায় নীল আকাশের খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে। তার পিছনে নীল আকাশ কোথায় মাটির কোলে মিশেছে তা আর চোখেই পড়ে না। চোখে পড়ে চিক্‌মিকে নদীর জল রোদের আলোয় নেচে উঠেছে। বাতাসে পাল ফুলিয়ে হেলে-দুলে ছবির মত নৌকাগুলি ভেসে চলেছে। একখানি সজীব ছবি যেন। বসে বসে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। সহরের গোলমাল মোটরের হর্ণ, গরুর গাড়ীর চাকার কচ্ কচ্ শব্দ, দমকলের ঘণ্টা, এখানকার বাতাস কাঁপায় না, মনকে চকিত করে তোলে না এখানকার শান্তি মনের উপর যেন স্নেহের পরশ দেয়। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে কখন যুবকটীর শিস্ থেমে গেল, তার কণ্ঠ খুলে গেল, সে গান ধরলো··

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে,
মাগো, আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
নয়ন মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
সেই আলোতে নয়ন রেখে মুদবো অবশেষে।
সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে—

ছেলেটী গাইতে জানে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তার গান গাওয়া চললো না। সহসা মাথার উপরে গাছের শাখা হতে সুতায় বাঁধা এক টুকরা কাগজ তার সামনে এসে পড়লো। সুতা-জড়ানো কাগজ। কৌতূহলী হয়ে ছেলেটী তা তুলে নিল। সুতা খুলে দেখলো একটুকরো সাদা তৈলাক্ত কাগজে অসংখ্য ফুটো। ফুটোগুলি দূর হতে কেমন যেন অক্ষর বলে মনে হয়। ছেলেটী কাগজখানি চোখের সামনে আলোয় তুলে ধরলো,—ফুটোগুলির ভিতর দিয়ে আলো এসে সত্যই কতকগুলি অক্ষর ফুটে উঠলো। একটির পর একটি অক্ষর পড়ে ছেলেটি সবটা পড়ে ফেললো—

Please have pity for an unfortunate man to send this news to Surgeant David, Lalbazar, Calcutta. I am a prisoner in a two-storied, red-brick house surrounded by a garden and a wall. A pond just outside the wall. Do not know in what part of the country I am.—Saroj.

একবার পড়লো, দু'বার পড়লো। ভাল করে তিনবার পড়ে যুবকটি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর আনমনা ভাবে উঠে পথ চলতে সুরু করলো। মুখে আবার তার শিসের রেশ—ফিফিফি—ফিফি—ফি!

খানিকটা পথ এসে সে থামলো। সেখানে দু'পাশের ক্ষেতের সীমা শেষ হয়ে এক একখানি বাড়ী মাথা তুলেছে। পরপর ক'খানি বাড়ী পার হয়ে একটি বাড়ীর সামনে এসে সে দাঁড়ালো। সামনের বড় একটি পুকুরের উপর বাড়ীখানি ছবির মত দেখাচ্ছে। বাড়ীটির পানে তাকালে কেউ সেই বাড়ীতে বাস করে বলে মনেই হয় না, জানালা দরজা সব বন্ধ। সারা বাড়ীখানি ঘিরে কেমন যেন একটা জনহীন থমথমে ভাব।

বাড়ীখানির পানে তীক্ষ্দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে যুবকের মুখে হাসি খেলে গেল। বাড়ীর ফটকের সামনে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়তে সুরু করে দিল।

অনেকক্ষণ কড়া নেড়েও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—জানি সাড়া পাওয়া যাবে না—নিজের মনেই কথাগুলি বলে কড়ার উপর পা দিয়ে সে ফটকের উপর উঠে দাঁড়ালো, তারপর ভিতরে কেউ নেই দেখে পাকা ব্যায়ামীর কায়দায় ফটক ডিঙ্গিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো।

ভিতরে বাগান পার হয়ে বরাবর বাড়ীর দরজার গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—কে আছেন?

জনহীন ঘুমন্ত পুরীর দরজা সহসা ভিতর হতে খুলে গেল। যে লোকটি দরজা খুলে বাহিরে এলো, যুবকের মুখের পানে তাকিয়ে সে খানিকক্ষণ থ' হয়ে গেল।

তার ভাব দেখে যুবকটি হেসে উঠলো, বললো—চিনতে পেরেছেন তাহলে?

—আ···হ্যাঁ...তুমি...আপনি...—ঠিক করে গুছিয়ে কথা বলতে লোকটির খানিকক্ষণ সময় লাগলো।

যুবক বললো—হ্যাঁ, আমিই! আর্টিষ্ট রবি দত্ত—তাই না?

—অ...হ্যাঁ...

—বলি, সরোজকে এখানে ক'দিন আটকে রাখা হয়েছে ?

—অ্যাঁ, সরোজ—সরোজ কে ?

—আমায় লুকোবার চেষ্টা মিছে, আমি সব জানি—এখনি পুলিশ নিয়ে আসবো।

—পুলিশ ? আমার বাড়ীতে আপনি পুলিশ নিয়ে আসবেন ? ভদ্রলোকের বাড়ীতে......

—আরে তুমি আবার ভদ্রলোক কবে হলে হে ?—রবির মুখে হাসি খেলে গেল।

—কী, কী ! ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে অপমান, বেরিয়ে যাও,—শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও—বলতে চলতে লোকটি এমনভাবে রবিকে তাড়া করে এলো যে সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না দেখে যুবকটি আত্মরক্ষা করার জন্য পিছিয়ে এলো।

লোকটি চীৎকার করে উঠলো—ফের যদি তোমায় এই বাড়ীর সীমানার মধ্যে দেখি, তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, দেখে নেব ?

—তোমার ডাক্তার সর্দারই কিছু করতে পারলে না, তা তুমি ! তোমাদের সর্দারকে বলো যে, সয়তানকে শায়েস্তা করতে আর্টিষ্ট রবি দত্ত জানে, বুঝলে ?

যার উদ্দেশে কথাগুলি বলা হলো সে ততক্ষণে হাতে একখানি ইঁট তুলে নিয়েছে। 'এই যে বোঝাচ্ছি'—বলে হাতের ইঁটখানি সে রবির দিকে ছুঁড়ে মারলো।

ইঁটখানি এসে গায়ে লাগবার আগেই রবি সাবধান হয়েছিল। ছুটে এসে ফটক পার হয়ে একেবারে বাহিরের পথে এসে দাঁড়ালো।

লোকটি ফটকের বাহিরে আর এলো না, ফটকের ভিতর হতে চীৎকার শোনা গেল—ফের ভিতরে এলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব !

রবি একটু হাসলো, মুখে কিছুই বললো না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ওদিকে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো।

গাছের আড়াল হতে রবি চোখ রেখেছিল বাড়ীটির পানে।

অনেকক্ষণ বাদে কোন-এক-সময় যে লোকটি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিল সে ফটক খুলে বাহির হয়ে এলো। ধোপ-দোস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় কোথায় যেন যাচ্ছে। রবি এতক্ষণ এইরূপই একটা-কিছুর প্রতীক্ষা করছিল। সে-ও উঠে দাঁড়ালো। লোকটি ফটকে একটা বড় তালা লাগিয়ে পথে অগ্রসর হলো। রবিও একটু তফাতে থেকে তার পিছু নিল।

লোকটি হাঁটতে পারে বেশ। তার পিছু পিছু চলতে চলতে রবির পায়ে ব্যথা ধরে গেল, তবু লোকটির চলার বিরাম নেই। বাসে কি গাড়ীতে একটি পয়সা দেবে না, মাইলের পর মাইল হেঁটেই চললো।

রবিও ছাড়বার পাত্র নয়।

হেঁটে সব পথ শেষ করে, লোকটি শেষে শ্যামবাজারের মোড়ে একটা বাড়ীতে এসে ঢুকলো। বাড়ীর দরজায় পালিশকরা পিতলের ফলকের উপর একটা নাম ঝক্‌ঝক্ করছিল :

ডক্‌টর বি, রায় এম-বি, ডি-টি-এম।

নামটা পড়ে রবি দত্তের মুখে হাসি ফুটলো।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলো, তারপর সেও বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো।

ডাক্তার বিনয় রায় এম-বি, ডি-টি-এম্।

দোতলার ঘরে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু 'টাই' বাঁধছিলেন, একটা লোক তার পিছনে এসে দাঁড়ালো, বললো,—গুড্ মর্নিং ডক্‌টর!

ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন, মুখ ফিরিয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকালেন, লোকটিকে চিনলেন। তাঁর মুখে একটা বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠলো। ভ্রূ দু'টী কুঁচকে তিনি গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি? তোমার কি চাই?

লোকটী হাসলো, বললো—কি চাই? এ জগতে সবচেয়ে যা বেশী দরকার, টাকা চাই,—টাকা!

—টাকা?

—হ্যাঁ, টাকা—বলে আগন্তুক হেসে সুর করে বললো—

Money, money, money!
চায় সকল প্রাণী।
Brighter than sunshine,
Sweeter than honey!

ডাক্তার এবার রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন—তুমি কি মনে কর তোমার জন্য আমি টাকার থলে নিয়ে বসে আছি, তুমি এসে বলবে 'টাকা চাই,' আর আমি তোমায় টাকা দেবো?

—কেন দেবেন না? আপনার সব কথা আমি যদি পুলিশে জানাই, তাহলে আপনার অবস্থাটা কি হবে জানেন তো?

—হ্যাঁ, তা আমি জানি, আর জানি বলেই তোমাকেও জানিয়ে দিচ্ছি যে তোমার ধাপ্পাবাজীতে আমি ভুলবো না। টাকা আমি বিলোতে বসিনি।

—ধাপ্পা নয়, আমি প্রমাণ করবো, প্রমাণ আমার হাতেই আছে।

—বেশ, প্রমাণ করো।

—প্রমাণ তো করবই। সরোজকে বোধ হয় আপনি এত শীগ্‌গির ভুলে যান নি? সেই সরোজ,—যাকে আপনি হিপ্‌নোটাইজ্ করে আর্টিষ্ট রবি দত্ত সাজিয়েছিলেন।

সরোজের নাম শুনে ডাক্তারের মুখ কালো হয়ে গেল। সহসা যেন কেউ তার মুখের উপর এক ঘা চাবুক মারলো। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে

নিয়ে শান্ত স্বরে বললেন—তোমার ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। কে সরোজ আমি চিনি না।

—এখন আপনি তাকে চিনবেন না, তা আমি জানি। কিন্তু যখন তাকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করে চল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই সরোজকে চিনতেন।

এই কথার পর নিজেকে সামলে রাখা ডাক্তারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লো। গলা চড়িয়ে বললেন—বেশ করেছি ডাকাতি করিয়েছি, তাতে তোমার কি? তোমায় আমি আর এক পয়সাও দেবো না। যাও, পুলিশে গিয়ে বলগে ওই সব কথা।

—শুধু বলাই নয়, প্রমাণ করবো। সরোজ এখন কোথায় আছে জানেন?—আমারই মুঠোর মধ্যে। জেলের গাড়ী থেকে পালাবার পর সরোজের আর কোন খবর আপনি জানেন? ওই সরোজকে দিয়েই আমি অনেক কিছু প্রমাণ করবো। হয় টাকা দিন, নাহলে আপনার ডাক্তারীর মুখোস আমি খুলে দেবো।

—টাকা?—তোমায় আমি আর এক পয়সাও দেবো না, ফের যদি তুমি কখনো আমার কাছে টাকা চাইতে আস, তাহলে তোমায় আমি কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

—কিন্তু আমি তো আর কুকুর নই, কুকুরকে মারলে ফাঁসী হয় না, কিন্তু আমায় মারলে আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে।

রহমৎ স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছিল, তাকে গুলি করবার ভয় দেখিয়েও যখন ডাক্তার তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারলো না, তখন সহসা স্বর নামিয়ে বললো—দেখ রহমৎ, তোমার সঙ্গে আমি একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে চাই। তুমি রোজ এসে টাকা চাইবে আর আমি টাকা দেবো, এ কখনো হতে পারে না। তোমায় আমি একেবারে যা-হোক কিছু টাকা দিয়ে একটা লেখা-পড়া করে নিতে চাই, তাতে তুমি রাজী আছ?

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনি কত টাকা দেবেন?

—পাঁচশো।

—অতো কমে হবে না।

—কিন্তু আমি তোমায় কোনোদিন পাঁচ হাজার টাকা দেবো না এ তুমি বেশ জানো।

—তবে কত দেবেন?

—বড় জোর এক হাজার?

—না, অত কম আমি নোব না, একটা মাঝামাঝি রফা করুন।

—বেশ. দু'হাজার!

—কিন্তু...

—না, এর উপর আর কোন কথা নেই। এখনই কোন বাইরের অচেনা-

অজানা রোগী এসে পড়বে, যদি দু'হাজার টাকা নিতে রাজী থাক তো ভেতরে চল—। ডাক্তার উঠলেন। রহমৎ-ও উঠলো।

বাড়ীর ভেতরে যেতে যেতে ডাক্তার বললেন—দেখ, তোমার হাতে সরোজ আছে, তা আমি জানি। তোমায় আমি সেইজন্যই টাকা দিচ্ছি। আজ এখন তোমায় দেব হাজার, আর সরোজকে আমার বাড়ীতে পেঁাছে দেবার পরে তুমি পাবে বাকী এক হাজার।

—অতো কমে আপনি কাজ হাসিল করতে চান ?

—দেখো, ওর বেশি তোমায় আর এক পয়সা দেব না। ইচ্ছা হয় ওই নিয়ে সরোজকে আমার কাছে দিয়ে যাও, আর তা যদি না পার তো চলে যাও, আমি তোমায় এক পয়সাও দেবো না।

—তা আপনি যখন বলছেন।

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে হাসি রহমতের চোখে পড়লে তার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠতো।

আর কোন কথা হলো না। কয়েকটি ঘর পার হয়ে ডাক্তার একটি ঘরে এসে ঢুকলো, একটি চেয়ার দেখিয়ে রহমৎকে বললো—বসো—।

রহমৎ বসলো।

রহমতের চেয়ারের সামনে একটি টেবিল। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললো—দেখ রহমৎ, তোমায় আমি এক হাজার টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমায় বলতে হবে আর্টিষ্ট রবি দত্ত কোথায় আছে।

—আর্টিষ্ট রবি দত্ত তো নয়, সে সরোজ।

—সরোজের কথা নয়, আমি আসল আর্টিষ্ট রবি দত্তের কথাই জিজ্ঞেস করছি।

—তার খবর তো আমি জানি না।

—নিশ্চয়ই জানো। তোমরা দু'জনে এক দিনে একসঙ্গে আমার বাগান-বাড়ী থেকে সরে পড়। তোমাদের দু'জনে ভারী ভাব। আর তুমি তার খবর জানো না ?

—বেশ, জানি তো জানি। কিন্তু আমি যা জানি তা-ই আপনাকে বলতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। আর রবি দত্তের কথা শুনে আপনার লাভ কি ?

—লাভ আমার আছে, আমি তার ভাই।

—ভাই! চমৎকার ভাই, ভাই হয়ে তাকে নিজের বাগানবাড়ীতে গুম করে রেখেছিলেন ?

—বেশ করেছিলাম, সে কৈফিয়ৎ তো আর আমি তোমায় দোব না। তুমি আমার কথার উত্তর দেবে কি না তাই বল ?

—দেখুন, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি। সত্যি কথা বলতে কি, রবি দত্তের কোন সন্ধান আমি জানি না। আপনি আমায় টাকা দেবেন তো দিন, না দেবেন তো বলুন, আমি চলে যাই।

—বটে, আমার বাড়ী থেকে অতো সহজেই তুমি চলে যাবে? এই বলে ডাক্তার হাসলো। সে তো হাসি নয়, ডাক্তারের মুখখানা ভীষণ ভয়াবহ হয়ে উঠলো। রহমৎ সে মুখের পানে চেয়ে ভয় পেল। কিন্তু সাবধান হবার অবসর সে পেলে না। যে চেয়ারখানিতে রহমৎ বসেছিল তার নীচের মেঝে

সহসা সরে গেল। সামনের টেবিলটির দিকে সে হাত বাড়ালো, কিন্তু টেবিলটি পর্যন্ত হাত পৌঁছাবার আগেই নীচের কালো অন্ধকারময় গর্তের মধ্যে সে নেমে গেল। পরমুহূর্তেই গর্তের মুখের তক্তাখানি আবার যথাস্থানে ফিরে এলো, নীচে রহমতের চীৎকার আর শোনা গেল না।

ঘরের আলোটি নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই হাসতে হাসতে ডাক্তার বিনয় রায় বাড়ীর বাহিরে মোটরে গিয়ে উঠলেন। বাড়ীর মধ্যে যে কাণ্ডটি করে এলেন তাঁর মুখের পানে তাকালে এখন আর সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

নিস্তব্ধ অন্ধকার বাড়ী থম্‌থম্ করছে।

কিন্তু অমন অমাবস্যার মত ঘুটঘুটে অন্ধকারেও একটি লোক স্বচ্ছন্দ গতিতে

বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার চলাফেরার ধরণ দেখলে মনে হয় এই বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরে সে যেন এর আগে অনেকবার ঘুরে গেছে।

অন্ধকারে এ-ঘর ও-ঘর বেড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদে লোকটি, রহমৎ যে ঘরের মেঝের নীচে পড়ে গিয়েছিল, সেই ঘরে এলো। দরজার পাশেই সুইচ্ ছিল, টিপে আলো জ্বাললো। তারপর টেবিলটার ওপাশে গিয়ে ফুলদানিটির পাশে একটি ছোট বোতাম ছিল, সেটি টিপে ধরলো। খুব বেশী সময় লাগলো না। মেঝের উপরকার কাঠের তক্তাখানি সহসা সরে গেল। লোকটি নীচের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কেউ নীচে আছেন?

ব্যাকুল কণ্ঠে জবাব এলো—আছি, আমি আছি।

—উপরে আস্তে চান?

—উঠবো কি করে?

—এই নিন্ এই চেয়ারখানা ধরুন। এটি নীচে রেখে এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলুন, আমি আপনার হাত ধরে তুলে নিচ্ছি—বলে উপর থেকে একখানি চেয়ার নামিয়ে দিল।

নীচের লোকটি সেই চেয়ারখানি নিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়ালো। তারপর উপর দিকে হাত তুলে দিতেই উপরের লোকটি তার হাত দু'খানি ধরে তাকে উপরে তুললো। এতো সহজে তুললো যে লোকটির দেহে যে যথেষ্ট শক্তি আছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

উপরে উঠে রহমৎ যাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো, তাতে নিজের চোখকে সে সহজে বিশ্বাস করতে পারলো না। তার সামনে দাঁড়িয়েছিল রবি দত্ত। রবি হেসে বললো—রহমৎ, চিনতে পার?

রহমৎ নিজেকে সামলে নিয়ে ডান হাতটি তাড়াতাড়ি কপালে ঠেকিয়ে বললো—সেলাম বাবু!

—মীরজাফর! মনে রেখো যার অন্নে প্রতিপালিত হয়েও টাকার লোভে যাকে তুমি মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে, সেই লোকই আজ তোমার জীবন বাঁচালো!

রহমতের মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, ছুটে সে ঘরের ভিতর থেকে বাহির হয়ে গেল।

বিনয়বাবু চোখ মেললেন।

জানালার নীল সার্সীগুলির মধ্য দিয়ে রোদ এসে ঘরখানিকে নীলাভ করে তুলেছে। চারিপাশের দেয়ালের চিত্র-বিচিত্র ঘরখানিকে মায়াপুরীর মায়ায় ঘিরেছে—ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। চুপ করে সেই নীলাভ ঘরখানির পানে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। বিনয়বাবুও কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন, দেখে দেখে তবে তিনি বুঝতে পারলেন এ স্বপ্ন নয়, সত্য! কিন্তু এ কোথায় এসেছেন? কেন এলেন? কি করে এলেন?

একটির পর একটি করে অসংখ্য প্রশ্ন বিনয়বাবুর মনে জাগলো, কিন্তু জবাব একটীরও মিললো না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কড়িকাঠের পানে, জানালার নীল সার্সীগুলির পানে চেয়ে কিছুক্ষণ পরে বিনয়বাবু উঠে বসলেন। উঠে বসার সময় দেহে সামান্য বেদনা বোধ করলেন। কিন্তু কেন বেদনা হয়েছে মনে করতে পারলেন না।

খাট থেকে বিনয়বাবু মাটীতে নামলেন। ইস্প্রিংয়ের খাট, নামামাত্রই ইস্প্রিংগুলি কচ্ কচ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে উঠলো। সেই নাচের তালে তালে বাহিরে কোথায় ঠুংঠুং করে কলিং-বেল্ বেজে উঠলো। তার পরেই বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে ভিতরে এলো একজন অচেনা লোক। ভিতরে ঢুকেই হেসে বললো—গুড্ মর্ণিং স্যার!

বিনয়বাবু প্রথমে অচেনা লোকটীর এই অভিবাদনের কোন জবাব দিতে পারলেন না।

লোকটি হেসে বললো—অবাক হয়ে গেছেন না? আমি একজন ডক্টর। আপনি এখন কেমন আছেন? দেখি আপনার হাতটা—ডাক্তার বিনয়বাবুর হাতটি টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন—যাক, আপনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি।

বিনয়বাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটলো, বললেন—আপনাকে তো চিনলাম না? এটি কার বাড়ী? আমিই বা এখানে এলাম কি করে?

—এ বাড়ী আমার, আমিই আপনাকে নিয়ে এসেছি। পথে মোটরে ধাক্কা লাগার ফলে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আমি আপনাকে পথ থেকে তুলে এনেছি।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আমার সঙ্গে আরেকজন লোক ছিল, তার খবর আপনি কিছু জানেন?

—ডেভিড তো?

—হ্যাঁ, আপনি তাকে জানলেন কেমন করে?

ডেভিডকে ভাল করেই জানি। আপনাদের দু'জনকেই আমার দরকার ছিল, তবে দু'জনকে তো পেলাম না। মিস্টার ডেভিড কোথায় সরে পড়লেন। তাই শুধু আপনাকেই নিয়ে এলাম। যাক, আপনাকে দিয়েও কাজ হবে।

—আপনার জন্য আমায় কিছু করতে হবে নাকি?

—নিশ্চয়।

—কি করতে হবে?

—ডাকাতি।

—ডাকাতি?

—হ্যাঁ, আমার ওই ব্যবসা। ওই জন্যই আমি সরোজকে ধরে এনেছিলাম, আপনাকেও ধরে এনেছি।

—সরোজ তাহলে আপনার কথাতেই আমার বাড়ীতে ডাকাতি করে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো আর সরোজ নই। আমি আপনার কথামত ডাকাতি করবো—একথা আপনাকে কে বল্লে?

—আমি বলছি। আপনি কেন ডাকাতি করবেন না? বাংলাদেশে একদল লোক আছে, যারা গরীবদের মুখের পানে তাকায় না, অন্নাভাব ও অজন্মার দিনেও নিরন্ন গরীবের বাড়ীঘর জিনিসপত্র নিলাম করে জমিদারীর খাজনা আদায় করে, আর সেই টাকায় বালিগঞ্জে লেকের ধারে মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, মুর্শিদাবাদী সিল্কের জামা পরে, বক্‌সে বসে বায়োস্কোপ দেখে, আর দুপুরবেলা ফ্যানের নীচে বসে ভুঁড়িতে হাত বুলোয়। ওই সব লোকদের বাড়ীতে আপনাকে ডাকাতি করতে হবে, তাদের টাকা লুঠে এনে আমরা নিরন্নদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো, তার ফলে বর্তমানে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তাতে কিছু সাহায্য হবে।

—তা হবে, কিন্তু সেজন্য লুঠ করতে হবে, আর আমি তাই করবো বলেই কি আপনি মনে করেন? যারা জমিদার, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার দাবী তাদের আছে সেই জন্যই তারা খাজনা আদায় করে। কিন্তু তাদের টাকা লুঠ করার দাবী কি আমাদের আছে?—তাতো নেই!

—কেন নেই, নিশ্চয়ই আছে। আইনের জোরে গরীবের যথাসর্বস্ব নীলাম করে তারা লুঠে নিচ্ছে, আমরাও পিস্তলের জোরে তাদের কবল থেকে সেই সব টাকা উদ্ধার করে আবার সেই গরীবদেরই বিলিয়ে দেবো—শোধ বোধ হয়ে যাবে।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু আমি যদি বলি ও-রকম অন্যায় ভাবে ডাকাতি করতে আমি পারবো না।

—কেন আপনি সেকথা বলবেন? আপনার দেশের অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষগুলির জন্য আপনার প্রাণ কাঁদে না? (কয়েকখানি খবরের কাগজ পকেট থেকে বাহির করে বিনয়বাবুর সামনে মেলে ধরে) এই দেখুন আনন্দবাজার অমৃতবাজার যুগান্তরের ফাইল, বাংলার পল্লী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কি ভয়াবহ খবর এরা প্রতিদিন ছাপছে। মা হয়ে ছেলেমেয়েদের বিক্রী করে দিচ্ছে একমুঠো অন্নের জন্য। এই সব বুভুক্ষুর মুখে এক এক মুঠো খাবার পোঁছে দেবার ইচ্ছা কি আপনার হয় না?

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—সে ইচ্ছা প্রত্যেকেরই হয়, কিন্তু তা বলে অন্যলোকের বাড়ী থেকে টাকা লুঠ করে এনে তাদের দিতে হবে এমন তো কোন কথা নেই? নিজের যা আছে সেই থেকে দিন।

—আপনার কথা খুবই সঙ্গত, কিন্তু অতো টাকা আমার হাতে নেই, আর তাড়াতাড়ি অতো টাকা যোগাড় করে দেবার মত আর কোন পথও নেই। পাঁচদিনে পাঁচটি জমিদারকে লুঠ করে পাঁচশো লোকের মুখে যদি আমি অন্ন জোগাতে পারি—তাই আমি চাই।

—কিন্তু আমি তা চাই না।

—আহা, এত বড় একটা ব্যাপারে এতো তাড়াতাড়ি একটা জবাব দেবেন না। এই দুর্ভিক্ষের খবরগুলো আগে পড়ে দেখুন, তারপর বিচার করে জবাব দেবেন। আমি কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো, এখনই যাই, গুড্ ইভ্নিং—বলে আর জবাবের অপেক্ষা না করে ডাক্তার বেরিয়ে গেল, বাইরে গিয়ে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিতে ভুললো না।

ডাক্তার নীচে নেমে এলো। নীচে এককোণে ছোট একখানি অন্ধকার ঘর। দিনের বেলাতেই ঘরখানি এমন অন্ধকার হয়ে থাকে যে, আলো না জ্বললে কিছু চোখেই পড়ে না, রাত্রির অন্ধকারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ডাক্তার কিন্তু আলো জ্বাললো না, স্বচ্ছন্দে গট্‌গট্ করে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকেও ডাক্তার আলো জ্বাললো না। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর হতে দু'বার ঘট্ ঘট্ করে শব্দ ভেসে এলো—কে যেন একটা দরজা খুলে সশব্দে বন্ধ করে দিল, তারপব আর কিছুই শোনা গেল না।

এখন কেউ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলে ডাক্তারকে সেখানে দেখতে পেত না। ডাক্তার সে-ঘরে তখন ছিল না। সেই ঘরের ভিতরেই আরেকটি ঘরে ডাক্তার তখন বসেছিল। বাহিরের লোকের সাধারণ দৃষ্টিতে সেটি একটি দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেই দোয়ালেরই একপাশের একটি ইস্‌প্রিং টিপে একখানি তক্তা সরিয়ে ফেললে ভিতরের এই ঘরখানি চোখে পড়বে। ভিতরে ঢুকলে মনে হবে কোন জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি। দেয়ালে ঝুলানো আছে কলিকাতা ও কলিকাতার আশেপাশের রাস্তার কয়েকখানি মানচিত্র, আর টেবিলের উপর পড়েছিল একখানা বড় মোটা খাতা। ডাক্তার প্রথমে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে কিছুক্ষণ ধরে একখানি ম্যাপ দেখলো। তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসে সেই বড় খাতাখানির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে একটি প্ল্যান বাহির করলো। প্ল্যানটি একটি বাগান-বাড়ীর প্ল্যান। যে বাড়ীতে রহমৎ সরোজকে আটকে রেখেছে সেটি সে বাড়ীরই রেখাচিত্র, যে জানে সে একবারে দেখেই-তা ধরে ফেলবে।

প্ল্যানের প্রত্যেকটি ঘর দরজা সিঁড়ি বারান্দা-সব বিশেষ ভাবে ক'বার দেখে নিয়ে ডাক্তার উঠে পড়লো। আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে টেবিলের 'টানা' হতে একটা পিস্তল বাহির করলো। দু'বার ঘট ঘট করে দেওয়ালের কাঠের দরজাটা খুলে যাবার ও বন্ধ হবার শব্দ হলো। পিস্তলটা পাৎলুনের পকেটে ফেলে ডাক্তার বাহির হয়ে পড়লো।

মোটরে উঠে সোফারকে বললো—ঠাকুরঘাট, বরাহনগব।

সোফার মোটর ছেড়ে দিল।

ডাক্তারের ভুগর্ভ হতে রক্ষা পেয়ে রহমৎ বাগানে ফিরলো। তার মেজাজ

গরম হয়ে উঠেছে। ডাক্তার তারও জীবন নিয়ে খেলা করতে সুরু করেছে, সেও একবার ওই ডাক্তারকে বুঝে নেবে, বুঝিয়ে দেবে রহমৎ কি মানুষ!

ফিরে এসে রহমৎ একেবারে সরোজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বললো—দেখুন সরোজবাবু, আপনার জন্য আজ প্রাণটি যেতে বসেছিল!

—কেন, পুলিশ তাড়া করেছিল বুঝি?

—পুলিশ? হা-হা, পুলিশকে এই রহমৎ কেয়ার করে না সরোজবাবু!

—তবে?—সরোজের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বিস্ময়ে রহমতের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—আরে তোমার পিঠের কুঁজ কোথায় গেল?

—আর কুঁজ! কুঁজ রেখেছিলুম ছদ্মবেশের জন্য, এখন আর তার দরকার নেই, এখন শুধু আপনার কাছ থেকে একটি কথা পেলেই হয়!

—বল?

—আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে চাই, যেজন্য আপনাকে আমি ধরে রেখেছিলাম তা ব্যর্থ হয়েছে, সেই জন্য আমি অনর্থক আপনাকে আর আটকে রাখবো না। তবে আপনাকে ছেড়ে দেবার একটি সর্ত আছে, মুক্তি পেয়েই আপনি যে গট্‌গট্‌ করে চলে যাবেন, সেটি হবে না। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে, আমি সেই লোকটিকে পুলিশে ধরিয়ে দোব, আমায় সাহায্য করতে হবে।

—কোন্‌ লোকটিকে?

—সে একজন ডাক্তার, বিনয় রায়, যে আপনাকে ধরে এনে হিপ্‌নোটাইজ করে আপনাকে দিয়েই আপনার বাড়ীতে চল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়েছে।

—আমায় দিয়ে আমারই বাড়ীতে ডাকাতি?

—হ্যাঁ। আপনি তো আর সজ্ঞানে করেন নি, তাই আপনি জানতে পারেননি, কিন্তু আমরা জানি। সেই অপরাধে পুলিশ আপনাকে ধরেছিল, কিন্তু আপনি পুলিশের হাত ফস্‌কে পালিয়ে আসেন, আপনার নামে এখন 'বডি-ওয়ারেন্ট' আছে।

—আমার নামে বডি-ওয়ারেন্ট! আমার বন্ধুই যে পুলিশের চাকরী করে।

—হ্যাঁ, সেই বন্ধু সার্জেন্ট ডেভিড্‌ই আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সরোজ এমন অবাক হয়ে গেল যে তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ আর কথা সরলো না।

রহমৎ বলে চললো—যে লোকটি এইসব কাজ করছে, সে দু'বার আমাকেও 'খতম' করে দেবার চেষ্টা করেছিল। তার আসল রূপটি আমি পুলিশকে দেখিয়ে দিতে চাই। এখন আমি একবার তার আস্তায় যাব। আপনাকেও আমি সঙ্গে নিতে চাই, আপনার কোন আপত্তি আছে?

এতক্ষণে সরোজের যেন তন্দ্রা ভাঙলো, বললো—কি বলছ, আপত্তি,—না, আপত্তি আমার কিছুই নেই।

—তাতে কিন্তু জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও আছে।

—তাই তো আমি চাই—এ্যাড্‌ভেঞ্চার আমি ভালবাসি। সেই ডাক্তারের আড্ডা এখান থেকে কদ্দূর?

—বেশী দূর নয়, নন্দীগ্রামে—এখান থেকে বড় জোর মাইল দশেক দূর হবে। সেখানে গেলেই বুঝবেন, সে কি রকম মারাত্মক লোক। আপনি এদ্দিন সেখানে থাকলে বেঁচে থাকতেন কিনা সন্দেহ।

—আর বাঁচার দরকার নেই—!

সহসা পিছনে কঠোর স্বরে কে কথাগুলি বললো, দু'জনেই চমকে উঠলো। তাকিয়ে দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে পিস্তলধারী ডক্‌টর বিনয় রায়। কোটের পকেট থেকে ষ্টেথিস্‌কোপ্‌টা মাথা তুলেছে।

—চমকে উঠ্‌লে যে, তোমাদের দুজনকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি মোটর নিয়ে এসেছি বলে ডাক্তার দু'জনের মুখের উপর পিস্তলটি তুলে ধরলো।

তখনও দু'জনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ডাক্তার আদেশের স্বরে বললো —এসো—!

—কোথায় যাবো?—রহমৎ জিজ্ঞাসা করলো।

—উপস্থিত বাড়ীর বাইরে আমার মোটরে, তারপর আমার ল্যাবরেটরীতে।

সরোজ বললো—যদি না যাই?

—সে রোগের ওষুধ আমার হাতেই রয়েছে—বলে ডাক্তার পিস্তলটি দেখালো।

সরোজ হাসলো, বললো—পিস্তল আমায় দেখাবেন না, আমি লড়াই-ফেরৎ। গত যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনে বসে বোমা ফেলেছি, মেসিন্‌ গান চালিয়েছি আর আজ আপনার হাতের একটি পিস্তল দেখে ভয় খাবো বলে মনে করেন?

—ভয় না খেলেই গুলি খাবেন বলেই ডাক্তার পিস্তলের ঘোড়া টিপলো।

ডাক্তার পিস্তলের ঘোড়া টিপেছিল রহমৎকে লক্ষ্য করে। ডাক্তারের কবল হতে পালাবার জন্য রহমৎ একটি ফিকির খুঁজছিল। সরোজ ও ডাক্তারের কথাবার্তার সুযোগে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ডাক্তারের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

গুলিটি রহমতের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখটি উড়িয়ে দিল। রহমৎ যাতনায় আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তার হাসলো, বললো আমার চোখের তাগ্‌ এখনও ঠিক আছে বুঝলে রহমৎ, তোমাকে শায়েস্তা করতেও আমি জানি।

রহমৎ একবার রক্ত চক্ষে ডাক্তারের পানে তাকালো।

ডাক্তার বললো—অমন করে তাকাচ্ছ যে?

রহমৎ এবার রাগে দুঃখে গর্জে উঠলো, বললো—আমিও জানি, তোমায় শায়েস্তা করতে।

হা হা করে ডাক্তার হেসে উঠলো। বললো – তা জানলেও তা আর কোন দরকারে লাগবে না, রহমৎ। আমার বাড়ী থেকে যত সহজে পালিয়েছ, আমার পিস্তলের মুখ থেকে পালানো তত সহজ নয়। একটি নমুনা তো পেলে, দরকার হলে আরো পাবে।

রহমৎ কোন কথা বললো না, রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য বুড়া আঙ্গুলটি টিপে ধরে রুমাল দিয়ে বেঁধে নিল।

পট্টি বাঁধা শেষ হলে ডাক্তার বললো—চলো, সরোজবাবুকে নিয়ে আমার আগে আগে চলো, বাইরে আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্দান্ত লোকের সঙ্গে বেশী কথা না বলাই ভাল, অদৃষ্টে যা আছে হবে। সরোজ আর বাক্যব্যয় না করে অগ্রসর হলো। রহমৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছনে চললো। দু'জনের কেউ কোন ফাঁক দিয়ে যেন সরে পড়তে না পারে, সেজন্য তাদের পিছনে পিস্তল বাগিয়ে ধরে চললো ডাক্তার।

মোটর ছুটেছে। ভিতরে ড্রাইভার ও তিনজন যাত্রী। সোফার সামনে বসে মোটর চালাচ্ছে, পিছনে দু'জন বন্দীর সামনে পিস্তল ধরে বসে আছে ডাঃ বিনয় রায়।

রাত্রির অন্ধকার পিছনে ঠেলতে ঠেলতে চারজন যাত্রী নিয়ে মোটর গাড়ীর চাকা ঘুরছে। যে অন্ধকার এতক্ষণ সামনের পথে জমাট বেঁধে চোখকে ধাঁধা লাগাচ্ছিল ছুটন্ত মোটরের হেড্-লাইটের আলোয় সেই অন্ধকার ভয় পেয়ে কিলবিল্ করে সরে গিয়ে মোটরের পিছনে গিয়ে জমা হচ্ছে। অন্ধকারের এই ছুটাছুটি দেখে আকাশের তারাগুলি মিট্ মিট্ করে হাসছে। সরোজ সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছিল। তার জীবনে একটির পর একটি করে এতো বিপদ এসে আঘাত করে কেন, সরোজ মনে মনে তারই কারণ খুঁজছিল।

গঙ্গার পাশ দিয়ে মোটর ছুটছিল। জলো হাওয়ার এক একটি ঝাপ্টা মাঝে মাঝে সরোজের চিন্তারত উত্তপ্ত মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সরোজ ভাবছিল এই ডাক্তার লোকটি যে ভাবে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে সে যে তাদের সংগে বিশেষ ভাল ব্যবহার করবে তা তো মনে হয় না। এর কবল হতে যত শীঘ্র সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। যে এক জোড়া চোখ আর পিস্তলের নলটি তার পানে তাগ্ করে আছে, সেটাকে কোনরকমে একবার অন্যমনস্ক করে দিতে পারলেই হয়।

সরোজের মাথায় তখনই একটা বুদ্ধি গজালো, পাশের একটা বাগানের পানে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো—আরে, অত বড় বাঘ!

ডাক্তারের চোখ ওপাশে বাগানের দিকে ফিরলো, পিস্তলের চোঙটীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

রহমৎও পায়ের যাতনা ভুলে কৌতুহলী দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকালো।

সরোজ এটাই আশা করেছিল, এই সুযোগ সে ছাড়লো না, এক লাফে মোটর ছেড়ে পথে গিয়ে পড়লো। পথে পড়েই ছুটলো গঙ্গার দিকে। যুদ্ধের সৈনিক হবার সময় সরোজ এই সব কসরৎ অভ্যাস করেছিল বলেই রক্ষা, না হলে অন্য লোক হলে মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে যে আর ছুটতে হতো না, তা সুনিশ্চিত।

ডাক্তারের পিস্তল তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলো—দুম! দুম!

মোটর থেমে গেল।

পকেট থেকে টর্চ বাহির করে ডাক্তার আলো ফেললো সরোজের দিকে, সরোজ তখন গঙ্গার ঢালু তট দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। ডাক্তার পর পর আরো দুটী গুলি ছুঁড়লো।

তখনও ভিজা মাটী দিয়ে খানিকটা গেলে তবে নদীর জল। প্রথম গুলিটী সরোজের হাতের পাশ দিয়ে চলে গেল, দ্বিতীয় গুলির সঙ্গে সঙ্গে সরোজ নদীতটে লুটিয়ে পড়লো।

গুলি তা হলে লেগেছে! তার মত লোকের হাত ফস্কে পালানো কি সোজা কথা! হেসে ডাক্তার সরোজকে তুলে আনার জন্য মোটর থেকে নামলো। রহমৎকে দেখিয়ে সোফারকে বললো—এই, দেখিস না ভাগে।

সরোজ ডাক্তারের এই অন্যমনস্ক হবার সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল। গুলি তার লাগে নি। ডাক্তার মোটর হতে নামার অবসরটুকুর মধ্যেই সরোজ মাটী ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে জলে পড়লো। ডাক্তার এসে টর্চের আলোয় অনেক খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু সরোজের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না।

একটি শিকার তা হলে সত্যই ডাক্তারের হাতছাড়া হয়ে গেল!

একা রহমৎকে নিয়ে ডাক্তারের মোটর ছুটলো। পূর্বের মতো সেই অন্ধকার ঘন বনানী-ঢাকা মেঠো পথের উপর দিয়ে ছরছর করে চাকা ঘুরে চললো।

কিছুক্ষণ মোটর ছুটলো, বোধ হয় মিনিট দুই-তিনের বেশী হবে না। একটি পথের মোড়ে আসতেই ডাক্তার সোফারকে বললো—মোটর ফেরাও!

—কোন দিকে?

—ফিরে চলো যে-পথে এসেছি, হেড লাইট জেলো না।

সোফার মোটর ঘুরিয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চললো।

এবারকার মতো বিপদ কেটে গেছে ভেবে সরোজ তখন সবেমাত্র জল থেকে উঠে কাপড়-জামাটা নিংড়ে নিয়ে কোন রকমে গায়ের জল মুছে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভাবেই অনেকখানি পথ তাকে তখন হেঁটে যেতে হবে। কতদূর গেলে একখানি গাড়ী পাওয়া যাবে কে জানে। তবে মুক্তি মিলে গেছে এই যা কথা, কিন্তু তার মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি। মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে যা লেগেছে, এখনও খচ্ খচ্ করছে। এখন কোন রকমে একখানা গাড়ী ধরে কলিকাতায় যেতে পারলে হয়!

সহসা পিছনের পথে গাড়ীর আলো দেখা গেল, মোটর বলেই মনে হয়। কাছে আসতেই হাত তুলে সরোজ মোটর থামালো, ড্রাইভারকে বললো—আপনি দয়া করে আমায় একটু এগিয়ে দেবেন, বাসের রাস্তা পর্যন্ত ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যই তো এতটা পথ আবার ফিরে এলাম।

সরোজ সেই স্বর শুনে চমকে উঠলো। ভাল করে কিছু ভেবে নেবার আগেই, দুটী হেড লাইট জ্বলে উঠে তার চোখ ঝলসে দিল, আর তারই সঙ্গে তার কপালে এসে লাগলো পিস্তলের একটি ঠাণ্ডা চোঙ্।

হা-হা-হা করে পিস্তলধারী হেসে উঠলো, বললো—আমার হাত থেকে পালানো খুব সহজ নয়, সরোজ বাবু। বুদ্ধিতে আমি আপনার চেয়েও সয়তান ! এখন ভাল ছেলের মতো সুড়-সুড় করে মোটরের ভেতরে আপনার পুরাণো স্থানটিতে গিয়ে বসে পড়ুন দেখি।

ধীরে ধীরে সরোজ মোটরে উঠে রহমতের পাশে বসে পড়লো। পিস্তলের চোঙটী তখনও তার কপালের উপর ধরা ছিল।

ডাক্তার সোফারকে আদেশ দিল—চলো—।

ডেভিড ও সনি মুখোমুখি বসেছিল। ঘরে একটিও শব্দ নেই, শুধু ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ স্পষ্ট হয়ে দু'জনের কানে এসে বাজছে।

আধঘণ্টা হয়ে গেল, তারা এই একই ভাবে বসে আছে। মুখে কারও কথা নেই। সব কথা ফুরিয়ে গেছে। মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। সরোজ নিরুদ্দেশ, বিনয়বাবুকেও কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে, ক'দিন কেটে গেল সে রহস্যের তো একটুকু কিনারা করতে পারলো না। অন্ধকারের বুকে একটা ক্ষীণ আলোকশিখাও তো ফুটলো না। বন্ধু দুটির কি হলো কে জানে ?

দু'জনে মুখোমুখি বসে ভাবছে—কোন্ দিক দিয়ে অগ্রসর হলে রহস্যের কিনারা করা সহজ হবে। দরজা খোলা ছিল, সহসা মস্‌মস্ করে একটি লোক একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। ডেভিড ও সনি তো একেবারে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো—কোন শত্রু নাকি !

লোকটী জিজ্ঞাসা করলো—পুলিশ-সার্জেণ্ট মিষ্টার ডেভিড বাড়ীতে আছেন ?

—আমারই নাম, কেন বলুন তো ?—ডেভিড বললো।

—আমি লালবাজারেই প্রথমে যাই, সেখান থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছি, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

—আপনার বন্ধু সরোজবাবুর সম্পর্কে। সে অনেক কথা, তার আগে একটু জিরিয়ে নেই। আজ সারাদিন যা হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, সে আর কি

বলবো। পাখাটা জোরে খুলে দিন। তারপর আপনাদের খুলে বলছি সব কথা—বলে নবাগত ভদ্রলোকটি কারও কোন কথার অপেক্ষা না রেখে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

সনি ও ডেভিড লোকটির গায়ে-পড়া ব্যবহার দেখে বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

মিনিট পাঁচেক নিশ্চিন্তমনে হাওয়া খেয়ে নিয়ে সনি ও ডেভিডের মুখের পানে চেয়ে আগন্তুক একটু হাসলো, বললো—আপনারা আমার ব্যবহারে নিশ্চয় বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কি করি বলুন, বড় ক্লান্ত।

—না না, বিরক্ত হব কেন!—সনি ও ডেভিড এক সঙ্গে বলে উঠলো—সরোজের যে খবরটি আপনি জানেন, যদি সেটা এবার বলেন, আমরা আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না।

—নিশ্চয়ই বলবো, বলার জন্যই তো আপনাদের এখানে এসেছি। তবে সে কথা বলার আগে আমার নিজের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমার নাম রবি দত্ত।

—আর্টিষ্ট রবি দত্ত?—ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ, লোকে আমায় আর্টিষ্ট রবি দত্ত বলেই জানে। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, প্রভৃতি মাসিকে আমার আঁকা অনেক ছবি বেরিয়েছে।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—নন্দীগ্রামে গঙ্গার ধারে আপনার বাড়ী না?

—হ্যাঁ।

—সেই বাড়ীতে আমরা আর্টিষ্ট রবি দত্ত নামে আরেকজন লোককে গ্রেপ্তার করি।

—তা আমি জানি। আর যাকে আপনি গ্রেপ্তার করেন সে সরোজবাবু।

—তখন আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলেন নি কেন?

—সেই কথাই তো বলছি, শুনুন: আমার বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন আমার একার পক্ষে তা যথেষ্ট। আমার তো আর কাজকর্ম কিছু ছিল না, বসে-বসে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব ঠিক করতাম আর কাগজের বুকে তুলির আঁচড় টানতাম। সেই সময় আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা হয়। ছেলেটি আমার সমবয়সী, নতুন ডাক্তারী পাস করে তখন প্র্যাকটিস স্থরু করেছে। ছেলেটির হাতে পৈতৃক টাকা-কড়ি ছিল, আর ছিল অসংখ্য আজগুবি খেয়াল। আর সেই খেয়ালের জন্য অবিরাম রাত জেগে বসে বসে বই পড়ে গবেষণা করতেই সে ভালোবাসতো। বুদ্ধিহীন ছেলেদের ইঞ্জেকশন দিয়ে মেধাবী করে তোলা যায় কিনা, কি করলে রোগা লোক মোটা হবে, বেঁটে লোক লম্বা হবে, ইলেকট্রিকচার্জ দিয়ে পক্ষাঘাতের রোগীর দুর্বল হাত-পা সবল হতে পারে কি না—এই সব এক একটি খেয়ালের পিছনে ডাক্তার বহু রাত জেগে কাটাতো। এই সব সম্পর্কে নিত্য নতুন ঔষধ-পত্র আর যন্ত্রপাতি কিনেও বহু টাকা খরচ করতো। আপনার লোক বলতে তো আর কেউ ছিল না। আমিই

ছিলাম তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার কাছে এসে রোজই সে তার এক্সপেরিমেণ্টের গল্প করতো, বসে বসে শুনতাম।

আমাদের দু'জনে বন্ধুত্ব জমেছিল খুব। আমি বসে বসে ছবি আঁকি। ডাক্তার দেখে আর প্রশংসা করে বলে, 'তোমার মধ্যে জগজ্জয়ী শিল্পী র‍্যাফেলের প্রতিভা লুকিয়ে আছে।' আর আমি তার গবেষণা শুনে বলি, 'অদূর ভবিষ্যতে ডাক্তার বিনয় রায়ের নাম ম্যাডাম কুরী আর লুই পাস্তুরের পাশেই বসবে।'

সহসা একদিন ডাক্তার এসে বললো—আজকের কাগজ দেখেছ?

জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

—বোম্বের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের খবরটা পড়েছ? সাপে কামড়াবার ওষুধ বের করতে পারলে নগদ দশহাজার টাকা আর তার সঙ্গে চিরস্মরণীয় খ্যাতি।

সেদিন খবরের কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল: ভারতবর্ষে প্রায় দু' হাজার লোক প্রতি বছর সাপের কামড়ে মারা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোজারা ঝাড়-ফুক্ করে বটে কিন্তু লোককে বাচাঁতে পারে না। মন্ত্রেই হোক আর ওষুধেই হোক যিনি সত্যই সাপের বিষ নামাতে পারেন তিনি যদি তাঁর সেই পদ্ধতিটা বোম্বের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে জানান এবং ভারতের ছাত্রগণের জন্য সেই পদ্ধতিটা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তা হলে বোম্বের মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে তাঁকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এবং শুধু ভারত কেন, জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা হবে।

ডাক্তার বললো—আমি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবো বলে ঠিক করেছি, কাল সকালের ট্রেণেই আমি মেদিনীপুর যাচ্ছি। সেখানে অনেক বড় বড় রোজা আছে বলে শুনেছি।

—কিন্তু মেদিনীপুর গেলেই যে কিছু মিলবে তার তো কোন স্থিরতা নেই, এদিকে প্র্যাকটিস্ নষ্ট হবে যে?

—মেদিনীপুরে না হয় আসামের মণিপুরে যাবো। সেখানে না হয় আরেক জায়গায় যাবো। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরবো—যে ক' টাকা আছে সব খরচ করবো। ওষুধ যদি পাই, আমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তার জন্য যদি যায় তো যাক্ প্র্যাকটিস্—সব যাক্, আমি নাম্‌কো ওয়াস্তে সব করবো, বুঝলে! কাল সকালেই আমি যাবো মেদিনীপুরে, কেউ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

পরদিনই ডাক্তার চলে গেল।

সেই যে গেল, ছ'মাস আর কোন খোঁজ খবর নেই, একখানি চিঠি পর্যন্ত পাইনি। লোকটি বেঁচে আছে কিনা ভাবছি, সহসা একদিন একেবারে আমার বাড়ী এসে হাজির, বললো—জানো রবি, কেল্লা ফতে!

বললাম—কি রকম?

বললে—গুরু পেয়েছি, জিনিষ পেয়েছি, এখন পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিছু টাকার দরকার।

—জোগাড় করো।

—কিন্তু দেবে কে?

—আবার প্র্যাকটিস্ সুরু করে দাও।

—প্র্যাকটিস্ আর করবো না, প্র্যাকটিস্ করলে রিসার্চের সময় থাকে না।

—তাহলে টাকা পাবে কোত্থেকে?

—সেই কথাই তোমায় বলতে এলাম। তুমি আমায় সামান্য কিছু টাকা ধার দাও। তুমি না দিলে আমি আর কোথাও টাকা পাব না। আমার এই সব রিসার্চের ব্যাপার আর কেউ বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না।

সেই যে ডাক্তার ধরে বসলো, ক'দিন আমার পিছনে হাঁটাহাঁটি করে হাজার খানেক টাকা নিয়ে তবে ছাড়লো।

তারপর ক'দিন আর ডাক্তারের দেখাই নেই। দিন পনেরো বাদে এসে বললো, —আরো কিছু টাকা চাই।

বললাম—এর মধ্যেই হাজার টাকা ফুরিয়ে গেল?

বললো—এখন দাও, প্রাইজটি পেলে সব শুধে দেবো।

সেবারও ডাক্তার আমার কাছ থেকে শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে গেল।

ক'দিন বাদে আবার আমায় এসে বলে—আরো কিছু টাকা দাও।

অমন ভাবে টাকা দিতে আমি পারবো কেন? বললাম—পারবো না।

বললো—এখন দাও, দশ হাজার টাকা প্রাইজ পেলেই শুধে দেবো।

বললাম—প্রাইজ পাবে কি পাবে না তার কোন স্থিরতা নেই, তার উপর নির্ভর করে আমি প্রতিবারে অত টাকা তোমায় দি কেমন করে?

—বেশ, তুমি তাহলে আর টাকা দেবে না তো, আচ্ছা—বলে চলে যাবার সময় ডাক্তার আমায় শাসিয়ে গেল।

এরই দিন দুয়েক বাদে একদিন রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরছি, বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় সহসা কোথা থেকে একটি লোক আমায় পিছন থেকে চেপে ধরলো। অনেক চেষ্টা করলাম তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কোনদিন তো আর ব্যায়াম কিম্বা যুযুৎসু অভ্যাস করি নি, কিছুতেই তার কবল থেকে মুক্তি পেলাম না। চীৎকার করবো কি, আমার দু'কানের নীচে দুটি শিরা এমন ভাবে সে টিপে ধরলো যে তখনই আমার দু'চোখ ঝাপ্সা হয়ে এলো। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান যখন হলো, চোখ মেলে দেখি আমারই বাড়ীর শোবার ঘরে আমারই বিছানায় শুয়ে আছি, তবে হাত দুটি বাঁধা। আমার চাকর রমেন বিছানার এক পাশে বসে আছে দেখে বললাম—হ্যাঁরে, আমার হাত বাঁধা কেন? খুলে দে?

—নোহি !

—কেন রে, আমার হাতে যে ভয়ানক লাগছে।

—চুপ রহ !

আমি তো অবাক ! রমেন চিরকাল আমার সংগে বাংলায় কথা বলে এলো, আজ আমায় হিন্দিতে ধমকায় কেন ! বললাম—কি রে, কি হলো তোর বল দিকি ?

রমেন কোন জবাবই দিলে না।

বললাম—কিরে কথা বলছিস্ না যে ?

—কি বলবো ?

—কি বলবো মানে ? আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দে ?

—হুকুম নেই।

—আমিই তো তোর মনিব, আবার হুকুম কার ?

—আমার—বলে ডাক্তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো, বললো—সে হুকুম আমার।

—তার মানে ?

—তার মানে বিশেষ কিছুই নয়। আমার কিছু টাকা চাই। টাকার জন্য আমার এতবড় একটা রিসার্চ তো আর বন্ধ রাখতে পারিনা। তোমার আছে তুমি দাও, সৎকাজে খরচ কর। আর যদি না দাও তো তোমায় আমি হাত-পা বেঁধে এমনিভাবেই ফেলে রেখে দেবো।

—তাহলেই বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো হবে।

—বন্ধুপ্রীতি ? এই দুনিয়ার বন্ধুত্ব কথাটাই শুধু আছে, সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই। আর নামের কাছে, খ্যাতির কাছে বন্ধুত্বের মূল্য কি ? আমি নাম চাই। নামই অমরত্ব। এর জন্য আমি নিজে সর্বস্ব খুইয়েছি, শেষে তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম, সামান্য টাকা দিয়েই তুমি পিছিয়ে গেলে, এই তো তোমার বন্ধুত্ব। বন্ধুর জন্য তুমি কি আর-কিছু টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে পারতে না ? তুমি এখনও আমায় কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমায় এখনি ছেড়ে দিচ্ছি।

—এর পরেও বন্ধু হিসাবে আমি টাকা দেবো বলে তুমি মনে কর ?

—বেশ, দাও কি না দাও দেখাই যাবে, ক'দিন এইভাবে থাকতে পার দেখি—বলে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার বাড়ীতে আমার শোবার ঘরেই আমি বন্দী হয়ে রইলাম। আর আমার পাহারাদার হলো আমারই চাকর।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আমি সেই ঘরে পড়েছিলাম, তার মধ্যে আমার একগ্লাস তৃষ্ণার জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

সেই রাত্রেই রমেন ঘুমিয়ে পড়লে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে আসি। কেউ জানতে পারেনি।

পালিয়ে আমি দূরে কোথাও যাইনি। আমার বাড়ীর একপাশে একখানি ভাড়াটে বাড়ী খালি ছিল, সেখানে ক'দিন লুকিয়ে রইলাম ডাক্তারের হালচাল আর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু একদিনও ডাক্তারকে দেখতে না পেয়ে, সেদিন দুপুরে গঙ্গার তীরে বসে নানা কথা ভাবছি,—কি করবো, আর কি করা উচিৎ, এমন সময় গাছের উপর থেকে একখানি কাগজ আমার সামনে পড়লো। কাগজখানি সুতোয় জড়ানো দেখে কি যেন মনে হলো, কুড়িয়ে নিলাম। দেখি পাতলা অয়েল-পেপারের উপর ফুটো করে কয়েকটী অক্ষর লেখা একখানি চিঠি। 'এই দেখুন'—বলে জামার পকেট থেকে একখানি কাগজ বাহির করে সে ডেভিডের হাতে দিল। ডেভিড কাগজখানি ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখলো, আলোর সামনে তুলে ধরে একবার পড়লো। চিঠিখানি সরোজের, আমরা অনেক আগেই এর কথা জানি।

রবি বলে চললো—যে বাড়ীটার কথা চিঠিতে লিখেছে—a red-brick two-storied house, surrounded by a garden and a wall, a pond just outside the wall—পড়েই একটি বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। বাড়ীটি আমার বাড়ী থেকে মাইলখানেক পথ হবে। গিয়ে দেখি দরজা জানালা সব বন্ধ, অনেক ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, কেমন-যেন মনে হলো, পাঁচিল টপকে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। ভিতরের বাগানটুকু পার হয়ে বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছি, দেখি দরজা খুলে আমার খানসামা রহমৎ বেরিয়ে এসেছে। সে তো আমায় চিনেও চিনলে না। শেষে আমায় একখানি ইঁট ছুড়ে মারতে এলো······

তারপর রবি একে একে বললো রহমতের সঙ্গে তার কি কি কথা হয়েছিল...রহমতের পিছু নিয়ে কি করে ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সে রহমতের জীবন বাঁচিয়েছিল···সেই সব কথা। শেষে আর্টিষ্ট বললো—আমার বিশ্বাস সরোজবাবু ওই ডাক্তারের হাতেই বন্দী হয়েছেন। তাঁকে আপনারা নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে চান। আর আমি চাই ডাক্তারকে জব্দ করতে। কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য দু'রকম হলেও কাজ করতে হবে একসঙ্গে। আমি তাই আপনাদের সাহায্য চাই।

—নিশ্চয়ই, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো, আপনি যা বলবেন তাই করবো।

-- বেশ তাহলে জনা চারেক বন্দুক-ধারী পুলিশ নিয়ে আপনারা এখনি বেরুবার ব্যবস্থা করুন, এক মিনিট দেরী করা আমি পছন্দ করি না।

সনি ও ডেভিড বাহির হবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে একখানি মোটর একটি বাগানবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে কোন কথাটি না বলে সাতজন আরোহী একে একে মোটর হতে নেমে পড়লো। বাগানের ফটক খোলাই ছিল। বাগানের মাঝে ছোট দোতলা বাড়ীখানি থম্ থম্ করছে। পল্লীর স্তব্ধতা তার বিরাট পাখা মেলে মায়ের মত স্নেহে বাড়ীখানি ঢেকে রেখেছে। সামান্য আলোর আভাষটুকুও বাইরে পাওয়া যায় না।

বাড়ীর দরজা খোলা। তবে কি তারা আগে থেকে খবর পেয়ে সরে পড়েছে নাকি? তা হলে এখানে আসার সবটুকু পরিশ্রমই তো নষ্ট। সাতটি লোক টর্চের আলোয় বাড়ীর ক'খানি ঘর দেখে শেষ করে ফেললো। একটি প্রাণীকেও দেখতে পেলে না। খালি বাড়ীখানি খাঁ খাঁ করছে, কেউ যে কোনদিন সে বাড়ীতে ছিল তা মনে হয় না।

ডেভিড শেষে জিজ্ঞাসা করলো—এই বাড়ীই তো ঠিক, রবিবাবু?

—নিশ্চয়ই!

—তাহলে সব পালিয়েছে। আমাদের এতদূর আসাই অনর্থক পণ্ডশ্রম হলো!

—আমারও তাই এখন মনে হচ্ছে।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোজকে আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না।

—দেখুন, ফিরে যাবার আগে আমার বাড়ীতে একবার খোঁজ করা যাক, চলুন। সেখানে ডাক্তার তো একটা আড্ডা করেছে, সেখানেও তো সরোজবাবুকে পাওয়া যেতে পারে!

—চলুন, আমার কোন আপত্তি নেই। সরোজকে খুঁজে পাবার যেখানে যতটুকু আশা আছে, সেখানেই আমি যাব। যে বন্ধু বহুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার জন্য আমার সব কিছু করা দরকার।

সকলে মোটরে ফিরে এলো। মোটর আবার ছুটতে সুরু করলো।

এবার মোটর এসে থামলো আর্টিষ্টের বাড়ীর সামনে।

একটি ঘরে আলো জ্বলছে, জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে পথের উপর।

ডেভিড্ মোটর থেকে নেমে পড়ে বললো—ওই ঘর থেকেই আমরা সরোজকে ধরে নিয়ে যাই।

আর্টিস্ট বললো—হ্যাঁ, ওটাই আমার স্টাডি, ওই ঘরে বসেই আমি ছবি আঁকতাম। আপনারা যখন সরোজবাবুকে ধরেন, তখন আমি ডাক্তারকে জব্দ করার জন্য লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

—কিন্তু এইবার আমরা তোমায় খুঁজে পেয়েছি।

পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে কে বলে উঠলো, এমন গম্ভীর সে স্বর যে কানে যাওয়া মাত্রই মাথার মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

চমকে উঠে সকলে পিছনে তাকালো, দেখে: পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট পুরুষ, সকলের মাথা ছাপিয়ে তার মাথা উপরে উঠেছে—সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল উঁচু হবে। রাত্রির অন্ধকারে সেই বিরাট পুরুষের কপালটা যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

মানুষ যে এত লম্বা হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সাতজনেই তো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যে-ক'জন মোটর হতে তখনও নামে নি, তারা নামতে ভুলে গেল, যারা মুখ ফিরিয়ে দেখছিল, তারা মুখ ফিরিয়ে নিতেও ভুলে গেল—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে পম্পিয়াই শহরের নাগরিকেরা যেমন বিমূঢ়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল এও যেন তেমনিই।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। সেই মুহূর্তগুলি ভূমিকম্পের চেয়ে ভয়াবহ, অগ্ন্যুৎপাতের চেয়েও ভীতি-বিহ্বল, ইলেকট্রিকের শকের চেয়েও রোমাঞ্চকর, জলে ডুবে মরার চেয়েও ব্যাকুল, ছুরির আঘাতে হৃৎপিণ্ড ভেদ হয়ে যাওয়ার চেয়েও আতঙ্কময়।

—Ghost ! Ghost !! জিন !!!

মোটরের ভিতরে একজন সার্জেন্টের চীৎকারে সকলের বিমূঢ়তা টুটে গেল। তা যাক্ কিন্তু অতবড় মানুষটাকে সত্যসত্যই চোখের সামনে দেখে ভয় যেন তাদের পেয়ে বসলো। সাহস করে কেউ একটি কথাও বলতে পারলো না। পালাবার জন্য পিছনে এক-পা বাড়াতেও কারও ভরসা হলো না।

ডেভিড আবার সকলের চেয়েও একটু বেশী দুঃসাহসী, অসংখ্য বিপদ তার উপস্থিতবুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে। কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা টেনে বাহির করে বিরাট পুরুষের দিকে তুলে ধরলো। কিন্তু আঙ্গুলের ছোঁয়া লেগে পিস্তলের মুখ দিয়ে আগুন বেরুবার আগেই বজ্রকণ্ঠে সেই বিরাট পুরুষ আদেশ করলো—তিষ্ঠ!

ডেভিডের হাতখানি যেভাবে ছিল রয়ে গেল, যেন কেউ তার পিস্তলশুদ্ধ হাতখানি যীশুর মতো ক্রুশবিদ্ধ করে দিয়েছে, উপরেও ওঠে না, নীচেও নামে না।

বিরাট পুরুষ এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো—হাহা—হাহা—

সাতটি লোকের দৈহিক শক্তিকে উপহাস করে বিরাট পুরুষ হেসে উঠলো, সে হাসি সাতটি জোয়ান লোকের বুকের মধ্যে হিমেল ঝড় বহিয়ে দিল, যেন উত্তর মেরুর তুষারবাহী ধারালো বাতাসের একটি ঝাপটা তাদের দেহকে ছুঁয়ে গেল। তার ঠাণ্ডায় সাতটি লোক যেন জমে বরফ হয়ে গেল। দেখবার

মতো দৃষ্টি, বুঝবার মতো বুদ্ধি, বিচার করার মতো মন, সব থেকেও তারা হয়ে গেল শক্তিহীন, অহল্যার মত পাষাণ।

—এসো—!! সহসা বিরাট পুরুষের আদেশ শোনা গেল।

কথাটা কানে যেতে যতটুকু দেরী। যারা মোটরের ভিতরে ছিল তারা নেমে এলো, যারা বাহিরে থমকে দাঁড়িয়েছিল তারাও পা বাড়ালো। সবাই যেন এক একটি ইস্প্রিংয়ের পুতুল, দু'পায়ে দম দেওয়া হয়েছে,—কারও যেতে ইচ্ছা নেই, কিন্তু পা ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ জুলুম করে না, দড়ি বেঁধে কেউ টানেও না, তবু পা দু'খানিকে থামিয়ে রাখার উপায় নেই, বিরাট পুরুষ চুম্বক শক্তির মতো তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রাতের অন্ধকারের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে বিনয়বাবু বসে বসে ভাবছেন। মুখখানি বড়ই বিমর্ষ। এ তাঁর কি অবস্থা হলো। কোথায় কার হাতে এসে পড়লেন, পরেই বা কি হবে কে জানে। সেই মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে সরোজ হয়তো মরে গেছে। পথের উপর হতে পুলিশ সরোজের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেছে। বন্ধুর মৃতদেহ সনাক্ত করে ডেভিড এখন শোকে মুহ্যমান। সনির মনেও হয়তো এতটুকু শান্তি নাই। এখন সে কোথায় বন্ধুর দুঃখে সান্ত্বনা দেবে তা নয়, কলিকাতার বাহিরে কোথাকার এক অজ্ঞাত পল্লীর একটি অজানা বাড়ীর অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।......

—বিনয়বাবু!

বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, দুশ্চিন্তার সূতা ছিঁড়ে গেল পিছু ফিরে দেখলেন ডাক্তার তার পিছনে দাঁড়িয়ে হেসে তাকে অভিবাদন করছে। লোকটি কখন যে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে বিনয়বাবু এতটুকু টের পাননি।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো – আপনি তৈরী?

—কিসের জন্যে?

—কিসের জন্যে মানে, আপনি কি এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন নাকি?

-ওঃ, আপনার সেই সকাল বেলার কথা?

—হ্যাঁ, সেটা শুধু কথা নয়, সেটা কাজ। আপনাকে ডাকাতি করতে হবে।—ভ্রূ দুটি কুঁচকে ডাক্তার বেশ জোর দিয়েই কথাগুলি বললো।

- যদি বলি আমি ডাকাতি করতে পারবো না?

—সে বলার কি মূল্য আছে! আমি আপনাকে ধরে এনেছি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তা সে ব্যাঙ্ক থেকেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক, আমায় কিছু টাকা এনে দিতেই হবে।

—আমি পারবো না বিনয়বাবু বেশ জোর দিয়েই কথাটি বললে।

—পারবেন না! বেশ, কিন্তু এই না-পারার মানে আপনি জানেন না, সেই

মানেটা আজ রাত্রেই— আজ রাত্রেই বা কেন, এখনি আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

ডাক্তার উত্তেজিতভাবে বিনয়বাবুর হাত ধরে ঘরের বাইরে এলো, চলতে চলতে বললো—পারবো না বললেই আমি আপনাকে ছেড়ে দেব, সে কথা মনেও স্থান দেবেন না, একাজে নাহয় আরেক কাজে আমি আপনাকে লাগাবো, সেই কাজই আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এখনি—

ডাক্তার তরতর করে নীচে নেমে এলো। নীচে এতটুকু আলোর রেশ নেই। সেই অন্ধকারের বুকেই তাড়াতাড়ি কয়েকটি ঘর ঘুরে শেষে একটি ঘরের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো, অন্ধকারে কি করলো কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু সামনের দেয়ালটি ঘট্ ঘট্ করে একটা শব্দ করে সরে গেল, ভিতরের একটি ঘর হতে তীব্র নীল আলোর ঝলক বাইরে এসে পড়লো। বিনয়বাবুকে নিয়ে ডাক্তার ভিতরে ঢুকে গিয়ে আবার দেয়ালটী বন্ধ করে দিলে।

শান্ত নীল আলোয় ঘরখানি ঝলমল্ করছে, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে ঘুম পায়, চোখে স্বপ্নের মায়া লাগে। ঘরে ঢুকে বিনয়বাবুর প্রথমেই নজরে পড়লো আলমারীর মধ্যে অসংখ্য ওষুধ-পত্র আর বাইরের একটি টেবিলের উপর কতক-গুলি যন্ত্রপাতি। ঘরখানিকে প্রথম দৃষ্টিতেই একটি ল্যাবরেটরী বলে মনে হয়।

বিনয়বাবুকে সেইখানে রেখে ডাক্তার ওপাশের একটি দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। আধমিনিটের মধ্যে ফিরে এলো, কিন্তু একা ফিরলো না, ফিরলো দুটি লোককে সঙ্গে নিয়ে। লোক-দুটির মুখের পানে বিনয়বাবু চাইলেন। একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, সরোজেরও বিনয়বাবুকে চিনতে এতটুকু দেরী হলো না। দু'জনেরই ঠোঁট কেঁপে উঠলো, মনের কোণে অনেক দিনের জমে-থাকা কথাগুলি বলার ইচ্ছায়।

ডাক্তারের ধারালো চোখের দৃষ্টি পরস্পরের কেঁপে ওঠা ঠোঁটের ভাষা বুঝলো, হেসে কঠিন স্বরে বললো—আপনারা এখানে কথা বলবেন না। গল্প করার জন্য আমি আপনাদের এখানে আনিনি।

সরোজ প্রশ্ন করলো—আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কিজন্য আপনি আমাদের এখানে ধরে এনেছেন?

—আপনাদের আমি ধরে এনেছি আমার স্বার্থের জন্য—ঠিক আমার স্বার্থ নয়, ভারতের, কেন—জগতের অসংখ্য জনসাধারণের জন্য আমি একটি এক্স্পেরিমেণ্ট করছি। আপনাদের সহযোগিতায় সেই এক্স্পেরিমেণ্ট সার্থক হবে, আর আপনাদের সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

সরোজের পাশে রহমৎ দাঁড়িয়েছিল, সে এবার কথা বললো, বললো—তার মানে, আমাদের মরতে হবে! তাই না?

হ্যাঁ তাই, আপনাদের মরতে হবে। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অসংখ্য মানুষকে ভবিষ্যৎ অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাদের মতো জন-কয়েককে মরতে তো হবেই।

—অর্থাৎ আপনি আমাদের খুন করতে চান ?—বিনয়বাবু বললেন।

—খুন করাই যদি আপনারা বলতে চান তা' আপনাদের যা খুসি বলতে পারেন, আমার মতে কিন্তু সেটা আপনাদের বরণীয় মৃত্যু, আদর্শ মৃত্যু, দশের জন্য দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ ! প্রতি বছর জগতের অসংখ্য লোক অকালে মরণের কোলে ঢলে পড়েছে শুধু সাপের কামড়ের জন্য, আমি তাদের বাঁচাবো, আমার আবিষ্কার ভারতবাসীর—বিশেষ করে বাঙালীর আবিষ্কার হিসাবে বিশ্বের বুকে বাংলা দেশের গৌরব বাড়াবে সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য আপনাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে—এ মৃত্যুকে আমি ত্যাগ বলবো, এটুকু আত্মোৎসর্গ জগতের কল্যাণ কামনায় আপনাদের করতেই হবে।

—অর্থাৎ আপনি করতে বাধ্য করবেন !

—নিশ্চয়ই, জাতির সুনামের জন্য এটুকু করতেই হবে। জার্মান যুদ্ধে বেলজিয়ানরা সব মরলো, তবু তারা জার্মানদের কাছে দেশের মান খোয়ালো না, হাবসী জোয়ানেরা গ্যাসের ধোঁয়ায় বেঘোরে প্রাণ দিল তবু দেশের মাটিতে মুসোলিনীকে কুর্ণিশ করলো না, আর আপনারা দেশকে বড় করার জন্য যদি জীবন দিতে না চান, আমি হিটলারের মতই আপনাদের বাধ্য করবো জীবন দেবার জন্য।

সরোজ হেসে উঠলো, বললো—বেশ চমৎকার যুক্তি, বেড়াল মাছ খায় তো কুকুর ব্যাঙ খাবে না কেন ? বেশ !

ডাক্তার একবার ক্রুদ্ধ চোখে সরোজের মুখের পানে তাকালো, সে দৃষ্টিতে ভয় পাবারই কথা, তবে অনেকবারই অনেক লোক সরোজের পানে অমন ভাবে চেয়েছে, ও-দৃষ্টি সরোজের গা-সহা হয়ে গেছে।

—যাক্, আপনাদের সঙ্গে অনর্থক আমি তর্ক করতে চাই না, কে প্রথম আত্মোৎসর্গ করবেন আপনারা নিজেরাই তা ঠিক করে নিন—আমি আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

বিনয়বাবু বললেন—আমরা যদি কেউ আত্মোৎসর্গ করতে রাজী না হই ?

—তা হয় না, আপনাদের একজনকে রাজী হতেই হবে।

—অর্থাৎ একজনকে আপনি জোর করে খুন করবেন ?

—হঁা, আমি তাই করবো, আপনার যখন সেই মত তখন আপনার উপরেই আমার এক্সেপেরিমেন্ট প্রথম হবে—আপনাকেই আমি প্রথম বেছে নিলাম।

ডাক্তার বিনয়বাবুর হাত ধরে টানলো।

—কী !—সরোজের দু'হাত বাঁধা ছিল, একলাফে এগিয়ে বাঁধা হাত দুটী একসঙ্গে মুঠো পাকিয়ে ডাক্তারের মাথার উপর সবেগে আঘাত করলো।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সরে গেল, সরোজের হাত ডাক্তারের গায়েই লাগলো না।

ঘরটী পরমুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে একটি অট্টহাসি সারা ঘরখানি মুখরিত করে তুললো। সরোজকে উপহাস করে ডাক্তার হাসছে।

—বিনয় ডাক্তার ! বিনয় ডাক্তার !! —দুম্—দুম্—দুম্ !

ল্যাবরেটরীর বাইরের দেওয়ালে আঘাত করে কাকে ডাকতে শোনা গেল।

তখনই সেই ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল, ডাক্তার দেয়ালের ধারে গিয়ে দরজাটী খুলে দিয়ে ডাকলো—আসুন—!

পরমুহূর্তেই যে লোকটী ঘরে এসে ঢুকলো, খুব কম হলেও লোকটী প্রায় আট ফুট লম্বা হবে। লোকটিকে আরবা-উপন্যাসের একটি দৈত্য বললে

ভুল হয় না, রামায়ণের একটি রাক্ষস যেন দলছাড়া হয়ে ছিট্‌কে সেখানে এসে পড়েছে। মাথার চুলগুলি জট্ পাকিয়ে কোমরের নীচে এসে পড়েছে। চোখ দুটী লাল, দেখলে ভক্তি না হোক ভয় হবেই।

সরোজ, রহমৎ ও বিনয়বাবুর পানে তাকিয়ে বিরাট পুরুষ জিজ্ঞাসা করলো —এই তিনটীই কি আজকের এক্‌স্পেরিমেণ্টের জন্য ?

—না, ঠিক তা নয়, একজন তো নিশ্চয়ই, দরকার হলে দু'জনই যথেষ্ট।

—বেশ, আমি আরো সাতটীকে এনেছি

—একেবারে সাতটী ?

—মন্দ কি, তোমার কাজও তো অনেকদূর এগিয়েছে, আর দু' পাঁচটী এক্‌স্পেরিমেণ্ট করার পর তুমি বোধ হয় সফল হবে, আমারও আটানব্বই হয়েছে, আর এই তোমার তিনটী আর আমার সাতটী হলেই একশো আট—

এবার মারে কে ! আমার সাধনা এতদিনে সফল হলো। মা মা, করালবদনা বিকট-দশনা মা—মা !

তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সেই ডাক ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা লেগে গম্‌গম্‌ করতে লাগলো, সে স্বরের তীক্ষ্নতায় সকলের বুক কেঁপে উঠলো।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো,—আপনার লোকেরা কোথায় ?

—এই যে, ভিতরে এসো।

বিরাট পুরুষের আদেশে সনি, ডেভিড, রবি ও বাকী চারজন সার্জেণ্ট যন্ত্র-চালিতের মতো বিনয়বাবুর পাশে এসে দাঁড়ালো।

ডাক্তার নবাগত লোকগুলির মুখের পানে একবার ভাল করে দেখে নিল, তারপর বললো—মহারাজ, আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্‌স্পেরিমেণ্ট করি।

—বেশ ! বিরাট-দেহী সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল।

আলোগুলি নিভে ঘরখানি আবার অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ওপাশের একটি কাচের টেবিলের নীচে একটি আলো জ্বলে উঠলো, সেই আলোয় টেবিলের পালিশ-করা কাচখানি ঝিল্‌মিল্‌ করতে লাগলো, টেবিলের একধারে রঙীণ ওষুধের শিশিগুলিতে সেই আলোর রঙ একটা রামধনু সৃষ্টি করলো।

ডাক্তার সরোজের হাত ধরে বললো— আসুন, আপনিই প্রথম—

—যদি না যাই ?

যাবেন না !— হেসে ডাক্তার পায়ে করে মেঝের উপর কি একটি টিপে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝেতে চিক্‌মিক্‌ করে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সেই 'শকে' সরোজের আপাদমস্তক বার বার শিউরে উঠলো। শুধু সরোজই নয় সকলেরই ওই একই অবস্থা। ডাক্তার হেসে বললো সরোজবাবু, এবার আসুন—

ইলেক্‌ট্রিকের প্রচণ্ড শক্‌ তখনও সরোজের মাথার মধ্যে চিন্‌চিন্‌ করছে, দুঃসাহসী সরোজকে ভীরু, দুর্বল, ব্যথিত করে তুলেছে। আর রুখে দাঁড়াবার সাহস হলো না, ভয়-পাওয়া ভালমানুষ ছোট ছেলেটীর মত সরোজ টুকটুক করে ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ডাক্তার হাসলো। টেবিলের ওধারে একটি কাচের বাক্স বসানো ছিল তার সামনে গিয়ে ডাক্তার দাঁড়ালো, এপাশে ওপাশে বাক্সটির গায়ে কাচের উপর কয়েকটী চাপড় মারলো। একটি কেউটে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বাক্সটীর মধ্যে পড়েছিল. চাপড় মারার শব্দে সে সজাগ হয়ে উঠলো, তারপর মাথাটা তুলে চক্র ধরে দুলতে লাগলো। ডাক্তার একটি করে চাপড় মারে আর সে ভিতরে কাচের গায়েই ছোবল মারে. কাচের আঘাতে মুখে ব্যথা পায়, আর রাগে চক্রটী আরও চওড়া হতে থাকে, মাথা দুলতে থাকে।

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সকলে ডাক্তারের কাণ্ড দেখছিল, মুখে কারও কথা নেই।

সেই কাচের বাক্সের ডালাটা খুলে ডাক্তার সাপটিকে বাহির করতে যাবে, এমন সময় সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে পরিষ্কার ইংরাজীতে কে বলে উঠলো— Doctor, your research is not yet perfect, you are simply killing men by the way of medicinal experiments.

সহসা ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করলো—কে ?

সে কথার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, যে কথা বলছিল, সেই আবার বলে উঠলো—and I dare say, your theory will never attain success.

—কে ? কে তুমি ? আমি শুধু নরহত্যা করছি ? কে তুমি ? টক্‌টক্ করে ঘর-ময় কয়েকটি নীল আলো জ্বলে উঠলো, সাপের বাক্স ছেড়ে দিয়ে

ডাক্তার সকলের সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো তুমি যেই হও না কেন, আমার রিসার্চের একটা প্রমাণ আমি তোমায় দিচ্ছি, যা এর আগে জগতের কোন ডাক্তার আবিষ্কার করতে পারে নি আমি তা করেছি, ওই দেখ (ডাক্তার সেই দীর্ঘদেহী বিরাট পুরুষটিকে দেখালো) আমার ইঞ্জেক্‌সনে পাঁচ ফুট লম্বা লোক আট ফুট হয়েছে, ওই ইঞ্জেকসনে বাঙালী জাতকে আমি নতুন

জীবন দেব, জগতের বুকে ভেতো বাঙালীর দুর্বল নাম ঘুচে যাবে। তারপর এই সাপের ওষুধ, এই দুটো বিষয়……

—এর একটাও তো তোমার নিজস্ব নয় ডাক্তার, ও তো আরেকজনের রিসার্চ, তুমি নিজের বলে গর্ব করছ।

এবার সকলে দেখতে পেল যে কথা বলেছ, সে রহমৎ।

—আরেকজনের রিসার্চ?

—হ্যাঁ। তার নাম ডাক্তার বিনয় রায়। সাপের বিষের ওষুধ বের করার জন্য সে লোকটি বাঙলার অনেক জায়গা ঘুরে চট্টগ্রামের দিকে এক তান্ত্রিকের দেখা পায়। সে সাপের বিষের একটা ওষুধ তাকে দেবে বলে, কিন্তু একটি সর্তে, সেই ওষুধের বদলে, তার দেহ যে ভাবেই হোক অন্ততঃ দ্বিগুণ করে দিতে হবে, একটা বিরাট দৈত্যের মতো, সাধারণ লোকে যাতে তার যোগবলে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তার চেহারা দেখে অন্ততঃ ভয় পায়। বিনয় ডাক্তার ক'দিন ধরে অনেক ভেবে-চিন্তে বিচার করে তার থাইরয়েড্ গ্লাণ্ডে একটি ইঞ্জেকসন্ করে। থাইরয়েড্ গ্লাণ্ড থেকেই মানুষের দেহ বাড়ে, সেই গ্লাণ্ডটিকে যদি ওষুধের জোরে দ্বিগুণ কার্যক্ষম করে তোলা যায়, তাহলে দেহটিও দ্বিগুণ বড় হবে। এই বিষয়ে তাকে আরেকজন ডাক্তার সাহায্য করে, তার নাম বিপিনবাবু। দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল যে, যদি সত্যই সর্পাঘাতের ওষুধ ওই তান্ত্রিকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাহলে আবিষ্কারক হিসাবে দু'জনেরই নাম দেওয়া হবে। কিন্তু বিপিন শেষে বিনয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। থাইরয়েড্ ইঞ্জেকসনে উপকার পেয়ে তান্ত্রিক যখন ঔষধটি দেবে বললে, তখন একাই সুনাম পাবার জন্য বিপিন এক রাত্রে বিনয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিলে। কোনরকমে আগুনের মধ্যে থেকে বেঁচে গেলেও, সেই শকে তাকে তিন মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর সেরে উঠে যখন সে বিপিনের খোঁজ করলে, শুনলে সে কলকাতায় চলে গেছে। বিনয়ও কলকাতায় ফিরে এলো। নিজের বাড়ীতে এসে দেখে বিপিন সেখানে বিনয় সেজে বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে। তখন এক মুসলমান চাকর সেজে সে বিপিনের কাছে চাকরী নেয়। ক'দিন সেখানে কাজ করার পর বিপিনের সব সন্ধানই সে পায়। শেষে বিপিনকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় সে পালিয়ে যায়, সাক্ষী যোগাড় করে। কিন্তু শেষে বিপিন সুযোগ পেয়ে একদিন পাতাল ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এক পুরাণো আর্টিষ্ট বন্ধু সে যাত্রা তাকে বাঁচায়। তারপর যখন সে বিপিন ডাক্তারকে ধরিয়ে দেবার সব ঠিক করেছে, সেই সময় একটু অসাবধান হওয়ার জন্য বিপিন তাকে ধরে নিয়ে আসে।

রহমৎ সহসা থেমে ডাক্তারের মুখের পানে ধারালো চোখে চাইল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—তারপর?

—তারপর বিপিন ডাক্তারের ল্যাবরেটরীর মধ্যে বিনয় ডাক্তার মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো।

—তার মানে?

—তার মানে আমি সেই বিনয় ডাক্তার, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

এক সেকেণ্ডে যেন ডাক্তারের মুখের সব রক্ত ব্লটিং পেপারে শুষে নিল, হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হবার সময় বোধ হয় শিবের মুখখানিও ওই রকম পাঙাশ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার রহমতের মুখের পানে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বলে উঠলো তু-তুমি সে-এ-ই লোক?

ডাক্তারের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, আমিই সেই লোক, সেই চট্টগ্রামের বিনয় ডাক্তার, যার থাইরয়েড্ ইঞ্জেকসন্ তুমি নিজের বলে চালাতে চাও সেই-আমি।

ডাক্তার এবার হোঁহ করে হেসে উঠলো। এ সেই হাসি, যে-হাসি হেসে পরাজিত নেপোলিয়ন বন্দী হয়ে ইংরেজের জাহাজে গিয়ে উঠেছিল। সে হাসিতে লোকটিকে পাগল মনে করে ভয় পাবারই কথা। হাসি থামিয়ে সহসা সে বললো—তাই নাকি, বেশ! বেশ!! তোমার দুঃসাহস আছে রহমৎ, কিন্তু পরিচয়টি এখানে না দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো না হলে আমারই ল্যাবরেটরীতে—

রহমৎ বাধা দিয়ে গর্জে উঠলো—তাই নাকি, তোমার বাড়ী বলে তোমায় ভয় করে চলতে হবে? বেশ, তোমার এই ল্যাবরেটরীর মধ্যেই আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি—বলেই রহমৎ একটি পিস্তল ডাক্তারের দিকে বাগিয়ে ধরলো, পিস্তলটি ডেভিডের, কখন যে সেটি রহমৎ টেনে নিয়েছে ডেভিড জানে না।

—বটে, হা-হা-হাঃ! আগুন নিয়ে খেলবে বন্ধু আর একটু হাত পোড়াবে না!- বলে ডাক্তার অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে কাচের বাক্সটীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, এক লহমার মধ্যে বাক্সটী খুলে সাপটিকে ধরলো, তারপর সাপটিকে একেবারে ছুঁড়ে দিলে রহমতের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সব কটি আলোও নিভিয়ে দিয়ে ঘরখানিকে অন্ধকার করে ফেললো।

অন্ধকারের বুকে তৎক্ষণাৎ রহমতের হাতের পিস্তল দুম্-দুম্ করে গর্জে উঠলো।

আর্তনাদে ঘরখানি মুখর হয়ে উঠলো।

—সাপ! সাপ!! সাপ!!!

—আমায় কামড়েছে সরোজদা!

—হা—হাঃ, বিনয় ডাক্তার—!

—সাপ!

—সনি! স নি!!

অন্ধকারে হট্টগোল বেধে যেত, কিন্তু তখনই আবার আলো জ্বলে উঠলো।

সেই আলোয় দেখা গেল ঃ সনির একখানি পা জড়িয়ে ধরে মস্তবড় একটি সাপ ফোঁস ফোঁস করে মাথা দোলাচ্ছে—সনি পড়ে গেছে। ওদিকে ডাক্তারও টেবিলে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর সেই বিরাট পুরুষটী রহমৎকে ফেলে দিয়ে তার হাত হতে পিস্তলটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

স্তব্ধ-হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা অতগুলি লোকের মধ্যে এক নিমেষে যেন চেতনা ফিরে এলো। সরোজ ছুটে গিয়ে সাপটির মুণ্ড চেপে ধরলো। কিন্তু তার আগেই সনিকে সে ছোবল মেরেছে।

ডেভিড ছুটে গেল রহমৎকে বাঁচাতে। মহারাজের কাছে যেতে-না যেতেই, এক হাতের ঝট্‌কায় সে ডেভিডকে ফেলে দিল পড়ে গিয়ে ডেভিড কোমর থেকে ভোজালীখানি টেনে নিয়ে আবার তার পানে এগিয়ে যেতেই, মহারাজ রহমৎকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, হাত নেড়ে বললো—তিষ্ঠ!

ডেভিড যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, বিরাট পুরুষ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই ডেভিড সঙ্গীদের আদেশ দিল পাকড়ো উস্‌কো!

ডেভিড নিজেও ছুটে বাইরে যাচ্ছিল. রহমৎ তার হাত ধরে থামালো. বললো কোন লাভ হবে না সাহেব, রাত্রির অন্ধকারে তাকে ধরা মুস্কিল হবে, তার উপর সে হিপনোটিজম্ জানে। তার চেয়ে ওই শয়তানকে ধরো—বলে ডাক্তারকে দেখিয়ে দিল।

রহমতের কথা শুনে ডাক্তার হি-হি করে হেসে উঠলো, তার পা ভেদ করে পিস্তলের গুলি চলে গেছে, রহমতের কথা শুনে সে বলে উঠলো—শয়তানকে ধরে নিয়ে যাবে হা হা! তোমাদের ফাঁকী দেবার দাওয়াই আমার কাছেই আছে। পটাসিয়াম সাইয়ানাইড্, বুঝলে বন্ধু, পটাসিয়াম সাইয়ানাইড্—এক সেকেণ্ডে খতম, হা-হাঃ!

সাপটিকে মেরে বিনয়বাবু ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলেন, বললেন—পারমাঙ্গানেট অব পটাস আছে, ডাক্তার? পটাস পারমাঙ্গানেট্?

ডাক্তার হি-হি করে আরেকবার তার নিষ্ঠুর হাসি হেসে উঠলো, বললো—ও কেউটে সাপের বিষ বন্ধু, কোন পটাশেই কিছু হবে না, ওর কোন দাওয়াই আজও বেরোয় নি।

বিনয়বাবু একবার তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরে ওষুধের বোতলগুলির দিকে ছুটে গেলেন, কিন্তু কোন বোতলের গায়েই কিছু লেখা নেই, রঙ দেখে তো চেনা যায় না, ভাল করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবে।

সরোজ সনির পায়ে কাপড়ের বেড় বাঁধলো। সেদিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললো—কিছুতেই কিছু হবে না বন্ধু, ওকে আমি আমার সঙ্গেই নিয়ে যাবো, একা একাই যাবো নাকি, হা-হাঃ!

হাতের আংটীটি ডাক্তার মুখের মধ্যে ভরে দিল। সেকেণ্ডের মধ্যেই ডাক্তার একবার একটু বেঁকেই নিশ্চল হয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

সনির মুখ দিয়ে ততক্ষণে ফেনা উঠতে সুরু করেছে।

তারপর অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টাই চললো, কিন্তু কাল-কেউটের বিষ একবার যার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, তার বেঁচে ওঠাই বিস্ময়।

সনিও সে যাত্রা বাঁচলো না। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই তার হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেলে।

সর্পাহত দেহ দাহ করতে নেই। নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে তিনবন্ধু শোকাচ্ছন্ন চোখে জলস্রোতের পানে চেয়ে রইলো। সনির নীল বিষাক্ত দেহটি ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের বুকে নেচে নেচে দৃষ্টির সীমা পার হয়ে গেল।

বিনয়বাবু আকাশের পানে তাকিয়ে দু' হাত বুকের উপর চেপে ধরে বিড় বিড় করে বলে উঠলেন—শক্তি দাও ভগবান, সহ্য করার মতশক্তি দাও!

সরোজ ও ডেভিডের চোখের সামনে তখন আকাশ ও মাটি, নদীর জল ও দিগ্‌বলয় রেখা—সব ঝাপ্‌সা একাকার হয়ে গেছে।

———

[**গোড়ার কথা ঃ** এ যুগের সভ্যতা বলতে আমরা ইউরোপের সভ্যতা বুঝি। এই সভ্যতা জগতের জ্ঞান ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার সব কিছু গ্রাস করে আধিপত্য করার নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষা এর একটা বিশেষত্ব। নীতির দিক থেকে তারা খৃষ্টান হলেও ত্যাগ শান্তি ও সেবার চেয়ে ইউরোপের রাষ্ট্র-নায়কেরা কামান বোমা ও বিষগ্যাসই পছন্দ করে বেশী স্বার্থের জন্য দুর্বলের টুঁটি টিপে ধরতে তাদের বাধে না। আবিসিনিয়ার যুদ্ধও ইউরোপীয় সভ্যতার এমনি এক কালো দিক। ১৯৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর ইতালির সৈন্যরা গায়ে পড়ে হাবসীদের সঙ্গে ওয়াল-ওয়ালে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। হাবসীরা তৈরী ছিল না, তাদের অরক্ষিত গ্রাম ও জনপদের উপর ইতালিয়ানরা বোমা ও বিষগ্যাস ফেলতে লাগলো। গ্রাম শ্মশান হলো। পরের বছর ৯ই মে সমগ্র আবিসিনিয়া ইতালিয়ানরা দখল করলো। এই যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাতে এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিগুলি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সে শঙ্কা একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের শঙ্কা, এবং সেই শঙ্কা সত্য হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, যার শেষ পরিণতি নাগাসাকি ও হিরোশিমা।]

দেবীচরের প্রকাণ্ড বিলের অথৈ কালো জল রাত্রির অন্ধকারে থমথম করছে। মাথার উপর এক আকাশ কালো ঝড়ো মেঘ সেই অন্ধকারকে আরো জমাট করে তুলেছে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সহসা কে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার!

চারিপাশের স্তব্ধতা যেন চমকে উঠলো, চারদিকে অজস্র প্রতিধ্বনি শোনা গেল—হুঁশিয়ার!—হুঁশিয়ার!!

বাতাসে সে প্রতিধ্বনি নিঃশেষ হবার আগেই জবাব এলো—সামাল্!—সামালো!!

কে যেন একটা, ইলেকট্রিকের স্যুইচ্ টিপ্লো। যে মাঠ এতক্ষণ মৃতের

মতো স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, তা সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঝোপেঝাড়ে গাছের আড়ালে অসংখ্য কালো কালো আবছায়া, দেখা গেল, একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ উঠলো, তারপরেই শোনা গেল কয়েকটি সড়কি ছোড়ার শন্ শন্ শব্দ এবং হুঙ্কার—সামালো—!

দেবীচরের বিলের স্তব্ধ জল ছল্ ছল্ করে কেঁপে উঠলো।

দু'দল লাঠিয়ালের মধ্যে দাঙ্গা সুরু হলো। বিলের দু' পাশে দুই জমিদার—এপাশে আমড়াতলা, ওপাশে মামুদপুর। দেবীচরের বিল দু'জনের সীমানা। যে-বছর যার লাঠির জোর বেশী হয় সে-ই সেবার বিলের মাছ ভোগ করে, এই নিয়মই বছরের পর বছর চলে আসছে। এবারও তার অন্যথা হয় নি।

অন্যান্য বৎসর অমন বিশ-পঁচিশজন জোয়ান এই বিলের তটেই জীবন খোয়ায়, দু-তিন ঘণ্টা দাঙ্গা চলে। এবার কিন্তু লড়াই তেমন জমলো না, সড়কির পর আর লাঠি ধরতে হলো না। গোড়াতেই একটি তীক্ষ্ম সড়কি মামুদপুরের সর্দার রামু দোলাইয়ের বুক ফুঁড়ে দিলে, চীৎকার করে সর্দার লুটিয়ে পড়লো।

প্রথমেই সর্দারকে পড়তে দেখে দলের সবাই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো, লড়াই আর জমলো না, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যেমন তারা এসেছিল, তেমনি যে যার সরে পড়লো। মামুদপুরের এবার দুর্ভাগ্য, উপরি উপরি দু'বছর তারা বিল ভোগ করে আসছে—এবার আর তো হলো না।

আমড়াতলার দল এবার মশাল জ্বাললো। তারপর জয়ের আনন্দে মশাল নাচিয়ে হৈচৈ করতে করতে গাঁয়ে ফিরলো।

পরদিন সকালে আমড়াতলার জমিদার বাবুদের বৈঠকখানায় সোরগোল আর আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। যে সব লেঠেলরা কাল লড়তে গিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে বাবুরা বকশিস দিলেন। সেদিন আমড়াতলায় মধু সর্দারের কি খাতির!

আরেকদিকে তখন বিলের ধারে রামু সর্দারের মৃতদেহের সৎকার করে মামুদপুরের হীরু দোলাই প্রতিজ্ঞা করলে - আমার বাবাকে মারার শোধ যদি না তুলতে পারি তো আমি বাপের ব্যাটাই নয়, আমড়াতলার চৌধুরীদের যদি শিক্ষা দিতে না পারি তো নাম বদলে রাখবো!

তা হীরু দোলাইয়ের রাগ হবারই কথা, বাপ খুন হলে কে কোথায় কবে চুপ করে সয়! তার উপর হীরুর হাতের লাঠি ছিল নারায়ণের সুদর্শনের মতই অজেয়।

দিন কতক পরের কথা।—

ভাদ্রের ভরা নদীর টলটলে জলের বুক চিরে একখানি ছিপ্ ছুটে চলেছে ধারালো বর্শার মত। চারখানি দাঁড় ছিপের দু'পাশে জলের বুকে পড়ছে, উঠছে,—ছল্-ছল্ ছলাৎ ছল্! পাঁচটি ছেলে তারই তালে তালে সুর ধরেছে—

অথৈ তল্ নদীর জল্
দাঁড়ের ঘায়ে এগিয়ে চল্
এগিয়ে চল্—!
দাঁড়ের বল ছলাৎ ছল্
অথৈ তল নদীর জল
এগিয়ে চল্-এগিয়ে চল্ !

বৈঠায় বসে একজন সুর দিচ্ছে আর চারজন তারই পদ ধরে দাঁড় ফেলছে, তুলছে। ছিপের গতি যত ক্ষিপ্র হচ্ছে, গানের পদও ততই দ্রুত হচ্ছে। আমড়াতলার পাঁচটি ছেলে আগামী রামহাটির বাইচ্ খেলার জন্য তৈরী হচ্ছে।

কখন্ আকাশের কোন্ এক কোণে একখানি কালো মেঘ উঠেছিল কেউ তা লক্ষ্য করেনি। ঝড়ো দম্‌কা হাওয়া যখন ধাক্কা দিলে তখন তারা চমকে উঠলো মেঘখানি তখনও বড় হয়ে খুব বেশী এগিয়ে আসে নি। আগেই তো ঝড় উঠবে। এদিকে তারা এসে পড়েছে অনেক দূর, উজান ঠেলে ফিরতেও সময় লাগবে। কাজেই ঝড় ওঠার আগে নদীর তটের উপর ছিপখানিকে তুলে নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগলো।

দেখতে দেখতে মেঘে আকাশ ঢাকলো, ঝড় উঠলো। দম্‌কা বাতাস শন্ শন্ করে ছুটলো এদিকে-ওদিকে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝির ঝির ঝির ঝির করে শব্দ উঠলো। গাছ হেলে পড়লো ঝড়ের টানে। নদীর জল ফুলে ফুলে উঠলো, দু'পাশের তটে গিয়ে আঘাত করতে লাগলো—ছলাৎ ছলাৎ।

তারপর নামলো বৃষ্টি—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। বড় বড় এক একটি ফোঁটা গায়ে এসে বিঁধতে লাগলো তীরের মত। অতবড় একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকেও পাঁচটি বন্ধু রেহাই পেলে না। ঝড়ে আর জলে দেখতে দেখতে তারা ভিজে-বেড়ালটি হয়ে উঠলো।

ঝড়-জল যখন থামলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে।

ছিপখানি জলে ভাসিয়ে সবেমাত্র তারা ক'জন উঠে বসেছে এমন সময় ওদিকথেকে নদীর বাঁক ফিরে একখানি পান্‌সি এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো। মাঝি ছৈয়ের উপর থেকে জিজ্ঞাসা করলো · কত্তাবাবুদের কোথায় ঘর গো ?

—আমড়াতলা।

—বাইচ্ খেলতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—এবার ফিরেত্ যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—ভালই হলো, আমরা সঙ্গী পেলাম। তা এখনও তো বৃষ্টি ধরে নি বাবু, আপনারা ভিজে যাবেন কেন, আসুন না আমার ছৈয়ের মধ্যে।

—তোমরাও কি আমড়াতলায় যাবে নাকি ?

—না, দাদাবাবু, আমরা যাবো মামুদপুর।

মামুদপুর! আমড়াতলার চৌধুরীদের ছোট ভাই ছিল সেই ছিপে, সঙ্গীদের বললে—না, ওদের সঙ্গে যাব না, ছিপ ঘোরাও।

বিশু হাল বেঁকিয়ে ধরলো, ছিপখানি পানসির গা ঘেঁসে পাশ কাটিয়ে যাবে, এমন সময় পানসির মাঝি হেসে বললে—ওঃ, আমড়াতলার ছোটবাবুও আছেন দেখছি। তারপরেই জোর গলায় হাঁক দিলে—বলি ওরে মধো, আমড়াতলার ছোটবাবু যায় ওই পাশের ছিপে, দেখতো—

—এই যে দেখি, কেষ্টা আয়—বলে একজন দাঁড়ি দাঁড় ছেড়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়লো ছিপের উপর। ছোট ছিপ, আচমকা একটা মানুষের ভার সইতে পারলো না, উলটে গেল।

কেষ্টা এবার পানসি থেকে জলে লাফিয়ে পড়লো। পানসি থেকে জলে দড়ি ফেলা হলো। অমন অন্ধকারেও ছেলে পাঁচটিকে খুঁজে নিতে বেশী দেরী হলো না। হাতে, পায়ে, কোমরে, যেখানে সুবিধা পাওয়া গেল মধু আর কেষ্টা একটা করে দড়ির ফাঁস বেঁধে দিল। তারপর সেই দড়ি টেনে পাঁচজনকে তারা পানসিতে তুলে নিলে। ওদিকে, ছিপখানা জলের টানে ভেসে যায় দেখে মাঝি হাঁকলো- ওরে ছিপখানা ছাড়িসনে, ওইটে করে বিলের বাবুদের কাছে মুণ্ডু পাঁচটা উপহার পাঠাবো।

মধু ও কেষ্টা সাঁতরে গিয়ে ছিপখানাকে ধরলে, বেঁধে নিলে পানসির পিছনে।

নিখিলেশরা ভিজে জামা কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দমকা হাওয়ায় কাঁপছে দেখে মাঝি বললে—হীরু দোলাইয়ের নামে দশখানা গাঁয়ের লোক ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে, আর তোমরা সেদিনকার ছেলে, আমার কথা পায়ে ঠেলে অমনি তরতর করে ছিপ হাঁকিয়ে দেবে ভেবেছ? আরে বাপু, আমরা কি এতই সোজা লোক!

বিশু কলিকাতার কলেজে পড়ে, বক্সিং করে অল্প বয়সেই শরীরটাকে সে বেশ মজবুত করে তুলেছে, সাহস তার একটু বেশী, বললে—আপনি সহজ লোক হন আর শক্ত লোক হন, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না, আপনি আমাদের আটকালেন কেন?

—কেন আটকাবো না? মাঝি গর্জে উঠলো—আমড়াতলায় চৌধুরীদের লেঠেলরা আমার বাবাকে মেরে বিলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, আর আমি তাদের ছোট ভাইকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব, শোধ নেব না?

—সেই লেঠেলদের সঙ্গে তখন লড়তে পারেন নি? এখন আমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে—

—দেখ ছোকরা,—বলে মাঝি এক ধমক দিলে, আমার উপর চোখ রাঙিয়ে কথা বল না। সে-রাতে আমি বাবার পাশে থাকলে আমড়াতলার একটা লেঠেলও মাথা নিয়ে ফিরতো না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি কি রকম বীরপুরুষ তা তো জানতেই পেরেছি, না হলে আমাদের মতো ছেলেদের উপর...

হীরু দোলাই এবার সত্যই রেগে উঠলো, বললো—দেখ ছোকরা, বেশী, ফরফর করো না বলছি। বেশী কথা বললে তোমার এই জিভ কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব করবেন, মনে রাখবেন এটা ইংরেজ রাজত্ব !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি বেশ ভালই জানি। আমার বাবা যখন খুন হন তখনও এটা ইংরেজ রাজত্বই ছিল !

—আইন-আদালত করেন নি কেন ?

—আমার আইন-আদালত এখন আমি নিজে,—পরে মধুর দিকে ফিরে বললে—মধো, ছোঁড়াগুলোর হাত পা বেঁধে ছৈয়ের মধ্যে ফেলে রেখে দে।

শুধু হুকুম করার অপেক্ষা ! সর্দারের মুখের কথা কাজে পরিণত হতে দশ মিনিটও লাগলো না। ছৈয়ের মধ্যে কাঠের পাটাতনের উপর পাঁচ বন্ধু হাত পা বাঁধা পড়ে রইল। একদিকে মশার কামড়, আরেকদিকে মনের দুশ্চিন্তা।

কিছুক্ষণ পবে পানসি তীরে ভিড়লো। এদের পাঁচজনকে নামিয়ে নেওয়া হলো। সামনেই খানকয়েক গোলপাতার ঘর। ওদিকে এক জায়গায় আগুন জেবলে জনকতক লোক তাড়ি খাচ্ছিল, সর্দার পানসি থেকে নামতেই তারা সব ছুটে এলো। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে সগর্বে সর্দার বললে—এসব কাদের নিয়ে এসেছি, দেখছিস ? আমড়াতলার চৌধুরীদেয় ছোটবাবু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ।

—আমড়াতলার ছোটবাবু !—সকলে অবাক।

—হ্যাঁ, আমড়াতলার ছোটবাবু। ওদের লেঠেলরা আমার বাবাকে দেবীচরের বিলে খুন করেছিল, এই নিখিলেশ চৌধুরীকেও আজ আমি ভাসাবো ওই দেবীচরের বিলে। তোরা সব ঠিক হয়ে নে, এখনি তোদের যেতে হবে দেবীচরে।

দেবীচর নামকরা জায়গা, সেখানে কত লোকের প্রাণ গেছে। বিলের তীরে বহুদিনের এক দেবী মন্দির আছে। লোকে বলে ওই মন্দিরের জন্যই বিলের নাম হয়েছিল দেবীচর। ওখানে এক তান্ত্রিক থাকেন বলে শোনা যায়। দু-চার ক্রোশের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। ওখানে দশটা লোককে খুন করলেও কেউ জানবে না।

বিশু মুখফোঁড় ছেলে, বললে—আমাদেরকে দেবীচরের বিলে নিয়ে যাবে কেন সর্দার ?

—সেখানে গেলেই জানতে পারবে।

—আমাদের অপরাধ ?

—ওই নিখিলেশ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করো।

—তার মানে ? তোমরা মারামারি করে মার খেলে, লড়তে পারলে না, আর ছেলেমানুষ পেয়ে আমাদের উপর বীরত্ব ফলাবে।

হীরু সর্দার এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললে—দেখ ছোকরা, বেশী বক্‌বক্‌ কোরো না, দুই চড়ে বদন বিগড়ে দোব। কার সঙ্গে কথা বলছ, জান ?

এই সময় একজন লোক দুটী লম্বা বাঁশের লাঠি এনে সর্দারের হাতে দিলে। সেই লাঠিজোড়াটা হাতে নিয়ে একবার ভাল করে পরীক্ষা করে সর্দার বললে—দেখ্‌, ওই নিখিলেশ ছোঁড়াটাকে আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তোরা বাকি চারটেকে নিয়ে আয়,—বলে নিখিলেশকে পিঠে তুলে নিয়ে কোমরের গামছাখানা দিয়ে তাকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে ফেললে, তার বাঁধা হাত দুখানার মধ্য দিয়ে মাথাটা গালিয়ে নিয়ে হাতের লাঠি দুখানার উপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো, তারপরেই ঠক্‌ঠক্‌ ঠক্‌ঠক্‌—রণ-পা ছুটে চললো মাঠের মধ্যে দিয়ে।

সেখান থেকে দেবীচর হাঁটা-পথে ক্রোশ পাঁচেক হলেও, রণ-পায়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগলো না। কিন্তু তারই মধ্যে নিখিলেশের দুর্দশার আর সীমা রইল না। রণপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটার তালে তালে হীরু সর্দারের কাঁধে লেগে হাত দুটি কনুয়ের কাছ থেকে যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। বেদনায় নিখিলেশ গোঙাতে লাগলো। গোঙানি শুনে হীরু এক ধমক দিলে, বললে এই ছোঁড়া, কানের কাছে গোঁ গোঁ করিসনে বলছি, তাহলে এই বিলে তোকে জীয়ন্ত পুঁতবো।

নিখিলেশ চুপ করলো। কিন্তু চুপ করে থাকার যো কি ! শেষে নিখিলেশ পাগলের মত হয়ে সর্দারের কাঁধে এক কামড় বসিয়ে দিলে।

আর যায় কোথা ! রণ-পা থেকে নেমে হীরু এমন কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলে যে নিখিলেশ তো অজ্ঞান হবার যোগাড়।

তারপর আবার রণ-পায়ে চড়ে সর্দার এগুলো, বিলের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে, দৈত্যের মত উঁচুনীচু গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে।

কিছুক্ষণ পরে সর্দার এসে পৌঁছাল, দেবীচরের মন্দিরে।

মন্দিরের জীর্ণ চাতালে নিখিলেশকে যখন নামিয়ে দিলে, হাতের ব্যাথায় ও প্রহারের বেদনায় সে তখন মূর্ছিতের মত। খানিকক্ষণ সে জড়ের মত পড়ে রইল। ইতিমধ্যে অপর চারজনকে নিয়ে দলের সবাই এসে পড়লো। তাদের ক'জনকে চাতালে ফেলে রেখে মশাল জেবলে সামনের ফাঁকা মাঠে সবাই গিয়ে জড়ো হলো। তারপর সুরু হলো তাড়ি খাওয়া আর হল্লা।

কিছুক্ষণ পরে হীরু সর্দরের গলা শোনা গেল- কইরে, এবার ছোঁড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা কর, আর খানিক পরেই যে সকাল হবে।

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে,—আগে চান করিয়ে আনতে হবে তো ?

—নিশ্চয়ই !

—আমাদের বলি দেবে নাকি সর্দার ?—বিশু চীৎকার করে উঠলো।

—আরে, বলি কি রে ? মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ করবি—এ তো বড় ভাগ্যির কথা,—বলে হীরু সর্দার হি হি করে হেসে উঠলো।

—কিন্তু আমরা কি করেছি সর্দার ?

—আমার বাবাকে খুন করেছ, আবার কি করবে ?

—আমরা তোমার বাবাকে খুন করেছি ?

—আরে চল্ চল্, বেশী ফর্ ফর্ করিস্‌নে—বলে ক'জন উঠে পড়লো, তাদের টেনে নিয়ে গেল সামনের বিলে।

চারিদিকে বেশ অন্ধকার। বিলের জলে মাঝে মাঝে ছল ছল করে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। শর-বনের পাশ দিয়ে সরসর করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গাছের মাথাগুলি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সর্দারের লোকেরা পাঁচ-জনের মাথায় জল ঢেলে স্নান করাতে সুরু করে দিলে।

একে সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টিতে ভেজা, তার উপর এই মাঝ রাতে স্নান নিখিলেশরা এক একজন যেন এক একটা ফাঁসীর আসামী, ঠকঠক করে কাঁপছে।

এখনি তাদের মৃত্যু ঘটবে। ওই ভাঙা মন্দিরে ডাকাতে কালীর সামনে এই দুর্দান্ত লেঠেলগুলি তাদের বলি দেবে। কত ছেলেই তো এখানে বলি হয়েছে শোনা যায়। এমন সুন্দর জগৎ, এতো ফুল, এতো আলো, এতো ভবিষ্যতের আশা, সব মৃত্যুর অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। মা, বাপ, ভাই, বোন, কিছুই আর থাকবে না। ভাবতে ভাবতে নিখিলেশের মাথা ঘুরে গেল।

গা আর মোছা হলো না। সেই ভাবেই লেঠেলের দল তাদের নিয়ে মন্দিরের চাতালে এসে উঠলো। মন্দিরের ভিতরে তখন একটি পিদিম জ্বলছে। তার মিট্‌মিটে আলোয় দেখা গেল পূজারীর আসনে বসে আছে কালো চেহারার একটা লোক। তার পিঠের উপর শাদা পৈতা জোড়া আগেই নজরে পড়ে। পূজারীর সামনে ছোট্ট একটী কালী প্রতিমা। অমন অন্ধকারেও তাঁর টক্‌টকে লাল জিভ আর হাতের প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে খাঁড়াটাও চোখে পড়ে। নিখিলেশ খানিকক্ষণ সেই খাঁড়াটার পানে তাকিয়ে রইলো। ওই খাঁড়ার আঘাতেই তাদের জীবনান্ত হবে। ভাবতে ভাবতে সহসা সে তারস্বরে পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো।

হীরু সর্দার ঠাট্টা করে বললে,—চেঁচা না তোদের যত খুসি, তোদের চীৎকার শুনে এখানে কেউ আসছে না, ভয় নেই !

* * *

সনির মৃত্যুতে সরোজ ডেভিড ও বিনয়বাবুর মনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। সনিকে তারা দেখতো ছোট ভাইয়ের মতো। এতো আত্মীয়তা জমে উঠেছিল যে, সে যে ইংরেজের ছেলে, সাদা জাতের ঘরে জন্মেছে, তার

ব্যবহারে বাইরের কোন লোক সে কথা বিশ্বাস করতেই পারতো না। সেই সনি এমনি সহসা এতো কম বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, কে জানতো!

রাতের পর রাত তিনটী বন্ধুর চোখে ঘুম আসে না। বারান্দায় এক একখানি ইজিচেয়ার পেতে চুপ করে বসে থাকে। মনের মধ্যে কোথায় যে কি ঘটে গেছে, ঠিক বোঝা যায় না। শুধু বুকের মধ্যে যখন তখন একটা চাপা কান্না গুমরে ওঠে! শুধু মনে হয় সনি চলে গেছে—চিরদিনের জন্যই চলে গেছে, মরণ তাকে নিয়ে গেছে, সে আর ফিরে আসবে না।

উদাস দৃষ্টি সামনের দিকে ছেড়ে দিয়ে তিনজনে চুপ করে বসে থাকে। রাত্রি এগিয়ে যায়।

নিচের রাজপথে সারিসারি দোকানের আলোগুলি নিভে যায়। পথ নির্জন হয়ে আসে। কখন-কখন দু'একখানি মোটর হুসহুস করে ছুটে যায়। ঘুমন্ত রাত চারিদিকে ঘুমের জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। দিনের জীবন্ত সহর রাতের মৌনতায় মরে যায়। দুনিয়া ঘুমিয়ে পড়ে, শুধু তিনটী লোকের চোখে ঘুম নেই। বারান্দায় আলো নিভিয়ে অন্ধকারে উদাস মনে এক একখানি ইজিচেয়ারে বসে থেকে তারা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেয়। মুখে কথা নেই।

মনের যখন এমনি অবস্থা, সহসা একদিন দুটি পুরাণো বন্ধু এসে উপস্থিত হলো,—ডাক্তার বিনয় রায় ও শিল্পী রবি দত্ত। তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সরোজদের মন একটু-যেন হালকা হলো।

ডাক্তার রায় বলেন—আপনাদের তিনজনকেই যেতে হবে। আমি পঞ্চাশ বিঘে জমি নিয়ে এক কৃষি-কলেজ করবো আমার দেশে, তারই সব দেখা-শুনো করতে নৌকা করে কাল বেরুবো ঠিক করেছি। আপনারাও আমার সঙ্গে যাবেন।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—হঠাৎ কৃষি-কলেজ কেন?

—ভেবে দেখলুম, টাকা যদি খরচ করতেই হয় এই দিকেই করা উচিত। ভারতবর্ষের শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর চাষা গ্রামে বাস করে। বাকি দশজন সহরে থেকে লেখাপড়া শিখে যা-হোক কিছু চাকরি করে, নাহলে একটা দোকান খুলে বসে। এই শিক্ষিত দশ জনের অন্ততঃ দু'জনাকেও যদি দেশে চাষ-আবাদের কাজে লাগানো যায়, তাহলে চাষ-আবাদেরও উন্নতি হবে, গ্রামের অবস্থাও কিছু ভাল হবে। সেইজন্যই এই কৃষি-কলেজ খুলছি। 'গ্রামে ফিরে যাও' বলে উপদেশ দিলে তো হবে না। এ যুগে উপদেশের চেয়ে অর্থের মূল্য অনেক বেশী। বুঝিয়ে দিতে হবে, অল্প মাইনের কেরাণীগিরির চেয়ে, চাষ-আবাদে এদেশে ঢের বেশী উপায় করা যায়। তাহলেই সকলের দৃষ্টি পড়বে এইদিকে।

ডেভিড বললেন—তা আমরা তো চাষ-আবাদের কিছুই বুঝি না, আমরা গিয়ে কি করবো?

—আমিও আপনাদের চেয়ে কিছু বেশী বুঝি না। নৌকা করে খানিকটা বেড়ানো যাবে, এই আমাদের লাভ।

ডাক্তারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সরোজদের যাওয়াই ঠিক হলো।

ট্রেনে যারা ঘুরে বেড়ায়, নৌকা চড়ার আনন্দ তারা জানে না। ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দ, ঝক্‌ঝক্‌ ঝাঁকানি দেহকে পরিশ্রান্ত করে। নৌকার মৃদু দোদুল্‌ দোলা চিত্তকে স্নিগ্ধ করে। তরতর করে নদীর জলস্রোতের উপর দিয়ে নৌকা নেচে চলে। বিরাট নগরীর ইলেক্‌ট্রিকের আলো ছড়ানো পিচ্‌ ঢালা পথ, উঁচু নীচু বাড়ীর সারি, অবিরাম ব্যস্ত গতিশীল মানুষের জনতা ছাড়িয়ে শ্যামল পল্লীর প্রান্ত ঘেঁষে তরণী চলে। দু'পাশের কলের ধোঁয়া ছাড়িয়ে মাটির শ্যামলিমা চোখে ধরা দেয়। সবুজ প্রান্তরের বুকে রক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বট অশথ গাছ কোথাও-বা তাদের পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে গোল-পাতায়-ছাওয়া ছোট একটি গ্রাম। ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা যায় মাঠে ছুটোছুটি করতে। স্নানের ঘাটে চোখে পড়ে লোকের সমাগম। প্রান্তরের বুকে বিছিন্ন গরুবাছুরের দল নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে বেড়াতে ঘাস খায়। দুপুরের তীক্ষ্ন রোদ আকাশের কালো মেঘগুলিকে পাশ কাটিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। দিগ্‌বলয়ের সরল সীমা-রেখা গাছপালায় অড়ালে আঁকাবাঁকা হয়ে ওঠে। বাতাসে ফুলে-ওঠা পাল নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে চলে তরতর করে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচাতে নাচাতে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে একটী একটী করে তারা ফুটে ওঠে। সরোজরা নৌকার বাইরে বসে সন্ধ্যার সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করে। ঝিরঝিরে বাতাস মৃদু স্নেহের স্পর্শ দিয়ে যায়, তট থেকে দু'একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। সরোজদের মনে হয় আজ যদি তাদের পাশে সানি থাকতো! মৃত্যুর পর সত্যই কি আত্মা বলে কিছু আছে? হিন্দু ঋষিরা সত্যই কি আত্মা বলে কিছু জেনেছিল? ওই যে মিটমিটে তারাটি সুদূরে আকাশের গায়ে ঝিক্‌মিক্‌ করছে ওইটেই কি সানি?—মৃত্যুর পর আকাশের গায়ে তারা হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের ভুলতে পারেনি তাই তাদের পানে এখনও তাকিয়ে আছে মিট মিট করে। দূরে—কতদূরে, জগতের সীমার বাহিরে বহুদূরে! নেমে আসার উপায় নেই, কাছে আসার শক্তি নেই। আচ্ছা, উল্কাপাত তো হয়, ওই তারাটি একবার উল্কার মতো ছুটে তাদের কাছে চলে আসুক না, তাহলে তারা সানিকে ফিরে পায়!

আকাশের পানে তাকিয়ে তিনজনে চুপ করে বসে থাকে। চারিদিকে অন্ধকার ঘন গভীর হয়ে ওঠে। তটের প্রান্ত থেকে ঝিঁঝি রব ক্ষীণ হয়ে কাণে এসে পৌঁছায়। মাঝে মাঝে এক একটা পাখীর ধারালো তীক্ষ্ন স্বর তীব্র হয়ে ওঠে। মাঝির তামাক খাওয়ার গুরুক্‌ গুরুক্‌ শব্দ ছন্দের মত শোনায়। চারিপাশ প্রশান্ত স্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত। উপরে রাত্রির নীল আকাশ চাঁদের আলোয় আর তারায় ঝিকিমিকিতে অপূর্ব মহীয়ান হয়ে উঠেছে। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনবীথিকে ঘিরে জোনাকীর পাঁতি। কোথাও বা দূরে থেকে

ভেসে-আসা লণ্ঠনের মিট্‌মিটে দীপ্তি। কত পিছনে কোথায় পড়ে আছে কলিকাতা নগর, ইলেক্‌ট্রিকের আলো ছড়ানো পিচঢালা পথকে ঘিরে দু'দিকে বাড়ীর সারি, অবিরাম অর্থসন্ধানী ব্যস্ত মানুষের জনতা। একদিকে অধৈর্য নগর আরেক দিকে পল্লীর শান্তি,—ব্যস্ততা নেই, পরস্পরকে ছাড়িয়ে ওঠার দ্বন্দ্ব নেই। সহরের লোকগুলি অতি ব্যস্ত, একটির পর একটি কাজে ছুটোছুটি করছেই। ক'বছর আগে এরা কেউ ছিল না, ক'বছর পরেও এরা কেউ থাকবে না তথাপি জীবনের এই বিরাট মায়াময় মিথ্যা স্বপ্নটাকে সত্য বলে মনে করে কত আশা ও আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা, সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, ঈর্ষা ও দ্বেষ, যুদ্ধ ও বিবাদ মানুষ সৃষ্টি করেছে। এই জীবনকে ঘিরেই নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিন, মস্‌কো, কলিকাতা ও টোকিওর মতো বিশাল রাজধানী গড়ে উঠেছে। এই অস্থায়ী দেহটাকে সুখে রাখার জন্য অট্টালিকা, উদ্যান ইলেকট্রিকের আলো, কৃত্রিম লেক, নাট্যশালা, ছবিঘর, ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেডিও, গ্রামোফোন, টেলিভিসান ও ফ্রিজিডিয়ার প্রভৃতি কত সুবিধা তিলে তিলে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। এই দেহটাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কত ধর্মের প্রচার, কত বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্যের মাহাত্ম্য, কত ধর্মের বিরোধ, কত মারামারি কাটাকাটি রক্তপাত, কত আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ, তৈমুর ও মামুদ, নেপোলিয়ন, কাইজার, মুসোলিনী ও হিটলারের আবির্ভাব, কত দাবী-দাওয়া, আইন-কানুন, বিচারালয়, জেলখানা। এই দেহটাকে সাজাবার জন্য অতল সাগরের কত মুক্তা-ঝিনুক প্রাণ হারালো, খনির ঘন অন্ধকার থেকে কত রত্ন সূর্যের আলোয় এসে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো আবার এই মানুষকেই জব্দ করার জন্য কত কামান, ডিনামাইট, গ্যাস, বোমা, টর্পেডো, সাব্‌মেরিন্‌ সৃষ্টি হোল। এই সামান্য দেহকে ঘিরে এতো যে অভিযান—এই দেহটাই একদিন মৃত্যুর কবলে লয় পাবে, এই সুন্দর জগৎ একদিন চোখের সামনে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে—তবু মানুষের এই অভিযান থামবে না।

নৌকা এগিয়ে চলে।

ভাবতে ভাবতে বিনয়বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঘুমোতে ঘুমোতে সহসা মনে হয় কে যেন ডাকলে—বিনয়দা চলো—

বিনয়বাবু এদিক ওদিক তাকালেন, চারিপাশের অন্ধকারে প্রথমে কিছু ঠাহর হলো না, তারপরেই চোখে পড়লো—সনি তার কাছে দাঁড়িয়ে। মৃত লোক ফিরে এসেছে—বিনয়বাবু চমকে উঠলেন। সনি হিঁহি করে হেসে উঠলো, বললে—ভয় পেলে নাকি বিনয়দা!

বিনয়বাবুর তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখেন বাইরে চাঁদের আলো নদীর জলে ঝল্‌মল্‌ করছে। চোখ ফিরিয়ে তটের পানে তাকালেন—দূরে প্রান্তর আর বড় বড় গাছগুলি অস্পষ্ট চোখে পড়ছে। বিনয়বাবু তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়লো প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কয়েকটি লোক দূরে প্রান্তর পার হচ্ছে। বিনয়বাবু ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি সরোজের গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—দেখ, দেখ—

সরোজ ঢুলছিল, সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কী ?

—ওই দেখ—!

বিনয়বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে সরোজ দেখলে, তারপর হাঁক দিলে—মাঝি ! অ মাঝি !

–কি দাদাবাবু ?

—মাঠের উপর দিয়ে এত রাতে ওই কারা যায় দেখতো ?

মাঝি কিছুক্ষণ দেখে বললে—ওরা বোধ হয় ডাকাত দাদাবাবু

—ডাকাত !—দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলো।

তারপর সরোজ বললে—তীরের পাশ দিয়ে ওদের দেখে দেখে চালা

কিন্তু বাবু······

—কোন ভয় নেই, আমাদের কাছে বন্দুক আছে—বলে সরোজ, ডাক্তার ও রবি দত্তকে দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—উঠে পড় ভায়া, ডাকাত ধরতে হবে।

সরোজের কাছে সত্যই দুটি বন্দুক ছিল, বন-বাদাড়ে শিকারের লোভে তারা বন্দুক দুটি সঙ্গে এনেছিল। কার্তুজ ভরে বন্দুক দুটি ঠিক করে নিয়ে তারা নৌকার বাইরে প্রস্তুত হয়ে বসলো, নদীর তীর ঘেঁসে নৌকা চললো। চাঁদের আলোয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগলো রণপায়ে গমামান সেই ডাকাতের দলটিক।

খানিক দূরে গিয়ে মাঝি বললে—বাবু, দেবীচরের বিলের কাছে এসে পড়লাম, এখানে ডাকাতের ভয় আছে অনেকদিন থেকে !

সরোজ বললে—তোমায় তো বলেছি আমাদের বন্দুক আছে।

—দুটো বন্দুক নিয়ে কি করবেন বাবু, ওদেরকে বিশ্বাস নেই। আপনি হয়তো ওদের পিছু নিলেন, ওদের কেউ যে আবার আপনার পিছু নিয়েছে এ আপনি টের পেলেন না। কোন্ ফাঁকে ধারালো এক লেজা (বর্শা) এসে আপনার বুক ফুঁড়ে দিলো। ওদেরকে এই জন্য পুলিশ অবধি ডরায় বাবু। আমার তো বাবু ওদের পিছনে যেতে সাহস হয় না, গরীবের 'নাও খানু' শেষে খোয়াবো।

সরোজ বললে—বেশ, তবে তুই বোস, আমরা একবার দেখে আসি।

নৌকা তীরে ভিড়লো। বন্দুক বাগিয়ে ধরে সরোজ ও ডেভিড সদলবলে নৌকা থেকে নেমে গেল।

নদীর তট থেকে জঙ্গল সুরু হয়েছে। ঘন না হলেও এগিয়ে যাবার বাধা অনেক। চাঁদের আলো না থাকলে সে রাত্রে এগিয়ে যাওয়া চলতো না। অনেক কষ্টে রণপা-চড়া লোকগুলি যে দিকে গেছে সেইদিকে তারা অগ্রসর

হোল। তাদের যাওয়ার শব্দ কানে আসছিল: রণপা'র খট্‌খট্‌, কখনো বা পাতার মর্মর। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

ডেভিড বললে—সব যে একেবারে চুপ হয়ে গেল, আমরা পিছু নিয়েছি জানতে পারলে নাকি?

সরোজ বললে—অসম্ভব কিছুই নয়, আমাদের সাবধানে এগোনো উচিত।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে তারা অগ্রসর হলো।

কতদূরই বা গেছে, চাঁদের আলোয় ঝলমলে এক প্রকাণ্ড বিল তাদের পথ রোধ করলো। বিনয়বাবু বললেন—এই বিলে এসে তারা বোধহয় নৌকায় উঠেছে, তাই আর তাদের যাবার শব্দ পাইনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে খুব কাছ থেকেই একটা চীৎকার শোনা গেল। সকলে সচকিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বিলের ধার ধরে সেই দিকে অগ্রসর হলো।

খানিকটা পথ যেতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো দেখা গেল। একটি পুরানো ভাঙ্গা মন্দিরের সামনে জনকতক জোয়ান লোক বসে হল্লা করেছে। সরোজরা একটা বড় বটগাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

আবার সেই চীৎকার শোনা গেল।

সরোজ বললে—মন্দিরের ভিতর থেকে চীৎকার আসছে বলে মনে হচ্ছে। ওদিকে মন্দিরের মধ্যে কি হচ্ছে কে জানে!

ডেভিড বললে—কিন্তু এই লোকগুলোর সামনে দিয়ে তো আর মন্দিরে যাওয়া যাবে না।

—পিছন দিয়ে যেতে হলে তো অনেক ঘুরতে হবে, দেরী হবে।

—আমরা বন্দুক চালাই ওরা যদি পালায় ভাল, নইলে লড়তে হবে।

—সেই ভাল!

গুম! গুম! গুম! গুম। সরোজ ও ডেভিড চারবার ফাঁকা আওয়াজ করলে।

যারা নির্বিবাদে বসে তাড়ি খাচ্ছিল তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—পুলিশ! পুলিশ! তারপর গাছ-পাতার আড়ালে কে যে কোনদিকে সরে পড়লো ঠিক বোঝা গেল না। চারিপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সরোজরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো।

পুরাণো ভাঙ্গা মন্দির। এক কালী প্রতিমার সামনে একজন তান্ত্রিক বসে পুজা করছে, আর সামনে পাঁচটি ছেলে পড়ে আছে, হাত পা বাঁধা। সরোজরা এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদেরকে এখানে বেঁধে রেখেছে কেন?

পুজারী ফিরে তাকালো, ছেলেদের হয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর করলো—মায়ের পুজার তরে।

—নরবলির জন্য?

—হ্যাঁ।

—মানুষকে খুন করলে ফাঁসী হয়, জান ?

—মায়ের পুজোর নরবলি দেওয়া আর খুন করা, দুটোই এক কথা নয়।

—আমি তোমায় নরহত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম—বলে বিনয়বাবু তার দিকে অগ্রসর হলেন।

—তিষ্ঠ!—বজ্রগম্ভীর স্বরে তান্ত্রিক বললো—আমায় গ্রেপ্তার করার শক্তি তোমাদের নেই। মায়ের পুজোর তোমরা বিঘ্ন ঘটিয়েছ, এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতে হবে। আজ থেকে তোমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অশান্তিময় হয়ে উঠবে—আমি অভিশাপ দিচ্ছি!—বলে সন্ন্যাসী দৃপ্তভাবে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে ধরার জন্য সরোজদের একটা হাত পর্যন্ত উঠলো না। সামান্য 'তিষ্ঠ' কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাদের অক্ষম করে ফেললো।

কয়েক মিনিট পরে সরোজ বলে উঠলো—হিপ্নোটিজম্!

বিনয়বাবু বললেন—দৈব শক্তি!

ডেভিড বললে—যাই হোক, এখন বেচারাদের বাঁধন খুলে দাও, পরে ও কথা নিয়ে তর্ক করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

তখনি সকলে নিখিলেশ ও তাঁর বন্ধুদের বাঁধন খুলে দিলে। তারা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো: আপনারা এলেন বলেই প্রাণে বাঁচলাম না হলে এতক্ষণে ঐ তান্ত্রিকের খাঁড়ার তলায় জীবন যেত।

নিখিলেশের সঙ্গে পরিচয় হলো, বিলের ওপারেই তাদের জমিদারী। নিখিলেশ বললে—আপনাদের ছাড়ছি না, আপনারা আমাদের প্রাণদাতা, যেতে হবে আপনাদেরকে আমাদের ওখানে—

বিনয়বাবুদের কোন আপত্তিই টিকলো না, যেতে হলো নিখিলেশদের বাড়ী। সেখানকার আদর-আপ্যায়নের মধ্যে বিনয়বাবুদের ক'দিন থেকে যেতে হলো।

এই নিখিলেশের বাড়ী থেকেই হলো এই গল্পের সুরু:

সে রাত্রে বিনয়বাবু ঘুমোচ্ছিলেন, গভীরভাবেই ঘুমোচ্ছিলেন।

সহসা ঘুম ভেঙে গেলে, মনে হলো যেন কে তাঁকে এতক্ষণ ডাকছে। ঘরের অন্ধকারটা যেন অনেক বেশী, এতো ঘন অন্ধকার জীবনে তিনি কোনদিন দেখেন নি। খানিক তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো সেই অন্ধকার যেন সহসা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অকস্মাৎ যেন সেই অন্ধকার কালিমা কেটে গিয়ে আলোর ঝরণা বেরিয়ে এলো শুধু আলোর ফুলকি! তাঁর খাটের চারিপাশ দিয়ে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, বেগুনি, নানান্ রঙের আলোর ফুল্কি বেরুচ্ছে, খেলা করছে—বিদ্যুতের মতো। সেই আলোর ঝল্মলানি বিনয়বাবুর দু'চোখ যেন ঝল্সে দিল। বিনয়বাবু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময় তাঁর কানের উপর কে যেন একটুকরো বরফ চেপে ধরলো, মাথার ভিতরটা

শির্‌শির্‌ করে উঠলো, পিঠের মের‌ুদণ্ডের দ‌ু'পাশ দিয়ে, রক্তস্রোতের মধ্যে চিনচিনে শৈত্যের একটা কনকনানি অন‌ুভব করলেন, কানের কাছে কে যেন বলে উঠলো—বিনয়দা, চলো!

বিনয়বাব‌ু ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে রঙীন ফ‌ুলকিগ‌ুলো সব নিভে গেল, ঘরখানা আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কথাটা সনির গলার। বিনয়বাব‌ু অন্ধকারেই এপাশে-ওপাশে তাকালেন। কিন্তু কিছ‌ুই চোখে পড়লো না। এদিকে ঘরের সেই ঘন অন্ধকার দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে এলো। তার মধ্যে দ‌ুটো নিষ্ঠ‌ুর চোখ ফ‌ুটে উঠলো তীক্ষ্ণ চোখ, ধারালো দ‌ৃষ্টি! চোখ দ‌ুটো তাঁকে সম্মোহিত করছে যেন!

বিনয়বাব‌ু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামতে গেলেন, কিন্তু মনে হলো—যেন একজন লোক ঘরে ঘ‌ুরে বেড়াচ্ছে। ক'মিনিট কান পেতে শ‌ুনলেন স্পষ্ট পায়ের শব্দ। একটির পর একটি পা ফেলে অন্ধকারে কে যেন খাটখানিকে প্রদক্ষিণ করছে, কোন ভুল নেই!

এ তাহলে নিশ্চয়ই কোন চোর ঘরে ঢ‌ুকেছে।

চোরটাকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি যেই খাট থেকে নেমে এক পা নিচে নামিয়েছেন, অমনি একটা শব্দ হয়ে পায়ের নীচে মেঝেতে যেন আগ‌ুন ধরে গেল,—একটা বোমা ফাটলো কি? বিনয়বাব‌ু চমকে উঠলেন। কিন্তু তখনই আবার কি ভেবে তিনি আরেক পা মেঝেতে ফেললেন, এ পা আগ‌ুনে পড়লো না, পড়লো যেন বরফের মধ্যে এক সেকেণ্ডে পাখানা ব‌ুঝি জমে গেল। একপায়ে আগ‌ুনের জ্বালা, আর এক পায়ে বরফের কনকনানি—বিনয়বাব‌ুকে পাগল করে তুললো। সারা দেহে রক্ত চলাচল ব‌ুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বিনয়বাব‌ু স্বপ্নাবিষ্টের মতো বিছানার উপর ল‌ুটিয়ে পড়লেন।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বিনয়বাব‌ুর দেহের উপর স্নেহের প্রলেপ ব‌ুলিয়ে দিলে। শিশির ধোয়া প্রভাতী বাতাসে মাথাটা ক্রমে-ক্রমে হাল্‌কা হয়ে এলো। বিনয়বাব‌ু চোখ খ‌ুললেন। যেন অনেকক্ষণ ঘ‌ুমোবার পর ঘ‌ুম ভাঙলো।

চোখ খ‌ুলে বিনয়বাব‌ু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মাথার মধ্যে যেন ইলেকট্রিকের শক্‌ লাগলো। ঘরের মধ্যে ঊষার আলোর আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র, আব্‌ছা অন্ধকার তখনও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সেই অন্ধকারে সামনে এক বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে ঘরের ছাদের কাছে। প্রথমে শ‌ুধ‌ু ছায়া। ক্রমে ম‌ুখখানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো: তীক্ষ্ণ ধারালো একজোড়া চোখ, র‌ুদ্র রক্তিম দ‌ৃষ্টি। প্রশস্ত কপাল, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক ভোরের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ধারালো নাক, তারই দ‌ু'পাশ দিয়ে শাদা দাড়ির ঢেউ ফ‌ুলে ফ‌ুলে উঠেছে।

এই ম‌ুখ বিনয়বাব‌ুর চেনা। সে-ই তান্ত্রিক। এই ক'দিন আগে দেবীচরের

বিলে ধরা পড়ার ভয়ে যে পালিয়েছিল আজ সেই লোক তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো কি করে ?

বিনয়বাবু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই ভয়াবহ মুখের পানে, সেই চোখের পানে চাইতে ইচ্ছা করে না, তা না করলেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই, এমনি আকর্ষণীয় শক্তি সেই দু'চোখে। টিক্‌টিক্‌ করে ঘড়িতে এক একটি সেকেণ্ড কাটতে লাগলো বিনয়বাবুর মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই সম্মোহনী চোখ তাঁর পানে চেয়ে আছে।

সহসা স্তব্ধতা শেষ করে অশরীরী ছায়া কথা বলে উঠলো—আমায় তুই ধরতে গিয়েছিলি। তোর জন্য আমার আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তোকে আমি সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছিস্‌ ? আমি সব সময় তোর সঙ্গে আছি।

কথাগুলি বলেই সেই ছায়ামূর্তি অস্পষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু এবার চোখদুটি রগড়ে ভাল কার চারিপাশে তাকালেন। যুক্তি ও তর্ক দিয়ে মনে মনে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। এ কখনই হতে পারে না। রক্ত-মাংসের দেহে কোন লোক এভাবে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না—এ শুধু দুস্বপ্ন !

বিনয়বাবু এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। বাহিরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় মুক্ত হাওয়ায় এদিকে ওদিকে খানিকক্ষণ পায়চারি করতে করতে বিনয়বাবুর কেমন যেন মনে হলো।—মনে হোল ঃ তাঁর নিজের পদশব্দ যেন বেশ সশব্দে প্রতিধ্বনি তুলছে।

একবার—দু'বার—তিনবার—

বারবার বিনয়বাবু ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। মনের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি পদক্ষেপ করতে লাগলেন অত্যন্ত সন্তর্পণে, অতি ধীরে, একেবারে নিঃশব্দে। কিন্তু প্রতিধ্বনি একটুকু কমলো না, পরিষ্কার সুস্পষ্ট !

এ তা' হলে প্রতিধ্বনি নয়, এ আর কার পায়ের শব্দ। কোন লোক তারই সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি সত্যি সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীটা অদৃশ্য থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ? এই খানিক আগে সে যে স্বপ্ন দেখলো, সেটা তাহলে স্বপ্ন নয়, সত্যি ! 'আমি সবসময় তোর সঙ্গে আছি'—কিন্তু অমন বিরাট দেহটা নিয়ে সে কি করে অদৃশ্য হয়ে আছে ?

বিনয়বাবু কিছুক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বিনয়বাবু নীচে নেমে গেলেন। আর সন্দেহের অবকাশ নেই, সিঁড়িতে প্রতি ধাপে পা ফেলার আগে অদৃশ্য মানুষের স্পষ্ট পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে।

নীচে বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকে, খবরের কাগজখানি যেই তুলে নিয়েছেন, অমনি কানের পাশে কে চীৎকার করে উঠলো—খবরের কাগজ পড়ে আর কি হবে ? মৃত্যু ! মৃত্যু ! মরার জন্য তৈরী হ !

বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, কে? কিন্তু মানুষ তো কেউ নেই, বক্তাকে দেখারও তো উপায় নেই। চোখ ব্যর্থ হয়েছে, কান কিন্তু প্রতিটী শব্দ প্রতিটী কথা ধরে দিচ্ছে। এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সে তো লড়তে পারবে না। সে পাগল হয়ে যাবে জগৎটা ওই শত্রুর কালো পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে। এ হলো কী?

বিনয়বাবু একখানি সোফায় বসে পড়লেন।

ডেভিড ইংরেজ, বিলিতি আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ, বিনয়বাবুর কাহিনীকে সত্যঘটনা বলে সে বিশ্বাসই করতে চায় না, বলে—ওসব মনের দুর্বলতা, সানিকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, তার এই অপঘাত মৃত্যু আপনার মনকে বিশেষভাবে আঘাত করেছে, সেই আঘাতে মনের অনুভূতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এই ঘটনাগুলি তারই বাইরের প্রকাশ মাত্র। আস্তে-আস্তে শোক কমে গেলে, ওসব অস্বাভাবিক ব্যাপার মন থেকে মুছে যাবে।

—একে তুমি মনের বিকার বলছ ডেভিড, কিন্তু সত্যি তা নয়,—বিনয়বাবু বললেন,—আমি স্পষ্ট শুনেছি, দুঃস্বপ্ন নয়।

—বেশ, তাই যদি হয়—সরোজ বললে,—আপনি এখনি আমাদের সামনে দু'পা হাঁটলেই তো আমরা জানতে পারবো, আপনার আগে আগে সত্যি কেউ হাঁটছে কিনা।

বিনয়বাবু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটির পর একটি পা ফেলে চলে গেলেন।

সরোজ ও ডেভিড স্পষ্ট শুনতে পেল দুটি লোক ঘরের মধ্যে হাঁটছে।

প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারলে না, বললে—আপনি খানিকক্ষণ চলাফেরা করুন তো, শুনি।

বিনয়বাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, তিনি আরো ক'বার ঘরের একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। সরোজ ও ডেভিডও শুনলো। কোন ভুল নেই, অদৃশ্য মানুষের শব্দ স্পষ্ট ও সত্য। বিনয়বাবুর আগে আগে একটি লোক চলে যাচ্ছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনয়বাবু ম্লান হেসে বললেন—কি, এবার বিশ্বাস হলো তো?

—এমন চাক্ষুষ প্রমাণ অবিশ্বাস করি কেমন করে?

—শুধু কি এই? কানের কাছে এসে কথাও বলছে।

—এই পায়ের শব্দের মত সে কথাও কি শোনা যাবে? আমরা শুনতে পাব?

—সে কথা বলতে পারিনে,—বিনয়বাবু বললেন,—তবে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক সারাদিন। আমি যখন আবার তার কথা শুনতে পাব, তখন তোমরা কাছে থাকলে শুনতে পাও কিনা জানা যাবে।

—বেশ।

সরোজ ও ডেভিড সারাদিন বিনয়বাবুর কাছে কাছে রইল।

কিন্তু সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না। ঘটনা ঘটলো রাত্রে।

সরোজ ও ডেভিড বিনয়বাবুর ঘরেই ঘুমোচ্ছিল, সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে হলো খাটের চারিপাশে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড-সুইচ্ হাতের কাছেই ছিল, সরোজ তাড়াতাড়ি সুইচ্‌টা টিপে ধরলো, আলো কিন্তু জ্বললো না।

বিনয়বাবুর একখানি হাত এসে পড়লো সরোজের গায়ে, বললেন—শুনছ?

সরোজ জবাব দিলে—হ্যাঁ।

ডেভিড বললে—আলোটা জ্বালো।

—জ্বলছে না।

—না, ও আলো এখন জ্বলবে না,—ঘরের মধ্যে গম্ভীর স্বরে সহসা কে বলে উঠলো—আমি ওকে নিভিয়ে রেখেছি। আমার যোগবলের কাছে কি তোমাদের বিজ্ঞানের বল বড় হবে?

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে?

—আমি? আমি এ-যুগের অশ্বত্থামা। ক'দিন আগে তোমরা আমার তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ ক্ষতি করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতে হবে, তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরী হও!

সরোজ ও ডেভিডের মনে হলো সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি কে যেন কথা বলছে, অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না. কয়েক লহমা সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো অন্ধকারে নীল দেয়ালটির গায়ে কালো কালো অসংখ্য ছায়া ছুটোছুটি করতে করতে সব যেন এক জায়গায় এসে জড়ো হয়ে গেল। আর সেই কালোর মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো প্রকাণ্ড দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসীর মুখ সেই মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে লেপা রক্তচন্দনের তিলক, রুক্ষ জ্বল্‌জ্বলে দুই চোখের পানে চাইলেই অন্তরে কাঁপুনি জাগে, স্নায়ুতে শৈত্য বোধহয়।

বালিশের নীচে পিস্তল ছিল, বের করে ডেভিড সেই অশ্বত্থামার ছায়াকে গুলি করলো।

পিস্তলের শব্দের প্রতিধ্বনি জাগলো। জানালার কাচের শার্শিগুলো ঝন ঝন করে উঠলো। অশ্বত্থামার ছায়া মিলিয়ে গেল। বেড-সুইচ্ টেপাই ছিল, এবার আলো জ্বলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সব বিভীষিকা ফুরিয়ে গেল।

ডেভিড তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়লো। খাটের নীচে, আলমারীর পিছনে একবার ভাল করে দেখলে, কিন্তু কেউ তো লুকিয়ে নেই। দেয়ালও ফাঁপা নয়···তবে?

ঢং ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটে বাজলো।

বাকি রাতটুকু তিনজনের চোখে আর ঘুম এলো না।

সকালবেলা সরোজ বললে—দুষ্ট লোক হয় তো তাকে শায়েস্তা করা যায়, কিন্তু এ-যে শুধু ছায়া, ধরতে-ছুঁতে পারবো না, বন্দুকের গুলিতে বিঁধবে না, এ এক নতুন রকমের সমস্যা দেখি।

ডেভিড বললে—তাকে আমরা ধরতে পারবো না, অথচ সে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাবে, আমাদের কানের কাছে এসে কথা বলবে, এ ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু!

আপনারা তো মজার ব্যাপার নিয়ে বেশ আনন্দ করছেন এদিকে আমার যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!—বলে ডাক্তার বিনয় রায় এসে ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার রায়ের সঙ্গে ছিল আর্টিস্ট রবি দত্ত। হীরু দোলায়ের দলকে ধরিয়ে দেবার জন্য তারা 'সদরে' গিয়েছিল দিন দুয়েকের জন্য।

—এই যে আসুন. আসুন—বলে বিনয়বাবু তাদের দিকে দু'খানা সোফা এগিয়ে দিলেন।

দু'জনে বসলো।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—ওখানকার সব ব্যবস্থা শেষ করে এলেন তো?

—কিছু না। নিখিলেশদের রেখে আমরা চলে এলাম।

—কেন? কি হলো?

—সে অনেক কথা,—বলে ডাক্তার রায় বলতে সুরু করলো,—পরশু রাত্তিরে যখন ঘুমোবার যোগাড় করছি...ইত্যাদি।

ডাক্তার রায় যা বললে, তা বিনয়বাবুর ঘটনাই যেন হুবহু নিজের নামে বলে যাচ্ছেন বলে মনে হলো।

কথা শেষ করে ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়ালো, ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা কিছু শুনতে পেলেন? আপনাদের কি মনে হয় কোন অদৃশ্য লোক আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে?

ঘরের সকলেই মাথা নাড়লো, বললো—শুনেছি।

ডাক্তার রায় ঝুপ করে সোফায় বসে পড়লো। বললে—এখনই এর একটা প্রতিকার করতে হবে, সেইজন্যই এখানে এলাম, নইলে ওই ভূতের হাতেই আমায় মরতে হবে।

সরোজ হেসে বললে,—ভূতের পায়ের শব্দ শুনেই এতো ব্যাকুল হলে চলবে কেন, আমরা তো এদিকে ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসেছি! কই বিনয়দা, দু'পাক ঘুরে ঘুরে ডক্টর রায়কে একবার দেখিয়ে দিনতো আপনার সঙ্গে কতগুলো ভূত চলাফেরা করে।

—তার মানে, আপনাদেরও এই ব্যাপার নাকি?

—তবে কি শুধু আপনার একারই নাকি?

ডাক্তার রায় ও আর্টিস্ট দত্ত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

সেইদিনই তারা কলিকাতায় ফিরলো।

সন্ধ্যার দিকে সরোজ সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, বললো—চলুন বায়োস্কোপে যাওয়া যাক, এইসব দুশ্চিন্তার হাত থেকে তবু খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে।

শ্যামবাজারের দিকে একটি সিনেমায় তখন একখানি আমেরিকান নতুন ছবি দেখানো হচ্ছিল। গল্পটি যীশুর জীবনী নিয়ে লেখা। মহামানব মানুষের মনকে সুন্দর করে তোলার জন্য, চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য ত্যাগের ও সহিষ্ণুতার বাণী দিকে দিকে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—সবাই মানুষ, সবাই বন্ধু, সবাই ভাই; জাতির বিচারে, রূপের তারতম্যে মনুষ্যত্ব কমবেশী পাওয়া যায় না; নীচ কি ছোট কেউ নেই—ভগবান সকলের। সবাই মানুষ—সবাকার সমান অধিকার। সবাই শুনলো, বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই মহাপুরুষের মুখের পানে, কেউ তাঁর বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারলো, কেউ পারলো না। যারা সে সত্যকে বুঝলো তারা হলো বন্ধু, যারা তা পারলো না তারা হলো শত্রু। স্বার্থপর শত্রুর দল করলো ষড়যন্ত্র, যীশুর বারোজন প্রিয় শিষ্যের মধ্যে একজনকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করলো, সে যীশুকে ধরিয়ে দিলে। অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতককে চিনলেন, জানলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরোধী, সমাজ-বিপ্লবী বলে তাঁর বিচার হলো। অপরাধী যীশুকে প্রকাণ্ড কাঠের ক্রুশ ঘাড়ে করে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠতে হলো। সেই পাহাড়ের চূড়ায় কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়ে, একটির পর একটি পেরেকে বিঁধে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। অসহ্য যাতনাতেও যীশুর মুখের ভাব এতটুকু বিকৃত হলো না। যে সব হিংসাপরায়ণ স্বার্থপর মানুষের দল তীক্ষ্ণ উপহাসে ও অসহনীয় নিষ্ঠুরতায় তিলে তিলে তাঁকে হত্যা করলো, অহিংসার পূজারী শান্ত সৌম্য মহান্ পুরুষ শেষ মুহূর্তে রক্তাক্ত দেহেও আশীর্বাদ করে গেলেন—ভগবান, তুমি এদের ক্ষমা করো। কে তখন ভেবেছিল এই লোকটি আজ যে অমরবাণী প্রচার করে যাচ্ছেন দু'হাজার বছর পরেও জগতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষিত জনগণ তা শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

ছবিখানি চমৎকার, সহজে মন থেকে মোছবার নয়।

ছবি-ঘর থেকে বেরিয়ে সরোজ ঘড়ি দেখলে, রাত সাড়ে আটটা। বললো—এর মধ্যে বাড়ী ফিরে কি হবে, চলুন ময়দানে গিয়ে খানিক হাওয়া খাওয়া যাক।

ডেভিড বললো—বড় খিদে পেয়েছে যে!

—কলকাতার সহরে পকেটে পয়সা থাকলে আবার খাবার ভাবনা! চলো একটা হোটেলে বসে কিছু খেলেই হবে।

ক'জনে মোটরে উঠে বসবে এমন সময় পাশ থেকে একটি লোক বলে উঠলো—আপনারা ময়দানে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন যান, কিন্তু মনে শান্তি পাবেন না!

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো লোকটির মুখের উপর। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় এসে পৌঁছেচে, কাঁচা পাকা দাড়িগোঁপে মুখখানি বিজ্ঞ। তবে বিশেষ অসাধারণ কিছু সে মুখে নেই।

বিনয়বাবু বললেন—আপনি আমাদের কিছু বলছেন?

লোকটি হাসলো, বললো—হ্যাঁ। বলছি, আপনাদের মনের অশান্তি আপনাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। আপনারা এক সন্ন্যাসীর কবলে পড়েছেন। যত সহজে তার হাত থেকে আপনারা রেহাই পাবেন বলে ভেবেছেন, সে লোকটি ততো সহজ নয়। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, তাতে আপনাদের উপকার হবে, কিন্তু এই পথে দাঁড়িয়ে……

অচেনা কোন লোক যদি সহসা মনের কথাটি বলে দেয়, তার সম্বন্ধে বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধা জাগাই স্বাভাবিক, বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন—তার জন্য কি, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তো মোটরে আসতে পারেন।

ভদ্রলোক যেন এই কথাটারই অপেক্ষা করছিল, এবার মোটরের মধ্যে উঠে বসলো।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক বলতে সুরু করলো—দেখুন, দু'পাঁচজন লোক আছে যারা নিয়মিতভাবে অভ্যাস করে অসাধারণ রকম মনের জোর আয়ত্ত করতে পারে। পড়তে পড়তে যেমন ছাত্রদের মেধা ও জ্ঞান বাড়ে, তেমনি যোগের কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে পারলে অসাধ্য সাধন করার মত মনঃশক্তি মানুষ লাভ করতে পারে। ভাল বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে মাথা ঘামিয়ে যেমন রেডিও, টেলিভিসান প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তেমনি সত্যিকারের 'উইল্‌ফোর্স" যার আছে সে এসব যন্ত্র ব্যতিরেকেই অনেক কিছু জানতে, বুঝতেও করতে পারে। বিলাতে একটা লোক এখন কি করছে দেখতে হলে আমাদের টেলিভিসানের সাহায্য নিতে হবে, কিন্তু মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মনের দর্পণে তা এখনি দেখে নিতে পারে, কোন লোককে এতটুকু আঘাত না করে তার মনকে আকর্ষণ করে মরণাপন্ন করে তুলতে পারে, মুখের পানে তাকিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারে। এরা এক একজন অসামান্য পুরুষ, প্রকৃতিকে জয় করে বহুদিন পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকে। এদের মধ্যে দুটি দল আছে, একদল জগতের উপকারের জন্য জীবন পণ করে, আরেকদল নিজের স্বার্থের জন্য জগতের কোন অপকার করতেই পিছু হটে না। এই শেষের দলটীর সংস্পর্শে না আসাই ভাল। কিন্তু আপনারা অজ্ঞাতসারে এমনি এক তান্ত্রিকের কবলে এসে পড়েছেন, তিনি আপনাদেরকে সহজে ছাড়বেন না। তবে আপনাদের মনের জোর আছে বলেই সহজে সে কিছু করতে পারছে না।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি আমাদের কথা কি করে জানলেন?

—আপনাদের মুখের পানে তাকিয়ে এই কথাগুলি আমার মনে জাগলো তাই বললাম। আপনাদের বিপদ আসন্ন, তবে কি রকম বিপদে আপনারা পড়বেন তা আমি জানিনা। তা বিপদ যে রকমই হোক তার আগেই আপনারা জায়গা বদলে ফেলুন। দুশো-পাঁচশো মাইল দূরে চলে গেলে আপনারা তান্ত্রিকের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব থেকে হয়তো মুক্ত হতে পারবেন। তারপর সেখানেও যদি তেমন উৎপাত সুরু হয়, তখন সে স্থানও সহসা ছেড়ে চলে যাবেন।

ডেভিড বললো—তার মানে সারাজীবন শুধু পালিয়ে বেড়াতে হবে ?

—এছাড়া আমি আর তো কোন উপায় দেখি না। তবে যদি কোনদিন কোন ভাল সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পান, তিনি হয়তো আপনাদেরকে আত্মরক্ষার কোন রকম ব্যবস্থা করে দিতে পারেন···যাক্ আমায় এখানেই নামিয়ে দিন, আমি বালিগঞ্জে যাব।

—বেশ চলুন, আমরা না হয় আপনাকে আপনার বাড়ী পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসি—বলে সরোজ মোটরের মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললে—না, আমি তা পছন্দ করিনে, আপনাদের দেখে আমার যা মনে হলো, বললাম। আপনারা আমার কথামত সাবধান হতে চান, হবেন। সেজন্য আমায় কৃতজ্ঞতা জানাতে, কি আমার সঙ্গে স্থায়ী পরিচয় রাখতে হবে, তার কোন মানে নেই, তা আমি চাইও না। আমি চাই আমাদের দশ মিনিটের আলাপ দশ মিনিটেই ফুরিয়ে যাক্, তা দিনের পর দিন ধরে টেনে নিয়ে যাবার কোন দরকারই নেই।

— অবশ্য আপনি যদি আলাপ রাখতে না চান······

—দেখুন,—বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে—অনেক লোককে আমি পথেঘাটে অনেক কথা বলি, তারা সকলে যদি আলাপ জমিয়ে আমার বাড়ী আসতে সুরু করে, তাহলে আমার নিজের কাজকর্ম কিছুই হবে না।

—আপনি কি করেন ?

—চাকরী।

—কেন, আপনি এই বিদ্যের জোরে তো অনেক পয়সা কামাতে পারেন ?

—সে উপায় নেই। যে সাধু এই বিদ্যা আমায় শিখিয়েছিলেন তিনি বলে দিয়েছেন যে কারও কাছ থেকে টাকা-পয়সা কিছু নিলেই বিদ্যা নষ্ট হবে। তাছাড়া সকলের উপকারের জন্য এই বিদ্যা শিখেছি, লোকের বিপদ আসছে জেনেও যদি তাকে না সাবধান করি, তাহলে তো বিদ্যার দাম কিছুই রইল না ! টাকা দিয়েই কি দুনিয়ার সব জিনিষ কেনা বেচা হবে ? যাক্ সে কথা, মোটর থামান, আমি নামি।

সরোজ ব্রেক কষ্‌লো, ভদ্রলোক নেমে গেল।

লোকটী চলে গেল বটে কিন্তু এই অল্পক্ষণের সামান্য আলাপে সকলের মনে রেখাপাত করে গেল। সে রাত্রে আবার আগের মত দুঃস্বপ্ন দেখবার পর

বিনয়বাবু বললেন—আর কলকাতায় থাকবো না। আমি কালই এখান থেকে চললাম।

—ওই অচেনা ভদ্রলোকের কথা শুনেই কাজ করবেন? বাইরে গিয়ে যদি আবার নতুন কোন বিপদের সৃষ্টি হয়?—ডেভিড বললো।

—তা হোক্‌ কিন্তু এখানে আমি আর থাকতে পারছিনে।

—কোথায় যাবেন?

—দিনকয়েক পুরীতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাস করবো মনে করেছি।

—বেশ, চলুন, আমরা তাহলে সকলেই যাই।

পরদিন সন্ধ্যায় বিনয়বাবুর বাড়ীতে তালা পড়লো।

পুরীর সমুদ্রতট। আধখানা চাঁদের মত তটরেখা ঘিরে সমুদ্র আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে ধরণীর ধূসর বালুচর আরেক-দিকে নীল চঞ্চল জলরাশি দিগ্বলয়ের ক্ষীণ রেখায় দূরে নীল আকাশের গায়ে গিয়ে পেঁৗছেচে। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ বারে বারে লুটিয়ে পড়ছে, তটরেখার বুকে শাদা ফেনার রাশি ছড়িয়ে পড়ছে, জগন্নাথের উদ্দেশে সাগর-কন্যারা তাদের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছে যেন। নীলাম্বুরাশির অসীমতা, তরঙ্গের কলরব, ঊর্মির খেলা, চিক্‌মিকে চাঁদের আলো, বিবর্ণ মেঘের মায়া, ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাসের দমকা খেলা মানুষকে মুগ্ধ করে, মনকে টেনে নিয়ে যায় রূপকথার কোন নিরুদ্দেশে। কর্মব্যস্ত নগরের অর্থের কোলাহল মনের কোণ থেকে মুছে যায়। মানুষ ভুলে যায় পিছনে কি ফেলে এসেছে। মন ডুবে যেতে চায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের বুকে, বাঁশীর সুরের মতো নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় নীলাম্বুর মৃদু কলরোলের মাঝে। যিনি জগতের এই অনন্ত সৌন্দর্যকে এমনভাবে রূপে রূপে সুষমামণ্ডিত করে চলেছেন, তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন তাঁকে একবার দেখার জন্য মন উদাস হয়ে ওঠে।

সরোজ, ডেভিড, বিনয়বাবু, রবিদত্ত ও ডাক্তার রায় কারও কাছেই সমুদ্র নতুন নয়। কিন্তু তাই বলে সমুদ্র তো পুরানো হবারও নয়, যতই দেখা যায় ততই মায়াময়, চির-নতুন।

সারা দিনরাত সাগর-তটে বসে থাকলেও তৃপ্তি নেই।

সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সহসা রাতদুপুরে একটি তীক্ষ্ম ধারালো চীৎকার সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।

অদ্ভুত বিকট চীৎকার! উঠছে, পড়ছে, আবার তীব্রতম হয়ে কানে এসে বিঁধছে।

বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানার উপর উঠে বসলো, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ঘরের দরজা খুলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল।

ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—বিনয়দা! বিনয়দা!!

সরোজ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। পিস্তলটা বালিশের নীচে থেকে টেনে নিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সামনে অসীম নীল জলরাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, অবিরাম গর্জায়মান তরঙ্গ বালুতটে এসে আঘাত করছে। সেই তটভূমির সীমা রেখায় যেখানে ফেনার পর ফেনার রাশি চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠছে, তারই পাশ দিয়ে এক দীর্ঘদেহী জটাজুটধারী পুরুষ তাদের

হোটেলের পানে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে লোকটির পানে তাকিয়ে সরোজ ডাকলো—ডেভিড, চট্ করে এসো দিকি, দেখতো সেই অশ্বত্থামা কিনা ?

ডেভিড তখনও ব্যাপারটা ভাল বোঝেনি, স্বপ্নাবিষ্টের মতো বিছানার উপর বসেছিল, সরোজের ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার আগেই সরোজের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠলো।

ডেভিড বাইরে এসে দেখলো : একটি লোক ধীরে ধীরে সাগরের জলে নেমে যাচ্ছে। লোকটি একেবারে জলের নিচে তলিয়ে যাবার আগে একটা তীক্ষ্ম হাসি হেসে তাদের চমকে দিয়ে গেল।

ঠিক পর মুহূর্তেই নিচের দরজা দিয়ে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় পথে বেরুলো। সরোজ উপর থেকে চীৎকার করে ডাকলো—বিনয়দা ! ডক্টর রায় !!

নাম শুনে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় মুখ তুলে উপর দিকে তাকিয়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—বিনয়দা, ডক্টর রায়, আমি ডেভিড আপনাদেরকে ডাকছি।

—ডেভিড!

—হ্যাঁ, আমি ডেভিড। আপনারা দু'জনে ওপরে উঠে আসুন।

এবার যেন বিনয়বাবুর তন্দ্রা কেটে গেল, 'হ্যাঁ যাই' বলে ডাক্তার রায়ের হাত ধরে তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন।

সরোজ বললে—ওই অশ্বত্থামা, না?

—কে? যে জলে ডুবে গেল? ও সেই অশ্বত্থামা? সেই তান্ত্রিকটা? এর মধ্যে এখানে এসে জুটেছে?—ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো।

—তাই তো দেখলাম। দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ-দুটী জ্বলছে বাঘের মতো।

—তুমি ঠিক দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—সমুদ্রে নেমে গেল কোথায়?

—কোথায় গিয়ে উঠবে কি করে বলি, তবে ডুবে যাবার লোক সে নয়, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

ডেভিডের মুখে চিন্তা দেখা দিল, বললো—আজ সবেমাত্র আমরা এখানে এসেছি, এরই মাধ্য সে এলো কেমন করে?

—আমিও তাই ভাবছি। গুলি করেছিলুম কিন্তু গুলি লেগেছে কিনা জানি না। খানিকক্ষণ দেখি যদি জল থেকে ওঠে তো এখানেই শেষ করে দোব।

—তোমার কি মনে হয় সে এখানে আবার উঠবে।

—উঁহু।

—আমারও তাই বিশ্বাস।

বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—বিনয়দা, ব্যাপার কি? হঠাৎ আপনারা দু'জনে নিচে ছুটে গেলেন কেন?

বিনয়বাবু শূন্যদৃষ্টিতে সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। যেন কি ভুলে গেছেন, মনে করার চেষ্টা করছেন। পরে বললেন—কি জানি, কিছু তো বুঝলাম না, মনে হলো যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের টানে কোথায় উড়ে যাচ্ছি, কোন জ্ঞান ছিল না। যখন তোমার ডাক কানে গেল, তখন দেখি আমি নিচে দাঁড়িয়ে আছি।

কথাগুলি বিনয়বাবু আস্তে আস্তে এমনভাবে বললেন, যেন বহুদূর থেকে তিনি কথা বলছেন।

সে রাত্রে আর কারও ঘুম হলো না।

রাত্রির অন্ধকারের রহস্য ডুবিয়ে দিয়ে ঊষার আলো নিয়ে এলো সাহসের বাণী, জীবনের সজীবতা। যে প্রান্তর এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল, সেই তেপান্তরের মাঠে কে যেন বাঁশীর সুর দিল, সাগর-দেবতা তার জলের পটে কত রঙের রেখা ফেললো, কিন্তু রবির চোখ রাঙানিতে সব রং মিলিয়ে গেল, কিছুই শেষ পর্যন্ত রোদের ঝিলিমিলিতে টিকলো না, মেঘের পর্দা চেষ্টা করলো তাদের আড়াল করে রাখার জন্য কিন্তু পারলো না, সব ছাপিয়ে সূর্য উঠলো।

বারান্দা থেকে বিনয়বাবু এই রঙের খেলার পানে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছু দেখছিলেন বলে মনে হয় না, মন তাঁর কোথায় পড়েছিল। এক সময় বলে উঠলেন—তাইতো, এখানেও এমনি হলো! দেখ সরোজ, আমি কোথায় যাই বলত? কি করি? রাত্রিতে এমন করে কে ডাকলে? কোথায় চলে যাচ্ছিলাম? এতদূরে এলাম, তবু এই!

ডাক্তার রায় বললো—শুধু আপনার একার দুঃখই তো নয়, আমিও রয়েছি আপনার সাথী। একবার যখন 'নিশি' ডেকেছে তখন আবার ডাকবে, এবার রক্ষে পেয়েছি বলে যে এর পরের বারেও রক্ষে পাব তার কোন মানে নেই। আমি কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকবো না। এখানেও যখন সে আমাকে ছাড়েনি, দেখি কতদূরে সে আমার পিছু নেয়। এখান থেকে যাবো বোম্বাই, বোম্বে থেকে রোম, রোম থেকে মস্কো, মস্কো থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক, দেখি ওই অশ্বত্থামা কি করে আমার পিছনে যায়, ওদেশে একবার ওকে দেখলে হয় তখনি জেলখানায় পাঠাবো।

বিনয়বাবু চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন—ঠিক বলেছ ডাক্তার, আমিও যাব তোমার সঙ্গে, আজই যাব।

ডেভিড বললে—আজই যাবেন কেন, দু-একদিন দেখুন, এর মধ্যে যদি সে আবার আসে তাহলেই কেল্লা ফতে।

—না, আমি আর এখানে একদিনও থাকবো না।

—কিন্তু আমরা যে একবার কোনারক আর ভুবনেশ্বর দেখে যাব মনে করেছিলুম।

—কোনারক সে তো অনেক দূরে।

—মাত্র চুয়ান্ন মাইল, মোটরে পৌঁছাতে তিনঘণ্টা লাগবে, ফিরে আসতে তিনঘণ্টা, আর দেখতে ঘণ্টা তিনেক—এই মোট ন'ঘণ্টার ব্যাপার।

—তার মানে আজকের দিন শেষ। তারপর আবার ভুবনেশ্বর দেখবে তো?

ভুবনেশ্বর তো যাবার পথেই পড়বে, কিন্তু কোনারক না দেখলে হয়তো আর দেখার সুযোগ নাও আসতে পারে। অতো প্রাচীন এক সূর্য মন্দির, স্থাপত্য আর কারুকার্যের খ্যাতি শুনে যা দেখতে সুদূর য়ুরোপ থেকেও কত লোক আসে, আর আমরা এখানকার লোক হয়ে দেখবো না? তারপর যাবার পথে যদি ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি না দেখি, তাহলে তো উড়িষ্যার

শিল্প-কলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো না, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা জানতে হলে উদয়গিরি, রাজা-রানীর মন্দির, এসব দেখতেই হবে।

—ও সব কিছু দেখবো না, আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই বোম্বে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়বো।

বিনয়বাবুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

মালাবার হিলস্, বোম্বের শ্রেষ্ঠ পল্লী। আরব সাগরের উত্তাল ঢেউগুলিকে ঈর্ষা করে বোম্বের সমতল ভূমি যেন সহসা ফুলে উঠে মালাবার পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঢেউগুলি সেই পাহাড়ের চরণতলে এসে আঘাতের পর আঘাত করছে, চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে চারিপাশে কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ছে, প্রস্তরীভূত মাটি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। চৌপাঠির পাশ দিয়ে সাগর-সৈকতের একটি গাঢ় কৃষ্ণ রেখা সাগর ও ধরণীকে তফাৎ করে দিয়েছে। সেই রেখাটিকেই চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে দেবার জন্য শাদা শাদা ফেনার পুঞ্জ সৈকতের বুকে এসে জমা হচ্ছে। সামনে শুধু জল আর জল—বহুদূরে যেন কুহেলী ঢাকা মেঘের মাঝে সেই জলরাশি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে। সেই নীল পর্দার সীমান্তে কয়েকটা জাহাজের আলো আর একটা বাতি জ্বলছে। সেই পশ্চাদ্‌পটে রঙীন আলোছায়ার মিলে বোম্বের মায়াপুরী। নেহেরু পার্কের অপরূপ সুষমাকে বসে বসে নিরীক্ষণ করলে জীবনের প্রতি মুহূর্তটীকে ভাল করে অনুভব করা যায়, নিজেকে হারিয়ে মন ছুটে যায় সুদূরের সন্ধানে। নেতাজী সড়কের উপর উজ্জ্বল সুন্দরী নগরী মাথার উপর মেঘলা আকাশ, একপাশে মালাবার পাহাড়ের গায়ে রঙীন পুষ্পোদ্যান, সামনের অনন্ত জলরাশি, সব ফেলে মন উধাও হয়ে যায় এই রূপস্রষ্টার খোঁজে।

সমুদ্র থেকে একটু তফাতে বিখ্যাত একটি হোটেলে পাঁচটি বন্ধু এসে উঠেছে।

কোথায় পুরী আর কোথায় বোম্বাই। বঙ্গোপসাগরের তট থেকে একেবারে আরব সাগরের তটভূমি। এতদূরে নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা তাদের পিছনে ছুটে আসেনি. এখানে তবু কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘুমোতে পারবে, এই ভেবে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। তখন তারা কেউ জানতো না যে, সেই রাত্রেই এই চিরচেনা পুরানো ভারতভূমি ছেড়ে, বোম্বাইয়ের উপকুল ত্যাগ করে, তাদেরকে বহুদূরে চলে যেতে হবে।

রাত তিনটে হবে।

অতবড় হোটেল মৃতের মত স্তব্ধ। আলোর মালা কখন নিভে গেছে, প্রাসাদের ঘরে ঘরে জমেছে ঘন অন্ধকার। মানুষের সোরগোল, জামা-কাপড়ের খস্‌খসানি, 'বয়ের' ছুটোছুটি, বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে ঝলমলে হাসি, চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য—সব ঢাকা দিয়ে রাত্রির অন্ধকার স্তব্ধ প্রহরীর মতো

তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিলাসের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতার অশান্তি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, অন্তরের দৈন্যকে ঢেকে রাখার জন্য বাহিরের চাকচিক্য, জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে পরমেশ্বরের কাছ থেকে কত নিচে, সত্য ন্যায় ও প্রেম থেকে কতদূরে টেনে এনেছে তাই দেখে সাগর উত্তাল হয়ে উঠেছে, ধরিত্রীর কোলে আছড়ে পড়ছে, কেঁদে বলছে বুঝি—ওরে তোরা পিছনের পানে দেখ্, তোরা মানুষ! ভগবানকে উপলব্ধি কর! ওরে নির্বোধ, সামনের পানে কোথায় চলেছিস্? ওসব মিথ্যা!—মিথ্যা!—মিথ্যা!

সাগরের এই ক্রন্দন কলরোল শুনে মৃত্তিকা-মা রাত্রির অন্ধকারের আঁচলে মুখ ঢেকেছেন।

সহসা কি যেন কারণে সরোজের ঘুম ভেঙে গেল, মনে হলো যেন ঘরের মধ্যে দিয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে। ভাল করে সরোজ তাকালো—দুটো জ্বলজ্বলে চোখ, শাদা পাকা দাড়ী, মাথায় জটা, দীর্ঘ দেহ···

কে যেন সরোজের দেহের ও মনের সবটুকু শক্তি অপহরণ করে নিলে।

সহসা ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—শয়তান! শয়তান!

—মৌনী ভব!—ঘরের মধ্যে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

ডেভিডের গলা থেকে আর স্বর বেরুলো না।

উজ্জ্বল একজোড়া চোখ ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেল। ভিতরের লোকগুলি তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত পঙ্গু।

কতক্ষণে যে তারা সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে নামলো তা তারা জানে না,—পাঁচ মিনিট হতে পারে আবার একঘণ্টাও হতে পারে। আলো জ্বেলে দেখে···দুটো বিছানা খালি, বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় নেই। পিস্তল নিয়ে তিনজনে নিচে নামলো, পথের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করলো, কিন্তু কিছুই হলো না। বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায় যেন বাতাসে উবে গেছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একখানি মালবাহী জাহাজ বোম্বাইয়ের উপকূল থেকে ছাড়লো।

সামনের অসীম নীল জলের বুকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে, আকাশের নীলিমা ও সাগরের নীলাম্বু কোথায় যে মিশে এক হয়ে গেছে আর বোঝা যায় না। উপরে মিট্‌মিটে তারাগুলো দূরে বন্দরের আলোর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। ডেকের উপর থেকে এক যুবক সেই স্তিমিত আলোর পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—জন্মভূমির শেষ প্রান্তের শেষ আলোগুলি তার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে,—ওই তার জন্মভূমি! কয়েকটা টাকার লোভ দেখিয়ে এই জাহাজখানি জন্মভূমির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ছুটি নেই। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দূরত্ব বাড়বে, এই সমুদ্রের ব্যবধান হয়ে পড়বে অসীম। কয়েকটা রুপার চাক্‌তি দেশের প্রতি তার

আকর্ষণটুকু কিনে নিয়েছে, সে মায়া টাকার মূল্যে বিক্রী হয়ে গেছে। জলের বুকে এই জাহাজখানিই তার কাছে এখন সব। দশ বছরের কনট্রাক্টের এখনও ছ'বছর বাকি। এই ছ'বছর সমুদ্রের ঝড়-ঝাপ্‌টা ও উত্তাল তরঙ্গের আঘাত সহেও যদি সে বাঁচে, তখন তার ছুটি মিলবে। ভারতের সবুজ মাটির বুকে ফিরে আসবে, তার ঘরের পাশে গাছের শাখায় সবুজ পাতার কোলে লাল নীল শাদা ফুল ফুটবে, মেঘমেদুর বর্ষার দিনে টুপটাপ করে পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়বে, মাটীর বুক থেকে একটা ভিজে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসবে, সবুজ ঘাসের বুকে পায়ের পর পা ফেলে বট-অশথের ছায়ায়-ছায়ায় সে ঘুরে বেড়াবে, জ্যোৎস্না রাতে ভেসে যাওয়া মেঘের পানে তাকিয়ে ঝিরঝিরে দক্ষিণা হাওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বে—সেখানে ঝড়ের রাত্রে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে জাহাজ টল্‌মল্‌ করবে না, ওয়ারলেসের হেডফোন কানে আটকে বিপদের সঙ্কেত শুনতে হবে না। ডিউটির তাড়া নেই, ক্যাপ্‌টেনের হুকুম নেই,—জীবনটা বেশ সহজ হবে।

যুবক বোম্বাইয়ের ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসা আলোগুলির পানে তাকিয়ে গুন গুন করে গান ধরলো—

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি··
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপ [illegible] ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে······
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পিছনে আরেকটি যুবক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সহসা সে কথা বলে প্রথম যুবকটীকে চমকে দিলে। ইংরেজীতে বললে—হ্যালো, অনিল বাবু, দেশ ছাড়তে দুঃখ হচ্ছে,—না?

—না, মিস্টার জোনস,—অনিল বললে—দেশের জন্যে খুব বেশী দুঃখ হয় না, বেঁচে থাকলে একদিন ফিরে তো আসবই। দুঃখ হয় মায়ের জন্য। বাবা কবে মারা গেছেন এখন আর ভাল মনেও পড়ে না, মা-ই ছিলেন আমার জীবনে সব। মা যখন মারা গেলেন, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে জাহাজে চাকরী নিয়ে তখন ইউরোপের সমুদ্র-উপকূলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, শেষ দেখাও হলো না। খবর যখন পেলাম, তখন যে হিন্দু-প্রথা মত অশৌচ পালন করে মাকে একটু শ্রদ্ধা জানাব—চাকরীর জন্য তা'ও হলো না, চাকরীটাই বড় হলো।—

জোন্‌স্‌ বললে—আচ্ছা অনিলবাবু, আপনি তো একা, আপনি এমন

চাকরী করছেন কেন? আপনাদের দেশে খাওয়া-পরা তো খুব সস্তা বলে শুনি, দশ টাকা হলেই একটা লোকের বেশ চলে যায়।* আপনি একা লোক, এই ক'বছরে উপায় তো যথেষ্ট করেছেন, দেশে আপনার জমিজমাও আছে; বেশী টাকায় আপনার দরকার কি?

-টাকার দরকার আছে মিস্টার জোন্‌স। আমার আরেক মা আছেন, তাঁর জন্য টাকা জমাচ্ছি। আর জমিজমা যা বললে সাহেব, তা থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। যারা সে জমিতে আবাদ করে তাদের বছরে ছ'মাস খাবার জোটে না, ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে তারা মরে বেঁচে আছে, তাদের উপরে জুলুম করে টাকা আদায় করতে আমি পারি না—চাইও না।

মিস্টার জোন্‌স্‌ খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে—আর একজন মা আছে, সে কি আপনার সৎমা?

—সৎমা নয় সাহেব, সে-ই আমার বড়মা, —আমার দেশ, আমার জন্মভূমি —The country of beggars!* আমার সব ভিখারী-ভাইদের জন্য টাকা জমাচ্ছি, সুবিধামত তাদের সেবায় লাগিয়ে দেওয়া যাবে—অনিল হাসলো।

জোন্‌স্‌ বললে—বাবু, তোমার দেশকে তুমি ভালবাস!

—দেশকে ভালবাসি না সাহেব, ভালবাসি গরীব-দুঃখীদের, দুনিয়ার সব গরীব-দুঃখীরা আমার ভাই, আমার ভগবান; আমাদের ধর্মে বলে—দরিদ্র নারায়ণ।

—তুমি অদ্ভুত মানুষ, অনিলবাবু—জোন্‌স্‌ বললে—তোমার সঙ্গে যতই আমার পরিচয় হচ্ছে ততই অবাক হচ্ছি। বাক্‌, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।

কী, মিস্টার জোন্‌স্‌?

—আজকের কাগজ দেখেছ? এই খবরটা পড়েছ? বলে জোন্‌স্‌ সেদিনকার বোম্বে ক্রনিক্‌লের একখানি পাতা অনিলের চোখের সামনে তুলে ধরলো। ছোট ক' লাইন খবর:

পাঁচ-শো টাকা পুরস্কার

বোম্বায়ের বিখ্যাত তাজমহল হোটেল থেকে দু'জন ভদ্রলোক সহসা গতকাল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, কে বা কাহারা কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য তাঁদের হরণ করে নিয়ে গেছে। যদি কোন লোক তাঁদের সন্ধান দিতে পারেন, তাহলে তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। একজনের সন্ধান দিতে পারলেও

* ১৯৩৬ সালের কথা। বিখ্যাত জাপানী কবি 'ইয়োন্‌ নগুচি' এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। এদেশের দারিদ্র্য দেখে তিনি লিখেছিলেন—'Country of beggars'— ভিখারীর দেশ!

আড়াই শো টাকা পাবেন। নিচে দু'জনের ফটো দেওয়া হলো। সন্ধান দেবার ঠিকানা ঃ সরোজকুমার সেন, তাজমহল হোটেল, বোম্বাই।

খবরটা পড়ে অনিল জিজ্ঞাসা করলো—দেখলাম, কেন এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?

—এই প্রাইজের টাকাটা আমি নোব। ওই লোক দুটো আমাদের এই জাহাজেই আছে।

অনিল বিস্ময়ে জোন্‌সের মুখের পানে তাকালো।

জোন্‌স্‌ বললে—কাল রাত্রে হঠাৎ মাথাটা ধরে ওঠে, ডেকে খানিকক্ষণ বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় মনে হলো কারা যেন কথা বলছে, অথচ দেখলাম ডেকের উপরে আমি ছাড়া কেউ নেই তবু কথাটা কানে আসছে। সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম সেখানেও কেউ নেই, তবু গলার স্বরটা আগের চেয়ে স্পষ্ট বলে মনে হলো। কেমন যেন সন্দেহ হলো সিঁড়ির নিচের দরজাটা দেখি চাবি দেওয়া, তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, তবে ভিতরে যে দুটি লোক কথা বলছে তা বুঝতে দেরী হলো না। ঠিক সেই সময় সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলাম। তারপর আজ দুপুরে সুবিধা বুঝে আরেকবার উঁকি মে দেখেছি। সত্যি দু'জন লোক ওই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

—বল কি?

—সত্যি। চল তোমায় দেখাচ্ছি।

—চল,—অনিল উঠে দাঁড়ালো।

ডেক থেকে দু'জন নেমে এলো। সিঁড়ির নিচে একটা ছোট চোরা-দরজায় একটা তালা লাগানো আছে, ঠেলে ধরতেই একটু ফাঁক হয়েকলো, তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল দুটো লোকের শাদা পরিচ্ছদের অস্পষ্ট আভাস কাছে

অনিল বললে—ওই দু'জন?

—হ্যাঁ।

—শুল্ক বিভাগের লোকেরা ধরে নি?

—হয়তো টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। ঘুষ দিয়ে ভগবানকেও বশ করা যায়, আর এ তো সামান্য!

—না, একেবারে সামান্য নয়!

পিছনে জলদ্‌গম্ভীর স্বরে কথাগুলি শোনা গেল, দু'জন চমকে উঠে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখে এক দীর্ঘ-দেহী সন্ন্যাসী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। অমন লম্বা লোক যে থাকতে পারে চোখে দেখলেও তা বিশ্বাস করা যায় না, মুখের কথা হারিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী বললো—তোমরা পাপ করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদেরকে করতে হবে, এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় যাব?—জোন্‌স্‌ বললো।

হাহা করে সন্ন্যাসী হেসে উঠলো, আদেশের স্বরে বললো—এসো !

কথাটার এমনি শক্তি যে তারা আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, আজ্ঞাবাহী চাকরের মত দু'জন তার পিছু পিছু চললো। মনে হলো, কে যেন তাদের দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের কেবিন। সন্ন্যাসী সেই কেবিনের আলোর নিচে এসে যখন দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলো—কী ব্যাপার সাধুজী ?

—আপনার এই দু'জন কর্মচারী আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছে। এদের একটা বিহিত করুন।

—কি করবো ?

—সাজা দিন !

—সাজা ?—ক্যাপ্টেন একটু ইতস্ততঃ করলো।

—হ্যাঁ, সাজা !—বলে সন্ন্যাসী ক্যাপ্টেনের পানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো। হিপ্নোটিস্টের সেই ধারালো চোখের সামনে ক্যাপ্টেনের মত বদলে গেল। বললে—অল্ রাইট্ ! হাঁক দিলে—খালাসী !

—হুজুর !

জন কয়েক খালাসী এসে তখনই দরজার সামনে জড়ো হলো, আদেশ শুনার অপেক্ষায় তটস্থ হয়ে দাঁড়ালো।

—এই কালো নিগারকো পাকড়ো—ক্যাপ্টেন অনিলকে দেখিয়ে দিলে।

অনিল রুখে দাঁড়ালো, হাত পা নেড়ে শাসিয়ে বললে—খবর্দার ক্যাপটেন !

ক্যাপ্টেন ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে খালাসীদের ধমকে উঠলো—জল্দি এ কুত্তাকো পাকড়ো !

অনিল চীৎকার করে উঠলো—Shut up you red monkey !

—কী ! কি বললো !!—ক্যাপ্টেন ঘুসি বাগিয়ে অনিলের দিকে এগিয়ে এলো।

জোন্স্ তাড়াতাড়ি দু'জনের মাঝে এসে পড়লো• বললে—ক্যাপ্টেন, তুমি পাগল হলে নাকি ? এ যে তোমার অধীনে চাকরী করে……।

—ওকে আমি খুন করবো, ও আমাকে অপমান করেছে,—আমি জার্মান, আমি পরাধীন দেশের কালো কুত্তার অপমান সইব !

- বটে ! তোমরা মানুষ গুম করে রাখবে আর আমি জানলে হবে আমার দোষ !—অনিল বললে।

—নিশ্চয়ই ! আর সেই দোষের জন্য আমি তোমায় পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারবো—বলে ক্যাপ্টেন ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে অনিলকে গুলি করলো।

গুলি খেয়ে অনিল পড়ে গেল, পাঁজরের একটি জায়গা থেকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটে জামাটা লাল করে দিলে।

—কি করলে ক্যাপ্‌টেন—কি করলে !—জোন্‌স্‌ ব্যাকুলভাবে বন্ধুর পাশে বসে পড়লো।

ক্যাপ্‌টেন হেসে উঠলো, বললে—ঠিক করেছি। কালা ব্ল্যাক নিগারকে যোগ্য সাজা দিয়েছি !—খালাসী, ইস্‌কো দরিয়ামে ফিকো—

খালাসীরা আহত অনিলকে জলে ফেলতে ইতস্ততঃ করছে দেখে ক্যাপ্‌টেন গর্জে উঠলো—শীগ্‌গির ওকে জলে ফেলে দাও, না হলে তোমাদেরকেও আমি কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

প্রাণের দায়ে খালাসীরা অনিলকে সেই অবস্থাতেই সমুদ্রে ফেলে দেবার উদ্যোগ করলো, জোন্‌স্‌ বাধা দিল, কিন্তু চারজন জোয়ান খালাসীর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ! অনিলের আহত মূর্ছিতপ্রায় দেহটা ডেকের উপর থেকে তারা জলে ফেলে দিলে, রাত্রির অন্ধকারে কালো জলের বুকে সে দেহ তলিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী আবার বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকলো—ক্যাপ্‌টেন !

—কি ?

আরেক জনের শাস্তি ?

সন্ন্যাসী জোন্‌স্‌কে দেখিয়ে দিলে।

জোন্‌স্‌ সচকিত হয়ে উঠলো, বললে—আমি ?

সন্ন্যাসী কঠোর স্বরে বললে—হ্যাঁ তুমি !

ইলেক্‌ট্রিকের শক্‌ লাগার মতো জোন্‌স্‌ লাফিয়ে উঠলো, ছুটলো নিজের ঘরের দিকে।

ক্যাপ্‌টেন হাঁকলো—খালাসী, উসকো পাকড়ো—!

খালাসীরা ছুটে গিয়ে ধরার আগেই জোন্‌স্‌ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বেরিয়ে এল একহাতে একটা পিস্তল উঁচু করে ধরে। বললে—আমার কাছে যে আসবে তাকেই আমি খুন করবো, সাবধান !

খালাসীরা সরে দাঁড়ালো, তরতর করে জোন্‌স্‌ এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্‌টেনের সামনে। একহাতে বুকের জামার বোতামগুলো খুলে দিলে, বললে—আমি তৈরী, তুমি আমায় কি সাজা দেবে দাও, কিন্তু মনে রেখো তোমাকেও আমি সাজা দেব, আমার বন্ধুকে তুমি খুন করেছ, তুমি হত্যাকারী !

জোন্‌স্‌ও পিস্তল বাগিয়ে ধরে বললে—দেখি কোন্‌ খালাসী আমার গায়ে হাত দেয় !

খালাসীর কেউ এগিয়ে এলো না, কারোই গুলি খাবার ইচ্ছা ছিল না।

জোন্‌স্‌ বিদ্রূপের হাসি হেসে নিজের বেতার ঘরের দিকে চলে গেল, সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বলে গেল—শয়তানকে শায়েস্তা করতে আমি জানি !

বেতার ঘরের দরজা বন্ধ করে, কানে হেড্‌ফোনটা লাগিয়ে নিয়ে জোন্‌স্‌ ট্রান্‌স্‌মিটারের সামনে বসলো। সুরু হলো আঙুলের খেলা : টক্কা টরে···টরে টক্কা···টক্কা টক্কা টরে···টক্কা টরে টরে···

বোম্বাই জাহাজ-অফিসে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রে খবর এসে পৌঁছালো :

"—ওসেন্ কাইজার জাহাজ···আরব সাগর বোম্বে থেকে নিরুদ্দিষ্ট বাঙালী যুবক দু'জনকে দেখা গেছে, একটি ছোট ঘরের মধ্যে···এক সন্ন্যাসীর বন্দী···পরবর্তী বন্দর এডেনে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব।"

পরদিন সকালে ইম্পিরিয়াল-এয়ার-ওয়েজের পথে আরব সাগরের উপর দিয়ে একখানি যাত্রীবাহী প্লেন উড়ে যেতে দেখা গেল। তার ভিতরে আমাদের পরিচিত তিনটি মুখ, সরোজ, ডেভিড ও রবি দত্ত।

প্রায় দু'হাজার ফুট ওপর দিয়ে প্লেন ছুটছে। ক্ষুধার্ত ঈগল পাখীর মতো ধারালো গতি। মাথার উপরে অনন্ত আকাশ, পায়ের নিচে মখমলের মত জল। আকাশের আর জলের সীমায় চক্ররেখা। ওই মখমলের গভীরতার নিচে যে অসংখ্য ভয়াবহ হাঙর কুমীর অক্টোপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। নিঃসীমতার মধ্যে মনে জাগে শুধু অসহায় ভাব,—এই অনন্ত শূন্যের বুকে মানুষ কত একা! এই প্লেনখানি প্রকৃতির বুকে কত দুর্বল, একটা রূদ্র ঝড়ের ঝাপ্টায় এর উপর মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, চিরন্তন কালের বুকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এর ধ্বংসের খণ্ডকাহিনী।

এরোপ্লেন ছুটছে।

নিচে নীল ভেল্ভেটের উপর কালো ধোঁয়ার রেখা টেনে ছুটে চলেছে তিনখানি জাহাজ, উপর থেকে খেলাঘরের জাহাজ বলে ভুল হয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নীল আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্চে পেঁজা তুলার মতো, প্লেনের নিচে দিয়ে তারা ভেসে যাচ্ছে পিছনের দিকে। খণ্ড খণ্ড মেঘছড়ানো নীল আকাশ ও মখমলের মত সমুদ্র দিগ্বলয়ের একটা সরু কালো রেখাকে ঘিরে থম্ থম্ করছে,—এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই, জীবনের সাড়া নেই, এ যেন মৃত্যুপুরী। শুধু সজীব জগতের তিনটি মানুষ এরোপ্লেনের সাড়া তুলে ছুটে চলেছে বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, খেত-খামার ছাড়িয়ে অনন্তের দেশে, চারিদিকে ঘিরে ধরেছে শূন্য স্তব্ধতা।

বন্ বন্ করে প্রপেলার ঘুরছে, প্লেন ছুটছে—।

ক্রমে সমুদ্রের নীল আঁচল ফুরিয়ে ধূসর মাটির সীমা ফুটে উঠ্লো। সাগরের বিরাট নীলিমাকে সহসা যেন বালির পাঁচিল দিয়ে আটকে ফেলা হলো। সেই ধূসর বালির বুক চিরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি মাথা তুলেছে। সাগরের বিরাট দেহ দু'দিকের পাহাড়ের পীড়নে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সেই ক্ষীণ-দেহকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রুদ্ধ আক্রোশে আরব ও অ্যাবি-সিনিয়ার বুকে বার বার আঘাত করছে, কিন্তু পাহাড়ের পাষাণ সে আবেগে এতটুকু টলছে না। জলের বুকে শাদা-শাদা পাল তুলে নৌকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক একটা শাদা বকের মত। পালগুলি ফেনিল জলের বুকে যেন এক-একটা বড় বড় বুদ্বুদ। সেগুলোকে পিছনে ফেলে প্লেন এগিয়ে গেল; বন্দরের

পিছনে এক মাঠে এসে নামলো। মরুভূমি ধূসরতাকে মুছে ফেলার জন্য মাঠের বুকে সবুজ গাছপালা গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে আবার সেই ধূসর অনুর্বর মরুভূমি।

একটা নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির উপর এডেন সহর। বন্দর থেকে পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেছে। শেষে এক গিরিসঙ্কটের মুখে সহরে প্রবেশ করার দরজা, ফটক পার হলেই মাথাপিছু আট আনা পয়সা দিতে হবে। ফটকের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী সান্ত্রী, আর তার পিছন দিয়ে চলে গেছে কেল্লার পাঁচিল। লোকের বসতি এখানে যা আছে, তার চেয়েও বেশী আছে গুলি গোলা কামান আর যুদ্ধের নানা উপকরণ। ভারতে আসার পথে এটিকে একটা দরজা বললেই হয়, এখান থেকে মুক্তি না পেলে সহজে কারও ভারতে আসার উপায় নেই, তাই এই মরুভূমির বুকেও এতো জল-কষ্টেও ইংরেজদের এতো আয়োজন।

সহরের ভিতরটায় আর গাছপালা দেখার উপায় নেই। সমস্ত সহরটা পাষাণময়। আর সেই সহরের শোভা বৃদ্ধি করে উঁচু উঁচু পিঠ তুলে উট ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোঝা বইছে, গাড়ী টানছে, মানুষকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরছে। উঠ আর মরুভূমির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাড়ীর রঙও ধূসর করা হয়েছে। মাঝে মাঝে দু-একখানা ভিন্ন রঙের মোটর গাড়ী এই ধূসরতার ছন্দ ভেঙে দিচ্ছে।

আরবের সীমান্তে কেল্লাময় ছোট সহর এই এডেন, কিন্তু আরবের লম্বা চওড়া সুপুরুষ বেদুইন এখানে দেখা যায় না দেখা যায় কালো কালো সাধারণ লোক, দিব্যি আরামে বসে বসে গড়গড়া টানছে।

অমন সহরে থাকতে কার আর ভাল লাগে, কিন্তু না থেকেও তো উপায় নেই. এখনও 'ওসেন কাইজার' জাহাজ এসে বন্দরে লাগতে দু'দিন দেরী, এই দু'দিন এখানে থাকতে হবেই।

হোটেলের গাইড এসে ধরলো, সহর দেখাবে ঃ

প্রথমে নিয়ে গেল জলের চৌবাচ্চা দেখাতে। পাহাড়ের গা ধরে একটি ঝর্ণা নেমে আসছে, তার জলকে বেঁধে রাখার জন্য এক বিরাট চৌবাচ্চা, তার নীচে ঢালু পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় চৌবাচ্চা, তার নীচে তৃতীয়…পর পর শুধু চৌবাচ্চার সারি নেমে এসেছে। প্রথম চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে উপচে পড়ে দ্বিতীয় চৌবাচ্চা ভর্তি করে, তারপরে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ… এমনিভাবেই চলে। এই জল সমগ্র সহরের প্রাণ। জলহীন দেশে এই জলের চৌবাচ্চাই একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। বাংলার বন্যার জলে ডুবুডুবু গাঁ, ভাদ্রের দুকুল-প্লাবি নদী, পাড় ডোবানো পানাভরা পুকুর দেখে দেখে যারা অভ্যস্ত, তাদের চোখে এই জলভরা চৌবাচ্চা সুন্দর হয়ে ধরা দেয় না।

গাইড্ বললে—চলুন মিউজিয়ামে।

সরোজ বললে—না আজ থাক, আরেক দিন হবে।

চৌবাচ্চার পর মিউজিয়াম দেখার আগ্রহ আর থাকে না।

দ্ব্দিন পরে 'ওসেন কাইজার' বন্দরে এসে নোঙর করলো।

ডেভিড, সরোজ ও রবি দত্ত জল-পুলিশের নৌকায় প্রতীক্ষা করছিল, ক'মিনিটের মধ্যেই জাহাজে গিয়ে উঠলো। ক্যাপটেন কিছুই বললে না, প্রত্যেক জাহাজই বন্দরে ভিড়লে পুলিশের তল্লাস করার নিয়ম আছে। সমস্ত জাহাজখানি সকলে মিলে খুঁজলো কিন্তু বিনয়বাবু কি ডাক্তার রায়ের কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে কি কোন লোক মিথ্যা 'কেব্‌ল' করে তাদের খানিকটা হয়রাণি করলো?

ক্যাপ্‌টেন হাসলো, উপহাস করে বললে—আমরা ভারতবাসী নয় বাবু, যে টাকা ঘুষ নিয়ে জাহাজে করে মানুষ চালান দেব।

সরোজ জবাব দিলে—খুব সত্যি কথা! এই সেদিন পর্যন্ত আফ্রিকার হাজার হাজার নিগ্রোকে রাতারাতি লুঠ করে জাহাজে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসে য়ুরোপ আর আমেরিকার বাজারে আমরাই তো বিক্রী করেছি!*

—তাতে তাদের উপকারই হয়েছে, তারা লেখাপড়া শিখেছে, আজ মানুষ হয়েছে।

—নিশ্চয়! তোমরা তাদের যেভাবে মানুষ করেছ, তা 'টমকাকার কুটীর'** পড়লেই বেশ বুঝতে পারি!

—কালা আদ্‌মির সঙ্গে তর্ক করার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই,—বলে সাহেব গট্‌গট্‌ করে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকলো!

রাগে সরোজের মুখ লাল হয়ে উঠলো।

ভারাক্রান্ত মনে তিনবন্ধু জাহাজ থেকে নেমে আসছে, সহসা চাপা চীৎকার কানে এলো—এবার তোমায় গুলি করবো, ক্যাপ্‌টেন!

মুহূর্ত মধ্যে সকলে পিছু ফিরলো. : কেউ নেই, কে তবে কথা বললে?

সরোজ ডেভিডের পানে চাইল।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্‌টেন এসে পড়লো, বললে—আপনারা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

—কে একজন আপনাকে গুলি করতে চায় শুনলাম, তাই...

—ওঃ! ওসব বাজে!—ক্যাপ্‌টেন হেসেই উড়িয়ে দিলে।

—বাজে! বাজে মানে?—ক্যাপটেনের কথায় বাধা দিয়ে সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়ে উঠলো—এখান থেকে একবার বেরুতে পারলে, তোমায় আমি দেখে নেব।

---

* ক্রীতদাসের ব্যবসা কিছুদিন আগে পর্যন্ত য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান ব্যবসা ছিল। প্রথম ইংরাজ দাস-ব্যবসায়ী 'জন হকিন্‌স'কে রাণী এলিজাবেথ নাইট্‌ উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে আব্রাহাম্‌ লিন্‌কনের ঘোষণায় দাস প্রথার উচ্ছেদ হয়।

** বীচার স্টো লিখিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

সরোজ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কে ?

—আমি মিস্টার জোনস্, এই জাহাজের ওয়্যারলেশ্ অপারেটার···

ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ও একটা পাগল···ওর কথায় কান দেবেন না !

—বটে, আমি পাগল, তাই আমাকে অন্যায়ভাবে এখানে এমনি করে আটকে রেখেছ ! –সেই অদৃশ্য স্বর শোনা গেল।

ইনেসপেকটার ক্যাপ্‌টেনের মুখের পানে তাকালো।

ক্যাপ্‌টেন সহজ সুরেই বললে—আমি সত্যিই বলছি ও পাগল।

—হোক্ পাগল,—ইনেসপেক্টার বললে—পাগলকে তুমি আটকে রাখবে কেন ? তাকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

—তাই করবো—ক্যাপ্‌টেন বললো।

—মানুষটি কোথায় ?—সরোজ বললে।

ক্যাপ্‌টেন ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য বললে—দুর্দান্ত পাগল, আপনাদেরকে কামড়ে দিতে পারে।

—তা হোক্, তুমি তাকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো—ইনেস্‌পেক্টার বললো।

নিরুপায় ক্যাপ্‌টেন শেষে সিঁড়ির নীচে একটি গুপ্ত দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো, দরজা খোলা পেয়েই একটি যুবক এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলো, হাতে তার পিস্তল, উস্কো-খুস্কো চুল, রুক্ষ চেহারা, মলিন পোষাক। বাইরে এসেই বললে—কোথায় গেল ক্যাপ্‌টেন ? আমি তাকে কুকুরের মত গুলি করবো।

ছিট্‌কে সে ক্যাপ্‌টেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সরোজ তাকে ধরলো। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে জোনস্ বললো—আপনি হাত ছেড়ে দিন্ আমি একবার ক্যাপ্‌টেনকে দেখে নিই ! ও আমার বন্ধুকে খুন করেছে, আমি আজ তার শোধ নেব, ব্যাটা পাকা শয়তান !

—কি ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো, আমরা পুলিশের লোক—সরোজ বললে।

—আমার বন্ধুকে খুন করেছে মশাই, পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে,—উত্তেজিত কণ্ঠে জোনস্ বলতে লাগলো এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে টাকা ঘুস খেয়ে দুটো লোককে জাহাজে গুম্ করে রেখেছিল, আমরা জানতে পেরেছিলুম—এই আমাদের অপরাধ !

—সেই লোক দুটি কোথায় গেল ? —সরোজ জিজ্ঞাসা করলে।

—তা জানে এই ক্যাপ্‌টেন। জাহাজ বন্দরে ভেড়ার আগেই ও তাদের সরিয়ে দিয়েছে।

ইনস্‌পেক্টার তখনি ক্যাপ্‌টেন ও মেট দু'জনকে গ্রেপ্তার করলো।

কিন্তু তাদের মুখ থেকে কোন কথা বের করা গেল না। শেষে খালাসীদের একজনকে টাকার লোভ দেখাতে সে সব বলে ফেললে : জাহাজ বন্দরে ভেড়ার খানিক আগে একখানি স্টীমলঞ্চে সন্ন্যাসী ও তার লোক দু'জন পালিয়ে গেছে। এপারে ধরা পড়ার ভয় আছে। গেছে ওপারের দিকে।

এডেনের ওপার মানে আবিসিনিয়া।

খালাসীর কথা অন্ধকারে তবু খানিকটা আলো দেখিয়ে দিলে। ওপারে যাবার জন্য তারা একটি লঞ্চ ভাড়া করলো

বন্দরে নামা হলো না, কেন না তাহলেই পাসপোর্ট চাই, যুদ্ধের সময় আবিসিনিয়া যাবার পাসপোর্ট পাওয়া সহজ নয়, তাছাড়া সে জন্য সরোজরা আর দেরী করতে পারছিল না।

তাদের লঞ্চ গিয়ে ভিড়লো জিবুতি বন্দর থেকে অনেক দূরে।

সাগরতটের বালির সীমানা পার হয়ে গেল দু'পাঁচটা গাছপালা চোখে পড়ে, তার পিছনে বালির ধূসরতা আর পাহাড়ের প্রাচীর

একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে সরোজ, ডেভিড ও রবি দত্ত সমুদ্রের তটরেখা ধরে এগিয়ে চলে।

সন্ধ্যাবেলা তারা এক গ্রামে এসে পৌঁছাল। সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করতে গ্রামের ক'জন খবর দিলে—অমনি একটা লোককে দেখেছে বটে, দু'দিন আগে এক সন্ধ্যায় ওই পাহাড়টির দিকে সে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে দু'জন লোকও ছিল বটে। লোকটিকে দেখে তাদের ভয় হয়েছিল, অমন ধরণের লম্বা লোক তারা জীবনে দেখেনি···ইত্যাদি···

সরোজরা চললো সেই পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়টি খুব দূরে নয়, আশা ছিল সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাবে কিন্তু তা আর হলো না, তার অনেক আগে উঠলো ঝড় কোথাও এতটুকু আশ্রয় পাবার উপায় নেই, ফাঁকা প্রান্তর···তেপান্তরের মাঠ। উদ্দাম বাতাসের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। শোঁ শোঁ করে বাতাস ছুটছে, ধুলো বালি কাঁকরের কণাগুলো সেই বাতাসের মুখে ছুটে আসছে, আশেপাশে সামনে-পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে—দৃষ্টি চলে না, কানেও কিছু শোনা যায় না। এক-একটি ঝাপটায় রাশি রাশি ধুলো-বালি চোখে কানে নাকে এসে ঢুকছে, ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো গায়ে এসে বিঁধছে –অসহ্য ঝড়, ভয়াবহ। ঝড়ের দাপট ক্রমে ক্রমে বেড়েই চললো। একটি প্রচণ্ড আঘাতে তাদের মাটিতে ফেলে দিলে। আর উঠে দাঁড়াতে হলো না। দেখতে দেখতে কাপড়-জামার উপর বালি জমে উঠলো, বালিতে বালিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, চোখ খুলে চাইবার উপায় রইল না। ঝড়ের আঘাতে ধুলো-বালির অন্ধকার ধীরে ধীরে তাদের মন থেকে সব মুছে দিলে······

তেপান্তরের বালির নিচে চারটি মানুষ পড়ে রইল।

সরোজ চোখ খুলে দেখে আলাদিনের স্বপ্ন : আকাশের মত অসীম ধূসর বালির অনুর্বর প্রান্তর কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার মাঝে আরব্য উপন্যাসের মত জেগে উঠেছে চমৎকার নরম বিছানা, মৃদু আতরের গন্ধ, কয়েকটি সবুজ গাছের ঘর, চারিপাশে লতাপাতা আঁকা সৌখীন পর্দা। তেপান্তরের মরুর বুকে এ সে কোথায় এলো ?

এমন সময় একটি লোক ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার পরণে আজানুলম্বিত এক আলখাল্লা, মাথায় একটি ফিতে জড়ানো, গায়ের রংটা রোদে-পোড়া তামাটে, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায় লোকটি বেদুইন। ধীরে ধীরে সরোজের কাছে এসে নিরীক্ষণ করে সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে নিজের কাঁচা-পাকা দাড়িতে দু'বার হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ইংরাজীতেই জিজ্ঞাসা করলো — আপনার ঘুম ভেঙেছে ?

সরোজ বললে—হ্যাঁ। এটি বুঝি আপনার বাড়ী ?

—বাড়ী নয়, তাঁবু।

—আপনি ?

—বেদুইন আমার নাম শেখ্ ইস্‌মাইল। আমার লোকেরা আপনাকে ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড থেকে কুড়িয়ে এনেছে।

—শুধু আমায় কুড়িয়ে এনেছে ? আমার যে আরো তিনজন সঙ্গী ছিল ?

—সকলকেই আমরা এনেছি।

—তারা কোথায় আছে ?

—অন্য তাঁবুতে।

—তাদের সঙ্গে আমি দেখা করবো।

—না, তাদের সঙ্গে দেখা হবে না, তুমি এখন ঘুমোও।

—কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা না হলে তো আমার ঘুম হবে না।

—বন্দীদের মধ্যে পরস্পরের দেখা করার নিয়ম নেই।

—আমি তবে বন্দী ?

শেখ সে কথার কোন জবাব দিলে না, ধীর পদক্ষেপে তাঁবুর বাইরে চলে গেল। সরোজ চুপ করে বিছানার উপর পড়ে রইল। তাঁবুর বাইরে দৃষ্টি যাবার মত এতটুকু ফাঁক নেই। তাঁবুর গায়ে যেখানে একটু-আধটু জানালার মত কাটা আছে তা-ও সৌখীন সবুজ পর্দা দিয়ে ঘেরা। বাতাসের এক-একটা ঝাপটায় পর্দাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে, তারই ফাঁকে বাইরের মুক্ত আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে সরোজ ভাবছিল, তার তিনটি সঙ্গীকে এমনি আলাদা আলাদা তাঁবুতে রাখা হয়েছে, তারা বন্দী।

বন্দী! কথাটা মনে তোলাপাড়া করতে করতে সরোজ বিছানার উপর উঠে বসলো। তাঁবুর যে দরজা দিয়ে শেখ বেরিয়ে গিয়েছিল, বিছানা থেকে

নেমে সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, এক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলে পর্দাখানি। বন্দুকধারী এক বেদুইন যুবক সেলাম করে সরোজের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সরোজ একটু অপ্রস্তুত হলো, কিন্তু তখনি মনের ভাবটা গোপন করার জন্য, ইশারা করে জানলো,—খেতে চাই, খাবার—

পাহারাদার তখনি একজনকে ডেকে কি বলে দিলে, নিজে কিন্তু দরজা ছেড়ে একটুকু সরলো না। একটু পরেই সেই লোকটি খাবার নিয়ে এলো। সরোজের কিন্তু তখন খাবার ইচ্ছা ছিল না। অপরিচিত দেশের অজানা এক বেদুইনের তাঁবুতে সে বন্দী—এই কথাটি তার মনে বিঁধতে লাগলো। শুধু বন্দীটুকু ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেও পারছিল না। একা হলেও যা কোন ফিকির করা চলতো, কিন্তু ডেভিড আছে, আরো আছে দু'জন সঙ্গী, তাদের ফেলে তো পালানো চলে না।

খানিকক্ষণ সরোজ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। খাবার কথা তার মনেই রইল না।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরটা ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে উঠলো। কেউ একটা আলোও দিয়ে গেল না। শূন্যদৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সরোজ চুপ করে পড়ে রইল। বাইরের অন্ধকার সরোজের মনের মধ্যেও ঘনীভূত হয়ে উঠলো। এতটুকু মুক্তির আলো সে অন্ধকারে কোথাও দেখতে পেল না।

অনুপল, বিপল, দণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে, প্রহরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। সরোজের চোখে ঘুম নেই।

রাত তখন ঠিক কত হবে, কে জানে? সহসা রেশমী কাপড়ের একটা মৃদু খসখস্ শব্দ ও লঘু পদক্ষেপ সরোজকে সচকিত করে তুললো। এতো রাতে এমন চুপি চুপি কে তার ঘরে এলো, গুপ্তঘাতক নয়তো? বিছানার উপর সরোজ উঠে বসলো, জিজ্ঞাসা করলো—কে? কোন্ হ্যায়?

ইংরেজীতে মেয়েলী গলায় উত্তর হলো—আমি আয়েষা, শেখের মেয়ে। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

—বলুন।

– শুনলাম, আপনারা হিন্দুস্থানের লোক?

—হ্যাঁ—

—আপনারা বাবাকে ধরিয়ে দেবার জন্য এ অঞ্চলে এসেছেন ইংরেজের গুপ্তচর হয়ে?

—না, আমাদের এক বন্ধুকে এক সন্ন্যাসী এই পথে ধরে নিয়ে গেছে, তাকে উদ্ধার করার জন্যই আমাদের এদিকে আসা।

– আপনি সাঁচা কথা বলেছেন?

—মিছে কথা বলার মত বিশেষ কোন কারণ এখনও ঘটেনি।

—তাই যদি হয়, আপনারা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করুন। কাল বিকালে এরা ইতালিয়ানদের কাছে আপনাদের বিক্রী করবে। হাব্‌সিদের সংগে তাদের লড়াই বেধেছে। রাস্তা তৈরী করার জন্যে আর পাহাড় কাটার জন্যে তারা মজুর চায়।

মজুরের কাজকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু ইতালিয়ানরা মানুষ কিনবে? তারা তো সভ্য জাত!

—বাইরেটা দেখে আপনারা সভ্যতা আর অসভ্যতার হিসাব করেন কেন, ভিতরটা তো সবাইকারই স্বার্থপরতায় ভরা। যাক্‌ সে কথা, ইতালিয়ানদের কাছে বিক্রী হবার আগে আপনারা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করুন।

—কিন্তু আমি তো আর একা নই, আমরা চারজন। চারজনের একসংগে পালানো তো সহজ নয়!

—আমি যদি সে সুযোগ করে দিই?

দপ্‌ করে সরোজের মনে সন্দেহ জেগে উঠলো। অযাচিত ভাবে এসে এই মেয়েটি তাকে এমন করে পালানোর কথা বলছে কেন, এতে তার কি স্বার্থ আছে? এইভাবে কি শেখ্‌ তার মন বুঝতে চায়। সন্দিগ্ধভাবে সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—আমি পালাই আর না পালাই তাতে আপনার কি লাভ?

লাভ একটু আছে বৈকি! আমি চাইনা যে আমারই স্বজাতি অকারণে বিদেশীর হাতে নির্যাতিত হয়।

—আমরা আপনার স্বজাতি?

—হ্যাঁ, আমরা 'কালা আদ্‌মি,' সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা আমাদের স্বজাত। এই নিন্‌ বোরখা, এইটা পরে আমার সংগে এখনি আসুন, ঘোড়া তৈরী।

বোরখাটি নিতে সরোজ ইতস্ততঃ করলো, বললো—কিন্তু আমার বন্ধুরা?

—তারাও আসছে।

—আপনার বাবা?

—কেউ এখানে নেই, সবাই কোথায় ডাকাতি করতে গেছে।

সরোজ আর দেরী করলো না, যা হবার তাতো হবেই, এমন সুযোগ, একবার দেখাই যাক্‌ না। বোরখাটা মাথা গলিয়ে পরে তাঁবুর বাইরে আসতে সরোজের এক মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। আয়েষাকে দেখে রক্ষী কোন কথাই বললে না।

বাইরে সারি সারি তাঁবু সমতল মাঠের বুকে যেন ঢেউ তুলেছে। সেই তাঁবুগুলি পিছনে সারি সারি উট আর ঘোড়া বাঁধা। তারই একধারে শাদা শাদা বোরখা পরে আরো তিনজন দাঁড়িয়েছিল। আয়েষা চারটি ঘোড়া এনে চারজনকে ইঙ্গিতে উঠে বসতে বললে, তারপর নিজে একটা শাদা ঘোড়ার উপর উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, বললে—আইয়ে মেরীসাথ—

চারটি ঘোড়া তার পিছনে চললো তালে তালে।

খানিকদূর এসে কোন এক সময় সরোজ আয়েষাকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আমাদের সঙ্গে কদ্দূর যাবেন?

—বরাবর। আপনারা যদ্দূর যাবেন।

—তার মানে?

—মানে, ফিরে যাবার পথ তো আমি রাখিনি। শেখ্ যখন ফিরে এসে আপনাদের খোঁজ করবে, রক্ষীদের মুখে আমার কথা শুনবে, ফিরে গেলে আমার অবস্থা তখন কি হবে একবার ভেবে দেখুন তো?

কিন্তু..

—কিন্তু কি বলুন?

—আপনি বেদুইন আর আমরা বাঙালী, আপনি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবেন? আমরা তো হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুর সন্ধানে বেরিয়েছি, কোথায় গিয়ে পড়বো কে জানে!

—যেতে আমাকে হবেই, তবে আপনাদেরকে সঙ্গী পেয়েছি এই যা। যদি আপত্তি থাকে আমি একাই যেদিকে হয় চলে যাবো।

—আপত্তির কথা বলছি না, বলছি আমাদের জীবন বাঁচিয়ে আপনার এই বিপত্তি হলো। আবাল্যের ঘর-বাড়ী আত্মীয়স্বজন ছেড়ে..

—আত্মীয়স্বজন?—আয়েষা বাধা দিয়ে বললো—এরা কেউ আমার আত্মীয় নয়। এদের চেয়ে আপনারাই আমার বেশী আত্মীয়, আমি বাঙালী।

সরোজ অবাক হয়ে গেল, বেদুইনী-বোরখার নীচে বাঙালী মেয়ে! উৎসুক চোখে বোরখা-ঢাকা অশ্বারোহিনীর পানে তাকালো

আয়েষা বললো—আমার বাবা এসেছিলেন আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করতে, তখন আমি খুব ছোট, স্বপ্নের মত মনে পড়ে। তারপর কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল, সব ওলোটপালোট হয়ে মা-বাপ হারিয়ে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে এই বেদুইনদের হাতে এসে পড়েছি। এদের মুখেই শুনেছি, আমার বাপ-মাকে হত্যা করে এরা আমায় লুঠ করে এনেছে। তারপর থেকে এরা আমায় শিখিয়েছে, ওই শেখ্‌কে বাবা বলতে, বেদুইনদের আত্মীয় বলে ভাবতে। ওই শেখের এক ছেলের সঙ্গে তারা আমার বিয়ে দেবার ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু যে লোক আমার বাপ-মাকে খুন করেছে, তার ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। আমি সেইজন্য পালাবার সুযোগ খুঁজছিলাম এমন সময় ভগবানের আশীর্বাদের মতো আপনারা এসে পড়লেন,—বলে আয়েষা তার ঘোড়ার পিঠে রাশের আঘাত করলো, দুরন্ত আরবী ঘোড়া সকলকে ছাড়িয়ে ছুটলো ক্ষিপ্রবেগে।

সরোজ ও ডেভিড এতক্ষণ যেন রূপকথার কোন রাজকন্যার কাহিনী শুনছিল, সহসা আরবী ঘোড়ার পদাঘাতে উড়ন্ত ধুলোগুলো যখন চোখের সামনে অন্ধকার করে ফেললো তখন চমক ভাঙলো, তারাও ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো।

চাঁদের আলোয় সমগ্র প্রান্তর অস্পষ্ট সুষমায় ভরে উঠেছে, সীমাহীন সেই শান্ত ধূসরতার বুকে পাঁচটি ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলেছে। পিছনে শেখের যে তাঁবুগুলি রহস্যময় পিরামিডের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি শাদা ছোট ছোট বিন্দুতে নিঃশেষ হয়ে গেল। দিগ্বলয়ের সীমান্তে উঁচু-নিচু প্রান্তর ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষিপ্র পায়ের নিচে সাগরের ঢেউয়ের মত দূরে স্তিমিত চাঁদের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। বিবর্ণ চন্দ্রালোকে সামনে ও পিছনে শুধু উঁচু-নিচু প্রান্তরের পথ যেন রহস্যময় কালের গতি, যতই অতিক্রম করে চলেছে যুগ যুগ ধরে ততই এগিয়ে আসছে, চলার বিরাম নেই, মহাকালের সীমায় পৌঁছানো যায় না।

পাঁচটি ঘোড়া ছুটছে। ঝাঁকানির পর ঝাঁকানি লেগে আরোহীদের শরীর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে, রক্তে ছুটছে আগুনের ফুলকি, ঘোড়ার মুখে ফেনার পর ফেনা জমছে। পল, অনুপল, বিপলের সঙ্গে সমতা রেখে ঘোড়ার পদক্ষেপ যত ক্ষিপ্র হয়ে উঠছে, দিগবলয়ের সীমা ততই দূরদূরান্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে এই বন্ধুর প্রান্তর কতদূরে গিয়ে শেষ হবে, কে জানে!

রাত্রিশেষে প্রভাতী আলো ফুটে ওঠার কিছু পরে ধূসর পার্বত্য প্রান্তর ছাড়িয়ে তারা এসে পড়লো শ্যামল বিটপী-ঘেরা বনপথে। গাছের পর গাছের শ্যামলিমা অনুর্বর পাহাড়ের ধূসরতাকে ঢেকে দিয়েছে। মাটির রঙ বদলে গেছে ঘোড়ার পায়ের নিচে আর ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো কর্কর করে ওঠে না, গাছের পাতার মর্মর শব্দ কানে মিষ্ট লাগে, ঝিরঝিরে বাতাস খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয় দীর্ঘ শ্রান্তির কথা, সবুজ গাছপালার শান্ত-শ্রী চোখের উপর বুলিয়ে দেয় পরিতৃপ্তির প্রলেপ। মন হাল্‌কা হয়ে ওঠে।

আয়েষা বললে— এসে পড়েছি। এই বনের ওপারেই রেল স্টেশন, আদ্দিস-আবাবা-জিবুতি রেলপথ গেছে ওদিক দিয়ে।

ডেভিড বললে—কিন্তু এই বনের মধ্যে হারিয়ে যাব না তো?

—না, এই পথ আমার জানা। শেখের দলের সঙ্গে এদিকে আমি ক'বার এসেছি।

কেউ আর কিছু বললো না, পাঁচটি ঘোড়া এগিয়ে চললো তালে তালে বনের মেঠোপথে। গাছের ছায়ায় নিচ দিয়ে, কাঁটা গাছ ডিঙিয়ে, ঝরা পাতার উপর মর্মর শব্দ জাগিয়ে ঘোড়া ছুটলো।

জঙ্গল ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠলো, সূর্যের আলো গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে গেল। চারিদিকে শান্ত মৌনতা, ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ক্ষীণ করতোয়ার মত ধূসর পথটি না থাকলে, সে বনের মাঝে এগিয়ে যাওয়া অসাধ্য হতো, হারিয়ে যেতেও বেশী দেরী হতো না।

সহসা ইঞ্জিনের শব্দ তাদের কানে এসে লাগলো, জানিয়ে দিলে তারা রেলপথের পাশে এসে পৌঁচেছে।

বনের বুক ভেদ করে ব্রাহ্মণের গলার পৈতার মতো রেলপথের লোহার লাইন চলে গেছে। ঘোড়সওয়ার দল যখন সেই লাইনের সামনে এসে দাঁড়ালো, লৌহ-পথের একপ্রান্তে ধূমায়মান কালো ইঞ্জিনখানি তখন দেখা দিয়েছে মাত্র।

বোরখাগুলি এরা খুলে ফেলেছিল. এবার সেই বোরখা একটি হাতে নিয়ে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সরোজ ওড়াতে লাগলো, চীৎকার করে উঠলো—থামো! থামো!!

ড্রাইভার দেখলো, একবার হুইশ্‌ল্‌ দিল মাত্র। ট্রেনের বেগ কিন্তু কমলো না।

সরোজ আবার চীৎকার করে উঠলো—থামো! থামো!!

ড্রাইভার আরেকবার হুইশ্‌ল্‌ দিল।

ট্রেনখানি তখন প্রায় সরোজের উপর এসে পড়েছে। ঘোড়াটি ভয়ে একলাফে লাইন পার হয়ে গেল, নাহলে সরোজকে চাপা পড়তে হতো। ট্রেন সমান গতিতে এগিয়ে চললো তাদের পাশ দিয়ে। সরোজ আবার চীৎকার করে উঠলো।

সবশেষে গার্ডের গাড়ী যখন সরোজকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, গার্ড সরোজের চীৎকার শুনে কি ভেবে ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষলে, গাড়ী থামলো।

সরোজ ডেভিড প্রভৃতি গাড়ীর কাছে যেতেই গার্ড বন্দুক বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—বেদুইন?

সরোজ তার বন্দুক ধরার কায়দা আর জিজ্ঞাসা করার ভংগী দেখেই বুঝেছে সে তাদের বেদুইন ডাকাত মনে করেছে, তাড়াতাড়ি বললে– না না, আমরা বেদুইন নই, আমরা বৃটিশ প্রজা।

গার্ড এবার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে বললে—আপনারা ব্রিটিশ, ইংরিজীতে কথা বলছেন বুঝি? ইংরিজী আমরা বুঝিনে। আপনাদের কি হয়েছে?

জার্মান যুদ্ধের সময় সরোজ ও ডেভিড দু'বছর ফরাসী সীমান্তে ছিল, চলনসই ফরাসী ভাষা বুঝতে ও বলতে যারা শিখেছিল। সরোজের চেয়ে ডেভিডই বলতে পারতো ভাল, সেই বললে—আমরা বিশেষ বিপন্ন, আমাদের বেদুইন ডাকাতে ধরেছিল, পালিয়ে এসেছি। আমাদের আদ্দিস-আবাবায় যেতে হবে, ইংরেজ রাজদূতের সংগে আমরা দেখা করতে চাই! আমাদের কাছে একটিও পয়সা নেই, দয়া করে যদি আপনি আমাদেরকে সেটুকু নিয়ে যান।

গার্ড বললে—বিপন্ন লোককে সাহায্য করতে ইথিয়োপিয়ানরা সব সময়েই প্রস্তুত। তবে আদ্দিস আবাবা পর্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানি না, ততদূর বোধহয় এ গাড়ী যাবে না, ইতালিয়ানরা আমাদের গাড়ী আটকাচ্ছে।

সরোজ বললে—যতদূর হয় ততদূরই ভাল, উপস্থিত তো বেদুইন ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচি।

পাঁচজন যাত্রীকে তুলে নিয়ে গাড়ী আবার ছুটলো।

আরোহী-বিহীন ঘোড়াগুলো বনের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত ট্রেনখানির পানে।

আদ্দিস আবাবা সহর পর্যন্ত ট্রেন পৌঁছালো না।

দু'তিনটে ছোট ছোট স্টেশন পার হতে না হতেই মাঠের মাঝখানে ইতালিয়ান সৈনিকেরা ট্রেন ধরলো। ট্রেন থেমে গেল। সৈনিকেরা প্রত্যেক যাত্রীটিকে নামিয়ে দিলে, প্রত্যেকের জিনিসপত্র খুলে দেখলে। মূল্যবান যা-কিছু দেখলে পকেটে ভরলে, তারপর খালি গাড়ী ফিরিয়ে দিলে যে পথে এসেছিল সেই পথে।

সন্ধ্যার সময় মাঠের মাঝে সেই নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে যারা মৃদু আপত্তি তুলছিল, সৈনিকেরা তাদের পানে একবার ফিরেও তাকালো না, শুধু সেই যাত্রীদলের মধ্যে থেকে খাটতে পারে এমন জোয়ান ছেলেমেয়েদের আলাদা করে ফেললো।

এক ভদ্রলোক বছর পাঁচেকের একটি ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সৈনিকরা তার কোল থেকে ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে আরেক দিকে টেনে আনলো। ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলো। সামনে সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেল, ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে বললো—হুজুর, আমার উপর দয়া করুন, ছেলেটির বড় জ্বর, আদ্দিস-আবাবায় যাবো একটি ভাল ডাক্তার দেখাবার জন্য, আমায় ছেড়ে দিন।

সৈন্যাধ্যক্ষ হাসলো, বললো,—তোমাদের সব ফন্দি-ফিকির আমি জানি, ব্ল্যাক নিগার! তোমাদের ওসব কোন বাজে ওজর-আপত্তি শুনবো না, তোমাদেরকে আদ্দিস-আবাবা পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ করতে হবে।

—ছেলেটি মরে যাবে হুজুর—বলে ভদ্রলোক সৈন্যাধ্যক্ষের পা দুটি চেপে ধরলো। প্রতিদানে সৈন্যাধ্যক্ষ এমন কায়দায় একটি ঠোক্কর মারলো যে ভদ্রলোক উল্টে পড়ে গেল। তথাপি ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য পিতা আশা ছাড়লো না, উঠে বললো—দয়া করুন হুজুর, যীশুর নামে, পরমেশ্বরের নামে, মা-মেরীর নামে আমি আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা করছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা ক্ষেপে গেল, রুগ্ন ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, পা দিয়ে ছেলেটিকে ছিটকে ফেলে দিলে। পাঁচ বছরের ছেলে ককিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

পিতা নিশ্চল স্থাণুর মত কিছুক্ষণ হতভাগ্য পুত্রের পানে তাকিয়ে রইল, ব্যাপারটা সে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তার সম্বিৎ ফিরে এলো, প্রচণ্ড আক্রোশে হুঙ্কার করে রুখে গেল সার্জেন্টের পানে।

নিরস্ত্র পদাহত মানুষ সশস্ত্র নিষ্ঠুর বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে পারবে কেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ তখনি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে ভদ্রলোককে গুলি করলো, তারপর হাবসীদের শুনিয়ে ফরাসী ভাষায় বললো—আমি জানি, কি করে শয়তানকে শায়েস্তা করতে হয় !

সরোজ জীবনে এমন নিষ্ঠুরতা কখনো দেখেনি, তার মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতেই একটি কথা বেরিয়ে এলো—ব্রুট্ !

সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরে দাঁড়ালো, বললো—বলি, ইংরেজ-দেবতা, তোমাদের পাস্‌পোর্ট আছে ?

সরোজ অপ্রতিভ হলো, তাদের কারুরই তো পাস্‌পোর্ট নেই।

আয়েষা কিন্তু সেই সমস্যা বাঁচিয়ে দিলে, বললো—আমাদের পাস্‌পোর্ট ছিল, জিনিসপত্র টাকা-পয়সা সবই ছিল, কিন্তু সোমালিল্যাণ্ডে আমরা বেদুইনদের হাতে পড়ি, তারা আমাদের সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে, প্রাণেও মারতো, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ আয়েষার মুখের পানে তাকিয়ে বললো—তুমিও এদের মধ্যে একজন ! বুঝেছি, তোমরা একদল বৃটিশ স্পাই, অল্‌রাইট !

সৈন্যাধ্যক্ষ তখনি আদেশ করলো, ক'জন সৈনিক এসে তাদের সার্চ করলো

জামার পকেট থেকে জুতোর সুকতলা পর্যন্ত। তারপর সৈন্যাধ্যক্ষ বললো—নিয়ে যাও এড্‌জুটেণ্টের কাছে, এরা বৃটিশ স্পাই।

জনাদশেক সৈন্য তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে চললো।

ফাঁকা প্রান্তর ও বনের সীমা যেখানে এসে মিশেছে সেইখানে গাছের আড়ালে সারি সারি ইতালিয়ান সৈন্যের তাঁবু পড়েছে। এদিকে-ওদিকে দূরে দূরে কয়েকটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আশে-পাশে সৈনিকদের ভীড়। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠের মাঝে ছড়ানো কয়েকটি বড় বড় কামানের কালো লৌহকাঠামোর উপর আগুনের লালচে আভা প্রতিফলিত হচ্ছে, গোলন্দাজদের পালিশ-করা লোহার শিরস্ত্রাণগুলো সোনার মুকুট বলে মনে হয়।

কয়েকটি তাঁবু পার হয়ে সৈন্যরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কাছে এক তাঁবুর সামনে এসে 'হল্‌ট' করলো। সামনে একটি ক্যাম্প-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একজন সৈনিক চুরুট ফুঁকছিল। সেক্‌সন-মাস্টার খট্‌ খট্‌ করে এগিয়ে গিয়ে সেলাম দিয়ে জানালে—ইংরেজ গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

—ইংরেজ গুপ্তচর? অল্‌রাইট্‌—বলে এডজুটেণ্ট সোজা হয়ে বসলো।

এতক্ষণ বন্দীর দুপাশে দু'জন করে সৈনিক ছিল, সেক্‌সন-মাস্টারের আদেশে এদিকের পাঁচজন মার্চ করে সরে গেল, অপর পাঁচজন বন্দীদের এমনভাবে সাজিয়ে দিলে যেন এড্‌জুটেণ্ট প্রত্যেকের মুখ দেখতে পায়। তীক্ষ্ন ধারালো দৃষ্টিতে একে একে পাঁচটি বন্দীর মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে এড্‌জুটেণ্ট বললো—গুড্‌ ইভনিং ইংলিশমেন, আমাদের এদিকে এসেছেন কি মনে করে?

ডেভিড ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলে - বঁজুর কাপ্‌তেন...!

—ক্যাপটেন নয়, এড্‌জুটেণ্ট—এডজুটেণ্ট এডজুটেণ্ট ভুল শুধরে দিলে।

ডেভিড শুধরে নিয়ে বললে—বঁজুর এদজুতাঁতে।

তারপর সুরু করলো আজগুবি কৈফিয়ৎ: সরোজ ও ডেভিড হচ্ছে হাতীর দাঁতের ব্যবসাদার, আবিসিনিয়া থেকে বিদেশে গজদন্ত চালান দেয়। সম্প্রতি জিবুতির এক জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে গোলযোগ বাধে. তা মিটাবার জন্য তারা জিবুতি গিয়েছিল। ইতিমধ্যে লড়াই বাধে। এখন সংবাদ আদান-প্রদান ও গাড়ীর যাতায়াতে অসুবিধা বেড়ে গেছে, তাই তারা ঠিক করেছে ব্যবসা তুলে দেবে। সেইজন্য দরকারী কাগজপত্র নিয়ে তারা আদ্দিস-আবাবায় যাচ্ছিল. পথে বেদুইন-ডাকাতের দল তাদের সব কেড়ে নিয়েছে, কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তারা পালিয়ে এসেছে। এখন যদি তাদের আদ্দিস-আবাবায় যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাহলে সত্যি বড় উপকার হবে।

এডজুটেণ্ট বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললো—সব বুঝেছি, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তো ইংরেজ, ওই বেদুইন মেয়েটি তোমাদের সঙ্গে কেন?

সরোজ বললে—ও আমার বোন।

—ইংরেজ মহিলার ওরকম বেদুইনের পোষাক কেন?

—পালাবার জন্য, মেয়েলী পরিচ্ছদে বেদুইনদের তাঁবু থেকে পালানো যেতো না।

এড্‌জুটেণ্ট মাথা নেড়ে বললে—জানি, স্পাইদের আমি চিনি।

– কিন্তু আমরা স্পাই নই, আপনি ভুল করছেন।

—ভুল আমরা করিনি, ভুল করেছিল জার্মানরা, তাই গত যুদ্ধে তারা হেরে গিয়েছিল। আমরা ইতালিয়ান, ইংরেজদের আমরা ভাল করেই জানি।

ডেভিড বললো—বেশ, আপনি আমাদের ব্যবসা সম্বন্ধে আদ্দিস-আবাবা থেকে খবর নিয়ে জানুন।

—দরকার আছে কি এত হাঙ্গামায়? যুদ্ধে কতলোকই তো মরে, পাঁচজন ইংরেজ স্পাইকেও যদি আমরা গুলি করে মারি, কে তার খবর রাখবে?—বলে এড্‌জুটেন্ট সৈনিকদের আদেশ দিলে—এদের নিয়ে যাও, কাল কোর্টমার্শ্যাল্‌!

হাব্‌সিদের একখানি মেটে বাড়ীর একটি ছোট ঘর বন্দীশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। ক'দিন আগেও হয়তো এই ঘরখানিতে এক স্নেহময়ী মা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে বুকের কাছে নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি কাটিয়েছে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলি নির্ভয়ে খেলা করেছে কিন্তু শক্তিমত্ত বিদেশী তাদের সেই শান্তিটুকু হরণ করেছে, আজ তারা কে কোথায় চলে গেছে, বিষাক্ত গ্যাস ও বোমার আশীর্বাদে জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক তাদের ফুরিয়ে গেছে হয়তো। বিজেতার কল্যাণে পল্লীর শান্তি সৈনিকের পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, স্নেহশীল কুটির হয়ে উঠেছে যন্ত্রণাময় বন্দীশালা।

ঘরখানি অন্ধকার, গরমও খুব, তার উপর এই আকস্মিক বিপদে সকলের মন ও দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ছোট ঘরখানির মধ্যে পাঁচজন বন্দীর নিঃশ্বাস যেন রোধ হয়ে আসছিল।

হঠাৎ দরজা খুলে একজন সৈনিক চীৎকার করে উঠলো—খাবার!

তারপরেই একটা টর্চ জেবলে এক একজনের কোলের উপর এক এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলে, জিজ্ঞাসা করলো—জল?

সরোজ ও ডেভিড বলে উঠলো—ইয়েস্‌-ইয়েস্‌!

মাটির ভাঁড় ছিল, সেই পাঁচটা ভাঁড় পেতে লোকটি জল ঢেলে দিলে।

সারাদিন মুখটা পর্যন্ত ধোয়া হয়নি, আয়েষা একটু বেশী জল চাইল। সৈনিকটি একবার আয়েষার মুখের পানে তাকিয়েই রুক্ষ হয়ে উঠলো, বললে—জল? জল অত শস্তা নয়! এটা ইংলণ্ড নয়!

এখানে যুক্তি ও তর্কের কোন মূল্যই নেই, বিচার ও মনুষ্যত্বের কথাই ওঠে না। হাত মুখ ধোবার জল না পেলে, না-খেয়ে যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তার উপায় নেই, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। এক এক টুকরো রুটি মুখে ফেলে আর একচুমুক করে জল খেয়ে তখনকার মতো সকলে জলযোগের ব্যাপারটা সেরে নিলে।

অমন খিদের সময় আধখানা রুটি! ডেভিড বললো—এতক্ষণ তো বেশ ছিলাম, কিন্তু এই রুটি আর জল পড়ে খিদেটা যেন আরো বেশী করে জেগে উঠলো।

সরোজ পেটে হাত বুলিয়ে একটা হাই তোলার চেষ্টা করে বললে—তবু এরা আমাদের ইংরেজ বলে ভেবেছে তাই রক্ষে, যদি ইণ্ডিয়ান বলে মনে করতো তাহলে হয়তো দয়া করে এই খাবারটুকুও দিত না।

—কেন ইংরেজ বলে ভাববে না? গায়ের রংটা দেখুন!—রবি দত্ত বললো।

গাইড এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল এককোণে, এবার সে বলে উঠলো—ওই ফর্সা গায়ের রং নিয়েই তো যত হাঙ্গামা. ওই দেখেই তো ইংরেজ গুপ্তচর বলে ওরা আমাদের ধরেছে, শেষে হয়তো গুলি করে মারবে। গায়ের রং কালো হলে এমনটি হতো না।

গাইড বেচারার গায়ের রং কালো।

ডেভিড বললো—কালোদের এরা কেমন সম্মান দেয় তাতো স্টেশনেই দেখেছি।

সরোজ বললো—দেখ গাইড, ওরা আমাদের ইংরেজ বলে যদি গুলি করে মারে সেজন্য আমার দুঃখ নেই। পরাধীন দেশের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে জুতোর ঠোক্কর খেয়ে প্রাণে বাঁচতে আমি চাই না।

আয়েষা বললো—আপনার দেশকে আপনি তো খুব শ্রদ্ধা করেন দেখছি!

—শ্রদ্ধা মানে? আমার দেশ বলে তার সবকিছু দোষ-ত্রুটি ভুলে যেতে হবে, দেশের নামে নেচে উঠতে হবে, এ আমি ভালবাসি না। আগে আমার দেশকে সত্যিকারের বড় করে, আদর্শ করে তুলতে হবে, তখন দেশের নামে আমি মাথা লুটিয়ে দেব। তার আগে আমার দেশ বড়, আমার দেশ ভাল বলে লোক-দেখানো শ্রদ্ধা জানাতে আমি পারবো না।

ডেভিড বললো—কেন, আপনাদের কি সত্যি গৌরব করার মত কিছু নেই? তাজমহল, কুতবমিনার, দেওয়ানী-খাসের মত স্থাপত্য, মাদুরা রামেশ্বর, দিলওয়াড়ার মত মন্দির, অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টার মতো গুহা, অশোক হর্ষবর্ধন শিবাজীর মত রাজা, চৈতন্য, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দের মত মানুষ···

রবি দত্ত হেসে বললো—আরো আছে মিস্টার ডেভিড, আরো আছে—রবীন্দ্রনাথ. গান্ধী, সুভাষচন্দ্র···

সরোজ বললো—এঁদের আমি জানি, এঁদের মহত্ব আমি স্বীকারও করি। কিন্তু এঁদের আড়ালে কারা আছে জান?—অনাহারী অশিক্ষিত অসংখ্য গেঁয়ো লোক, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর বেরিবেরি আর থাইসিস্ যাদের ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। যখন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর কথা ভাবব তখন এদের কথা ভুললেও তো চলবে না। রবীন্দ্রনাথ একজন, আর এরা যে অসংখ্য···।

—বড় গোলমাল হচ্ছে, সাই—লেন্ট!—সহসা রক্ষী গর্জন করে উঠলো।

গাইড বললে—দুটো কথা বললেও দোষ ?

হুম্ করে প্রহরী গর্জন করে উঠলো, বললো—বেশী বক্‌বক্ করলে সঙীনের খোঁচা মেরে তোমার মুখ আমি বন্ধ করবো !

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সময় কাটে। টিক্ টিক্ করে বিদায় জানিয়ে অন্ধকারের বুকে সময় অবিরাম লুপ্ত হতে থাকে, প্রতি সেকেণ্ডে মানুষকে বুঝিয়ে দেয় এই পৃথিবীর দিন ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে, এমন সুন্দর জগৎ ছেড়ে যাবার জন্যে মৃত্যুর ট্রেন ক্রমেই কাছে আসছে, জগতের শ্রী ও সুন্দরের মায়া-দাঁড় ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

ঘড়ির সময় সবসময় মানুষের মনকে স্পর্শ করে না। শান্তি ও অশান্তির মাত্রা বুঝে মানুষের মনের কাছে মুহূর্তগুলি ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দে যে নিমেষগুলি উপলব্ধির মধুরতায় সকালবেলার শিশিরের মত ঝল্‌মল্ করে উঠে কোথায় মিলিয়ে যায় বিষাদের অবসরে সেই লহমাগুলিই জমাট বেঁধে ওঠে শীতের কুয়াশার মতো। ঘড়ি না থাকলেও মানুষ তখন শুনতে পায় মহাকালের পদধ্বনি। সরোজরাও শুনতে পাচ্ছিল রাত্রির পদধ্বনি। চোখে ঘুম নেই। দুর্ভাবনা তাদের মনের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে ঘরের দেওয়ালের মতো। এই অশান্তির দেয়াল না ভাঙ্‌তে পারলে আরামে নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। রাত্রির অন্ধকার চারিপাশ থেকে যেন চেপে ধরছে।

অনুপল বিপল গুণে রাত তো কাটলো—উষার আলো আকাশকে প্রদীপ্ত করে তুললো, কিন্তু দুর্ভাবনার অন্ধকারে আলোর শিখা তো দেখা দিল না।

কিছুক্ষণ পরে সান্ত্রী এসে জানালো—যেতে হবে।

পাঁচজন ঘরের বাইরে এলো। দশজন সৈন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো বন্দী পাঁচজন, সবাই মার্চ করে চললো।

সরোজ, তার দু'হাত ধরে দু'জন সৈনিক।

ডেভিড, তারও দু'পাশে সৈনিক।

রবি দত্তর দু'দিকে দু'জন।

দু'জনের মাঝে আয়েষা।

সবার শেষে দু'জনে নিয়ে চলেছে গাইডকে।

তাঁবুগুলির পিছনে যেতেই চোখে পড়লো প্রশস্ত মাঠ, দূরে দূরে ক'জন সৈন্য টহল দিচ্ছে। একদিকে এক তাঁবুর পাশে ক'খানি ক্যাম্পচেয়ার পাতা, তার উপর কালকের এডজুটেণ্ট ও তার দু'জন সঙ্গী বসে। এডজুটেণ্ট সঙ্গী দু'জনের সঙ্গে কি কথা বলছিল, এমন সময় বন্দীদের হাজির করা হলো। যে সার্জেণ্ট সরোজদের ধরেছিল সে সঙ্গেই ছিল, এডজুটেণ্ট তাকে কি

কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলো, তারপর সরোজদের লক্ষ্য করে ইংরেজীতে বললে— ইংরেজ বান্ধবী ও বন্ধুগণ তোমাদের সম্বন্ধে সার্জেণ্টের মুখ থেকে আমি যা শুনলুম, তাতে তোমরা যে ইংরেজ গুপ্তচর সে সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহই নেই। আবিসিনিয়া রাজা হেইলসেলাসী তোমাদের এই কাজে লাগিয়েছে। তোমরা ভেবেছ ধরা পড়লেও ইংরেজ বলে তোমরা আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু আমরা তেমন নির্বোধ নই। তাছাড়া যুদ্ধের আইন জাতি বর্ণ বিচার করে না, তা নিশ্চয়ই তোমাদের অজ্ঞাত নয়।

সরোজ বললো—যুক্তি ও তর্ক দিয়ে আপনাদের বোঝানো যাবে না তা জানি, তথাপি আমরা বারবার বলছি আমরা ব্যবসাদার। সোমালিল্যাণ্ডের আরবেরা আমাদের সর্বস্ব লুট করেছে, আমরা বহু কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন কোথায় আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন তা নয়, উপরন্তু আপনারাই আমাদেরকে গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করেছেন! সভ্যতা-গৌরবী ইতালিয়ানদের কাছ থেকে আমরা এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি।

—সভ্যতা-অসভ্যতার কথাই এখানে ওঠে না,—এড্‌জুটেণ্ট বললো,—যুধ্যমান জাতি কোন নীতি মেনে চলে না। তবু আমরা সুসভ্য বলেই তোমাদের বিচার করছি, নাহলে 'এশিয়াটিক্' কোন জাতি হলে কাল সেইখানেই তোমাদের গুলি করে মারতো।

ডেভিড বললো—আমাদের গুলিই করা হবে, কোর্টমার্শাল মানে শুধু একটা বিচারের অভিনয় মাত্র!

এড্‌জুটেণ্ট ভ্রূ কুঁচকে একবার সরোজের মুখের পানে তাকালো, তারপর মৃদু হেসে সংগী দু'জনের পানে মুখ ফেরালো। খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে কি কথাবার্তা হলো—পরামর্শই বোধ হয়। শেষে এড্‌জুটেণ্ট উঠে দাঁড়ালো, বললো—ইংরাজ বন্দীগণ, তোমরা যে গুপ্তচর সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তোমরা অস্বীকার করলেও সে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপেক্ষা করা যায় না। যুদ্ধের সময় গুপ্তচরের শাস্তি প্রাণদণ্ড। তোমাদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমিও তোমাদের সেই দণ্ডই দিলাম। কাল সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হবে। ভগবান তোমাদের আত্মার কল্যাণ করুন!

এড্‌জুটেণ্ট বসলো, সার্জেণ্ট সান্ত্রীদের আদেশ দিল। সান্ত্রীরা বন্দীদের নিয়ে যাবার জন্য আগের মত এক একজন বন্দীর দু'পাশে দু'জন করে এসে দাঁড়ালো। এমন সময় সরোজ বলে উঠলো—স্যার, আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে—

—কি ?

—আমায় কয়েকটা চুরুট আর গোটাদুয়েক দেশালাই দেবার আদেশ করুন। কাল সকালেই যখন মরবো, আজ সারা রাত চুরুট খেয়ে মরতে চাই।

এড্জুটেণ্ট হাসলো, নিজের হাতের জলন্ত চুরুটটার পানে তাকিয়ে বললো—অল্‌রাইট, আমি তোমার জন্য অর্ডার করছি।

সান্ত্রীরা বন্দী পাঁচজনকে মার্চ করে ফিরিয়ে আনলো ছোট্ট ঘরটাতে।

পাঁচজন বন্দীর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। কাল এতক্ষণে তারা 'সট্ ডেড'। মৃত্যুর অন্ধকার কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাবে—নতুন আলোর জগতে কি নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে, কিছুই জানা নেই। তবু তাদের সেই অজানা জগতে যেতেই হবে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা সভ্যতার নামে বর্বরতা করবে, বোমা অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রমাণ করবে। যেখানে প্রতিবাদের ধুঁয়া উঠবে— যেখানে বিরোধী বলে সন্দেহ হবে, সেখানেই নররক্তে ধরিত্রীকে করবে কলুষিত। আদিম যুগে মানুষের মনের মধ্যে যে পশু ছিল তা এখনও বেঁচে আছে।

কথা বলতে কারও আর ভাল লাগছে না। জীবনের সব সৌন্দর্য যেন সহসা ফাঁকা হয়ে গেছে। ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। সময়ও কাটছে না।

কিছুক্ষণ পরে রক্ষী এসে রুটি চা, ও সরোজের চুরুট দেশালাই দিয়ে গেল। খেতে আর তেমন কারও আগ্রহ নেই। শেষে ডেভিড বললো—সব চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে! খেয়ে নাও! কাল মরবো তো আজ কি,—বলে নিজে খেতে সুরু করে দিলে।

খেতে দেখে সবাই যেন খিদেটা টের পেলে, নিজ নিজ চা ও রুটির দিকে হাত বাড়ালো।

সরোজ বললো—তোমরা যে রকম মুষড়ে পড়ছ, হয়তো এখনি পাগল হয়ে যাবে। রুশিয়ার বিখ্যাত লেখক ডস্টোইভ্‌স্কির কোর্টমার্শাল হয়। যখন তাকে গুলি করে মারা হবে, ঠিক সেই সময় রাজার লোক এসে জানালে তাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ডস্টোইভ্‌স্কি প্রথমে সেই কথাটা বিশ্বাস করতেই পারেন নি। তারপর ডস্টোইভ্‌স্কি অনেকদিন বেঁচেছিলেন বটে, কিন্তু 'এখনি মরতে হবে'—এই যে ভীতি, এর শক্ তিনি সমস্ত জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আ-মরণ তাঁর মাথার মধ্যে একটু গোলমাল ছিল।

ডেভিড বললো—শুধু ডস্টোইভ্‌স্কি কেন ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের যখন ফাঁসি হয় এক রাত্রে তাঁর মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমরা যেভাবে আছি, আমার মনে হয় কাল সকালে হয়তো আমাদেরও দু-একজনের মাথা সাদা হয়ে যাবে।

সরোজ বললে—শাদা হতে দেব কেন? তার আগেই আমরা ভাগ্‌বো।

সকলে উৎসুক চোখে সরোজের মুখের পানে তাকালো। এখনও তাহলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে?

দিনের আলো নিভে গেছে। অন্ধকারের বুকে অন্ধকার জমে ঘন গুমোট দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে।

সরোজ একবার পালানোর ইঙ্গিত জানিয়ে সেই যে চুপ করেছে আর কথাটি বলেনি। একটির পর একটি চুরুট ধরিয়ে খাচ্ছে, এক একটানে জ্বলন্ত চুরুট ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠছে,—সরোজের মুখ দেখা যাচ্ছে, জামার বোতামগুলি ঝল্‌মল্ করে উঠছে। সরোজ ঘরের মধ্যে পদচারণা করেছে। এক একবারে সরোজ জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাইরের পানে তাকিয়ে দেখছে ঃ একজন সৈনিক ওপাশে টহল দিচ্ছে। কোথায় আগুন জ্বল্‌ছে দেখা যায় না, কিন্তু তার রক্তিম আভা সৈনিকের হেল্‌মেট, ইউনিফর্মের বোতামে ও রাইফেলের বেয়োনেটে ঝল্‌মল্ করছে।

জানালার সামনে থেকে সরোজ সরে এলো। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখলো। দরজাটি যেটুকু ফাঁক করা যায় তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল ঃ আগুন জ্বলছে। আগুনের কাছে ক'জন গোলন্দাজ সৈনিক একটি কামানের মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঠিক করছে, পাশেই একটি ফ্ল্যাশ্ লাইট প্রচণ্ড দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশের পানে। কামানের কালো কাঠামো আগুনের আভায় লাল দেখাচ্ছে।

দ্বাররক্ষী সান্ত্রী দরজার সামনে এসে পড়েছে দেখে সরোজ তাড়াতাড়ি সরে এলো। গেল ডেভিডের পাশে। চুপি-চুপি তাকে কি বললো। একবার দরজার পাশে নিয়ে গিয়ে ফাঁক দিয়ে তাকে কি দেখালো। তারপর চাপা গলায় সরোজ সকলকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা জেগে আছ?

আয়েষা জবাব দিলে আজ রাত্তিরে কি আর ঘুম হয়!

সরোজ বললো—তোমরা সবাই শান্তভাবে কাল সকালে গুলি খেয়ে মরতে রাজী আছ,- না বাঁচার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাও? কিন্তু তাতে বিপদ আছে, ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ ওরা গুলি করে মারবে।

আর্টিস্ট বললো- মরতেই যখন হবে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—আপনারা এখন দশ মাইল পথ ছুটতে পারবেন?

আর্টিস্ট বললো—কেন পারবো না? প্রাণে বাঁচলে পায়ে সর্ষের তেল মালিশ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

—বেশ! তাহলে তৈরী হোন বলে সরোজ সহসা সেইখানেই শুয়ে পড়লো। ডেভিড হৈ চৈ করে উঠ্‌লো।

গোলমাল শুনে সান্ত্রী দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে টর্চের আলো ফেললো। ডেভিড ইংরাজীতে চীৎকার করে উঠলো—জল আনো—জল, না হলে লোকটি হয়তো এখনি মারা যাবে।

সোমালী সৈন্য ইংরাজী ভাল বোঝে না, শুধু বললো—নো—নো।

ডেভিড ব্যস্তভাবে গাইডকে ডাকলো, বললো—রক্ষীকে বুঝিয়ে বল তাড়াতাড়ি একটু জল আনতে—বেশী চুরুট খেয়ে সরোজবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন।।

গাইড আমহারিক ভাষায় রক্ষীকে কি বোঝালো, রক্ষী গেল জল আনতে।

একটু পরে মাটির পাত্রে একপাত্র জল নিয়ে সৈনিকটি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। জলপাত্রটি নামিয়ে রেখে সরোজের অবস্থা দেখার জন্য যেই সে নিচু হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ডেভিড তার উপর লাফিয়ে পড়লো, তাকে

মাটিতে ফেলে তার মুখ চেপে ধরলো। সরোজও ততক্ষণে আয়েষার ওড়নাখানা নিয়ে সৈনিকের হাত-পা বেঁধে ফেললো। পকেটে ছিল রুমাল, সৈনিকের মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে আরেকখানি রুমালে তার মুখ বেঁধে দিলে। তারপর সৈনিকের ইউনিফর্মটা সরোজ খুলে নিলে, আয়েষাকে বললে—ও মেয়েলি পোষাকে অনেক অসুবিধা হবে, আপনি এই পোষাকটি পরে নিন।

তারপর সৈনিকের কার্তুজ-বেল্টটা খুলে সরোজ নিজে পরলো, রাইফেলটা নিলে হাতে। রাইফেলের মুখ থেকে কিরিচটা খুলে দিলে ডেভিডের হাতে। দরজা থেকে মুখ বের করে চারিপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিলে, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলো—সব রেডি?

জবাব হলো—ইয়েস্!

—অলরাইট, বেরিয়ে এসো।

পর পর পাঁচজন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে, যেদিকটা আর সব দিকের চেয়ে অন্ধকার সেই দিকটাই সরোজ বেছে নিলে। চাপা গলায় বললে—বাঁয়ে ফের,—ব্রজেৎ!

যে-ক'জন গোলন্দাজ কামান ঠিক করছিল তাঁরা একবার এদিকে তাকালো, পলায়মান বন্দীদের ঠাহর করতে পারলো না, আবার নিজের কাজে মন দিল।

অন্ধকারে সরোজরা যতটা নিঃশব্দে পারে ছুটে চললো, পিছনে গোলন্দাজের অগ্নিকুণ্ডের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসতে লাগলো।

খানিকটা এগিয়ে এসে চোখ পড়লো: পার্বত্য-ভূমি যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তারই একটু নিচে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া। বেড়ার পাশে-পাশে খানিক দূরে-দূরে আগুন জ্বলছে, আগুনের কাছে এক একজন সৈনিক পায়চারি করছে।

সরোজ উপত্যকার মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়ালো, এক মিনিট কি ভেবে নিলে। তারপর কার্তুজ বেলটটা খুলে আয়েষাকে পরিয়ে দিয়ে তার হাতে বন্দুকটি দিয়ে বললো—আপনি এখন একজন ইতালিয়ান ক্যাপটেন, বুঝলেন?

আয়েষা মাথা নাড়লো।

সরোজ বললে—মনে রাখবেন, আপনার উপর এখন আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে আপনি সবার আগে এগিয়ে চলুন। গার্ড আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন—আমরা তিনজন ইতালিয়ান স্কাউট, ও একজন গাইড্। আপনি আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন।…তারপর যা করতে হয় আমরাই করবো—বুঝলেন তো?

আয়েষা বললে—বেশ।

বন্দুক কাঁধে ফেলে গট্‌গট্ করে আয়েষা এগিয়ে চললো, পিছনে চললো চারজন সঙ্গী।

পাহারা দিচ্ছিল একজন সাধারণ সোমালী সৈন্য। সৈনিকের ইউনিফর্মে সুন্দরী আয়েষাকে দেখে ইতালিয়ান 'মেজর' মনে করে সৈনিকের কায়দায় স্যালুট্ করলো। আয়েষা সোমালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নম্বার?

—সাত, সেকসন বি।

—অলরাইট্ নম্বার সেভ্‌ন্—এদের ছেড়ে দাও, এরা স্কাউট।

সৈনিকটি তাড়াতাড়ি আরেকটি স্যালুট্ করে বললো—যে আজ্ঞা! আদেশ-পত্রটি আমায় দিতে আজ্ঞা হয়!

—এই যে দিচ্ছি,—বলেই সহসা চোখের নিমেষে আয়েষার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে সরোজ তার কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করলো সোমালী সৈনিকের মাথায়। বেচারা বজ্রাহতের মত ঘুরে পড়লো মাটির উপর।

আয়েষা জিজ্ঞাসা করলো—মেরে ফেললেন নাকি?

—না, এতো সহজে এরা মরে না, শুধু ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে মুখ বন্ধ করা

গেল মাত্র— বলে সরোজ সোমালী গার্ডের বন্দুক ও কার্তুজ বেল্টটা খুলে নিয়ে ডেভিডের হাতে দিলে, বললো—পরে নাও। দরকার হবে।

তারপর যতটা সম্ভব সন্তর্পণে কাঁটা-তার ডিঙিয়ে তারা সামনের বনানী-বহুল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্ধুর উপলবহুল পার্বত্যভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য, শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে লুকিয়ে পালানো তেমনই সহজ। পালাবার সময় পাহাড়ের গায় প্রতি পাথরটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত প্রয়োজনীয়, শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কখন্ কোন্ পাথরের আড়ালে মাথা বাঁচিয়ে চলতে হবে তার কোন ঠিকানা নেই, তেমনি তাড়াতাড়ি চলতে হলে এর চেয়ে বড় শত্রুও আর নেই, প্রতি মুহূর্তে পা পিছলে যাবার মচকে যাবার সম্ভাবনা—চড়াই আর উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে পা সামলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া চলে না। খানিকক্ষণ চললেই হাঁটু কন কন করে ওঠে, মনে হয় পা দু'টি যেন আর দেহটিকে বইতে পারছে না।

অন্ধকারে দলটি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। আত্মরক্ষার আগ্রহ ও মৃত্যুর আতঙ্কে যদি দিক ভুল হয় ঘুরে-ফিরে আবার হয়তো কোন ইতালিয়ান ক্যাম্পে গিয়ে পড়বে তখন প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে যাবার আর কোন পথই থাকবে না। তথাপি না চলে উপায় নেই, চলতে চলতে দেহ অবসন্ন হয়ে ওঠে। এক ঘণ্টা শ্রমের পর মনে হয় যেন একটা দিনের খাটুনি গেছে। কখন যে তারা সুরু করেছিল ডবল মার্চ, তারপর ছুটতে ছুটতে কখন যে তারা ধীরে থেকে ধীরতর, ধীরতম হয়ে হাঁটতে সুরু করেছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। আর জেনেও লাভ নেই, কেন না ডবল মার্চের শক্তিও আর কারও নেই।

সহসা পতনের শব্দে সবাই চমকে উঠলো। আয়েষা পা পিছলে পড়ে গেছে।

সরোজ পিছনেই ছিল, সাহায্য করলো, আয়েষা উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু এক পা এগুতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো,— পা আর ফেলতে পারছে না

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—খুব লেগেছে ?

আয়েষা বললে—পাটা মচকে গেছে, চলতে পারছি না।

আয়েষা বসে পড়লো।

সরোজের মুখ কালো হয়ে উঠলো আপনি কি মোটেই চলতে পারবেন না ?

আয়েষা তখন ব্যথিত পাখানিকে দু'হাতে মালিশ করে সুস্থ হবার চেষ্টা করছিল, মাথা নেড়ে বললো—না।

ডেভিড বললো—তবেই তো মুস্কিল !

—তাহলে আজ রাত্তিরে আমরা এখানেই থেকে যাই—রবি দত্ত বললো।

ডেভিড বললো—অসম্ভব! আমরা ঘণ্টা দুয়েক মাত্র চলেছি, খুব বেশী হলে ছ' মাইলের বেশী আসে নি। আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে কাল সারাদিনও এখানে থাকতে হবে। দিনেরবেলা পালাবার অসুবিধা আছে অনেক, তাছাড়া ইতালিয়ান প্লেন যদি আমাদের একবার দেখতে পায়…

গাইড বললো—কিছুই হবে না, ভগবানের নাম করে এখানেই রাত কাটিয়ে দেব।

সরোজ বললো—দুর্বল লোক ভগবানে বিশ্বাস করে না হলে ভগবান ব'লে কিছুই নেই। ভগবান মানেই শূন্য। এই ভগবান দেখিয়ে বড়লোকরা গরীবদের ঠকিয়ে খায়।

আয়েষা বললো আমার জন্যই আপনাদের যখন এতো দুশ্চিন্তা, তখন আপনারা যান, আমি এখানেই থাকি, সম্ভব হলে কাল আপনাদের ধরবো, না হলে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

—আপনাকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে রেখে আমরা চলে যেতে পারি না। আপনার জন্যেই আমরা বেদুইনদের হাত থেকে বেঁচেছি, সে কথা কি আমরা এরই মধ্যে ভুলে গেছি? আপনি যদি চলতে না পারেন আমি আপনাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছি—বলে সরোজ আয়েষাকে কাঁধের উপর তুলে নিলে। আয়েষা বোধহয় আপত্তি জানাতো। কিন্তু সে সুযোগ পেলে না সঙ্গীদের সরোজ বললো—কমরেডস, মার্চ অন্!

আবার সুরু হলো অজানা পথ চলা।

পলাতকের পথ চলা। রাত্রির অন্ধকারে আগাছায় মাঝে মাঝে পা বেধে যাচ্ছে, তবু থামলে চলবে না। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, তথাপি বিশ্রাম করা চলবে না। কতবার ছোট ছোট গাছের ডালপালায় লেগে জামাকাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেশভুষার প্রতি লক্ষ্য রাখবার সময় এখন নয়, এখন শুধু পথ চলা, বন্ধুর উঁচু-নিচু আগাছা ও গন্ধময় পাহাড়ী পথ আর পথ।

ভোরের আলোয় অন্ধকার আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে এলো, পলাতকরা তখন পাহাড়ী পথ পার হয়ে সমতল জমিতে নেমে এসেছে। চারিপাশে নানা গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করে ডেভিড বললো এবার আমরা এখানে বিশ্রাম করতে পারি। ইতালিয়ানরা এখানে আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না।

রবি দত্ত ঝুপ করে বসে পড়লো, বলে—তেষ্টা যা পেয়েছে, উঃ!

সরোজ কাঁধ থেকে আয়েষাকে নামিয়ে দিয়ে বললো—তেষ্টা যে কার কম পেয়েছে তাতো বুঝিনে। সবাই আগে খানিক জিরিয়ে নি, তারপর জলের খোঁজ করা যাবে।

সুবিধামত একটু জায়গা দেখে সবাই বসে পড়লো।

সোনালী সূর্যের আলো ক্রমশঃ দীপ্তমান হয়ে উঠেছে। গাছের পাতার

ফাঁকে ফাঁকে এক এক টুকরো রশ্মি এসে পড়েছে বনভূমির উপর। পাতাগুলি রোদ লেগে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। মৃদু বাতাসের স্পর্শ লেগে মাথার অনেক উপরে গাছের পাতাগুলি শির শির করে কেঁপে উঠছে, মর্মর শব্দ ভেসে আসছে কানে। বাতাসের পেলব পরশ সইতে না পেরে বৃদ্ধ জীর্ণ দুর্বল পীতাভ পাতাগুলি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ছে, ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে মাটির বুকে। ঝরা পাতায় পাতায় বনভূমির মাটি ঢাকা পড়ে গেছে।

বুড়ো শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে, সবুজ কচি পাতা উৎসুক হয়ে উঠছে, কবে আবার ঝরা পাতার স্থানে নতুন কচি পাতা দেখা যাবে তারই প্রতীক্ষায়। তারপর সবুজ পাতা যেদিন গজায় আগের কচি পাতার সবুজ রংয়ের কোলে তখন পীত আভা দেখা দিয়েছে,—ভাল করে নতুন পাতার সঙ্গে আলাপ জমাবার আগেই দম্‌কা বাতাস তাকে ফেলে দেয় মাটির পানে। আবার নতুন পাতা তখন ঝরা পাতার স্থানে নতুন পাতা ওঠার প্রতীক্ষা করতে থাকে। এই ভাবেই পাতার জীবন কাটে, গাছ ঠিক থাকে। পাতা ঝরে আবার নতুন পাতা ওঠে, কত পুরানো পাখীর বাসা ঝড়ে উড়ে যায় আবার নতুন পাখী এসে তার ডালে বাসা বাঁধে। শেষে গাছও একদিন মরে যায়, তার স্থানে আবার নতুন গাছ গজায়। সংহার ও সৃষ্টির খেলা চলে। একটা ঝরাপাতা সরোজের কোলের উপর এসে পড়েছিল, সেটির পানে তাকিয়ে সরোজ এইসব কথা ভাবছিল, এমন সময় ডেভিডের গলা তার চিন্তা টুটে দিলে, ডেভিড বললে—আমি একটু ঘুরে দেখি যদি জল পাওয়া যায়।

তৃষ্ণার সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে। এক চুমুক জল না পেলে প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না। পলাতক যুবরাজ দারা রাজপুতনার মরুভূমির মধ্যে একটু জলের জন্য দিল্লীর সিংহাসনও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল এ ঠিক তেমনই অবস্থা। একটু জল চাই—একচুমুক জল। তৃষ্ণাটা একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বুকটা যেন চেপে ধরেছে।

কিছুক্ষণ বাদে গাছের আড়াল থেকে ডেভিডের আবির্ভাব হলো। সকলে উৎসুক হয়ে উঠলো, সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—জল পেলে?

ডেভিড বললে—জল পেয়েছি, কাছেই একটা ছোট নদী আছে। কিন্তু সেখান থেকে জল আনা বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে।

সকলের দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলো।

ডেভিড বলে চললো—নদীর ধারে গাছের আড়ালে একটা বাড়ী রয়েছে। আসাম অঞ্চলে উঁচু-উঁচু খুঁটির উপর যেমন বাড়ী দেখা যায়, এও ঠিক সেই রকমের। বাড়ীটি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, নদীর তীরে গেলেই সেই বাড়ীর লোকদের নজরে পড়তে হবে। বাড়ীটা কিসের, কারা আছে, জানার জন্য আমি খানিকক্ষণ লুকিয়ে ছিলাম, দেখি একটি বন্দুকধারী যুবক এলে,—দেখে মনে হলো ওটা বোধহয় সৈন্যদের একটা আড্ডা।

সরোজের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। বললো যুবকটিকে কোন্ দেশের লোক বলে মনে হলো ?

—গায়ের রং কালো—হয় সোমালী, না হয় হাবসী !

সরোজ চিন্তিতভাবে বললো—সোমালী হলে বড়ই বিপদের কথা, ওরা ইতালিয়ানদের হয়ে লড়ছে। আমরা যদি ওদের হাতে পড়ি তাহলে ওরা আমাদের ইতালিয়ান ক্যাম্পেই নিয়ে যাবে।

আয়েষা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবার বললে—চলুন তো আমি একবার যাই আপনার সঙ্গে, আমি দেখলেই চিনতে পারবো—যদি সোমালীই হয়, তাহলে ওই এক জায়গাতেই ওরা নেই, এই বনের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে—তাদের এড়িয়ে পালানো বড়ই কঠিন হবে।

আয়েষা উঠে দাঁড়ালো, সাবধানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এগিয়ে চললো ডেভিডের সঙ্গে।

বনের মাঝে গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে একটি ছোট নদী এঁকে-বেঁকে বহে চলেছে। এগিয়ে যাবার পথে বার বার বাধা পেয়ে শীর্ণ জলের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই জলের পানে তাকিয়ে তৃষ্ণার্ত আয়েষার মন এক গণ্ডূষ পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু জলের কাছে যাবার পথ নেই, তটভূমির দুপাশ এমন ফাঁকা যে লুকিয়ে জলে নামার জো নেই।

নদীতীরের শেষ গাছটির আড়ালে দাঁড়িয়ে ডেভিড দেখিয়ে দিলে, আয়েষার চোখে পড়লো গাছের পাতার আড়ালে একখানি বাড়ী। কয়েকটি লম্বা লম্বা বাঁশকে খুঁটি করে দোতলা সমান উঁচুতে একখানি ঘর বাঁধা হয়েছে, ঘরখানি নদীর পাশে এমন একটা উঁচু ঢিবির উপর তৈরী যেন নদীর দুপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বনের ভিতরেও সম্ভবতঃ কিছু কিছু দেখা যায়।

আয়েষা একদৃষ্টিতে সেই মাচা-ঘরের পানে তাকিয়ে রইল, ইচ্ছা হলো একবার ছুটে গিয়ে ওই ঘরখানির সব কটি জানালা দরজা খুলে একবার ভিতরটা দেখে আসে কি আছে ওর মধ্যে। কিন্তু প্রাণের মমতা মনের বাসনা দমিয়ে দেয়। যদি ওটা সত্যই ইতালিয়ান সোমালী সৈন্যদের আড্ডা হয়, তাহলে ওরই আশে পাশে অসংখ্য গুপ্ত-সেনা ছড়িয়ে আছে, একটা সঙ্কেতে চারিপাশের ঝোপঝাড় থেকে অসংখ্য সৈন্যের শিরস্ত্রাণ উঁচু হয়ে উঠবে, অসংখ্য রাইফেলের সঙীন ঝলমল করে উঠবে। কয়েকটি তৃষ্ণার্ত লোককে ধরার জন্য, তাদের গুলি করে মারার জন্য এতো আয়োজন। অথচ তারা ইতালিয়ানদের কোন ক্ষতি করেনি, তবু এরা তাদের বাঁচার অধিকার দেবে না। চোখের সামনে দিয়ে তরতর করে জল বহে যাবে, কিন্তু সেই জল পান করতে গেলেই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। তৃষ্ণাতুর মানুষের প্রতি মানুষের কি চমৎকার সহানুভূতি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর কি মহত্ত্ব।

ঘরখানির যেটুকু দেখা যায়, সামনে একটু বারান্দা, এ পাশে একটা জানালা। খানিকক্ষণ পরে সহসা যেন মনে হলো, জানালার পাশ দিয়ে কে একজন চলে গেল, একটু পরেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো একটী মেয়ে, কিছু পরেই একটি ছেলে এসে মেয়েটির পাশে দাঁড়ালো। ছেলেটির মাথায় কতকগুলি শাদা পালক বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাদের দেখেই আয়েষা ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো, বললো—যাক্, এবার একটু জল খেয়ে বাঁচি! ওরা সোমালী সৈন্য নয়, ওরা বর-কনে।

ডেভিড বললে— বর-কনে? এই জঙ্গলের মধ্যে?

—হ্যাঁ, 'দানাকিল' অঞ্চলের বর-কনে। ওদের প্রথা হচ্ছে বিয়ের পর বর-কনে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দূরে কোথাও সাত দিন নির্জন বাস করে, ওরাও বোধ হয় সেইজন্যেই এখানে এসেছে। ওদের সংগে সাত দিনের মতো খাবারও আছে, চাইলে কিছু পাওয়া যেতে পারে—বলে জল পান করার জন্য আয়েষা নদীতে গিয়ে নামলো।

আয়েষা ও ডেভিড অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ জলপান করলে। শীতল জল গলাধঃকরণ হবার সংগে সংগে বুক তৃপ্তিতে ভরে উঠে, সব পরিশ্রান্তি এক মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায়, মনে হয় প্রতি জলবিন্দুটি যেন এক একটি অমৃতের কণা, দেহে নতুন জীবন সঞ্চার করে। পরম তৃপ্তিতে মুখ থেকে আপনিই উচ্চারিত হয়—আঃ।

জলপান শেষে আয়েষা নদীর তট ধরে সেই ঘরখানির দিকে অগ্রসর হলো। ছেলেটি ও মেয়েটি এতক্ষণ বিশেষ ভাবে তাদের লক্ষ্য করছিল, এবার তারা তাদের ঘরের দিকেই আসছে দেখে ছেলেটি ঘরের ভিতর থেকে একটি বন্দুকে নিয়ে এলো, তারপর সেই সঙ্কীর্ণ বারান্দাতেই বন্দুকটি হাতে নিয়ে হাঁটুর উপর বসলো। তার হাবভাব দেখে ডেভিড বললে—সর্বনাশ গুলি করবে নাকি?

—তা করতেও পারে,—আয়েষা বললে,—আমাদের পরণে ইতালিয়ান পোষাক, তার উপর আপনার কাঁধে একটা বন্দুকও ঝুলছে—এই সব দেখে বেচারা যদি ভয় পেয়ে গুলি ছোঁড়ে, সেটা কি খুব অন্যায় হবে!

—ন্যায় অন্যায় বুঝিনে, আমায় গুলি ছুঁড়লে আমিও ছাড়বো না, বলে ডেভিড কাঁধের বন্দুক হাতে নামিয়ে নিলে।

আয়েষা হেসে বললে—অত ব্যস্ত হবেন না, আমি আছি কি জন্যে?

এই বলে ছেলে ও মেয়েটিকে লক্ষ্য করে আয়েষা আমহায়িক ভাষায় কি চীৎকার করে উঠলো।

সেই চীৎকার শুনে ছেলেটি ও মেয়েটি আরেকবার ভাল করে তাদের পানে তাকালো, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। আয়েষা তাদের কাছে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ কি কথা হলো। প্রথমে বোধহয় আয়েষাকে

ভারতীয় বলে তারা বিশ্বাস করতে চায়নি, শেষে আয়েষা যখন মাথা থেকে

টুপীটি খুলে দীর্ঘ কালো চুলগুলি দেখিয়ে দিলে, তখন তার চুলের কালো রং দেখে ভারতীয় মেয়ে বলে বিশ্বাস করলে।

কথা শেষ করে আয়েষা ডেভিডের কাছে এলো, বললে—ওদের কাছে আর খাবার নেই, সাতদিনের যে খাবার ওরা সঙ্গে এনেছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। আজ ওদের ফিরে যাবার দিন। এখনি ফিরবে, আমরা ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে যেতে পারি। ওরা বলছে ওদের গ্রাম বেশী দূরে নয়, ওদের সঙ্গে গেলে ওরা আমাদের খাওয়াতে পারে।

ডেভিড বললে—শেষে বন্দুকের গুলি খাওয়াবে না তো ?

আয়েষা বললে—না না, ওরা অসভ্যদেশের কালো লোক, সভ্যতার অতো ছলচাতুরী ওদের মধ্যে নেই। তাছাড়া আমরা ভারতের লোক শুনে ওদের আনন্দ হয়েছে, ভারতীয়দের ওরা ভালবাসে।

—বেশ, তবে তাই চলো—।

আয়েষা হাবসী বরকনেকে কাছে ডাকলো, তারপর সকলে মিলে চললো সরোজদের কাছে।

বর-কনের সঙ্গে আবার সুরু হলো পথ চলা।

বনের প্রান্ত যেখানে উষর প্রান্তরের সঙ্গে মিলেছে, সেখান থেকে সুদূর দিগ্বলয় পর্যন্ত একটা বিপর্যস্ত ভাব চোখে পড়ে। ইতস্ততঃ মাটি ফেটে গেছে, এখানে সেখানে ছোট-বড় গর্ত। কাছাকাছি বোধ হয় একটি গ্রাম ছিল,

বোমার বিস্ফোরণে তার সবই লুপ্ত হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু কয়েকটি বাঁশের খুঁটি। মানুষও হয়তো কত পড়ে আছে এখানে সেখানে, কিন্তু এতটা দূর থেকে তা লক্ষ্য করা যায় না। প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একটি সরু পায়ে-চলা পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। প্রায়-সমতল জমি, চলার কণ্ট নেই।

চলতে চলতে পায়ের কাছে একটি ছোট টেনিস-বলের মত কি পড়ে থাকতে দেখা গেল। সরোজ ছুটে গিয়ে বন্দুকের কিরিচ দিয়ে সেটাকে হকি খেলার কায়দায় সট্ করে দিলে।

বলটা খানিক দূরে একটা ঢিবিতে লেগে লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই একটা তীক্ষ্ম শব্দ ও খানিকটা ধোঁয়া।

সেটা বল নয়, একটি বোমা। কাছাকাছি ফাটলে প্রাণান্তকর হতো।

গন্ধকের পীতাভ ধোঁয়া আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে গেল, দৃষ্টির সামনে আবার তেপান্তরের মাঠ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আর সেই প্রান্তরের বুকে ফুটে উঠলো কয়েকটি নরমুণ্ড। আর তারই সঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের নল। বোমা ও কামানের গোলা পড়ে জমির যে সব স্থানে বড় বড় ফাটল হয়েছে, তারই মধ্যে বন্দুকধারী সৈনিকের দল লুকিয়ে আছে সুযোগের সন্ধানে। কোথা থেকে বোমা পড়লো কোথায় ফাটলো, কারা বোমা ফেললে, তাই দেখার জন্য মাথা বের করেছে, আর সেই মাথাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাতের বন্দুকটাও তুলে ধরেছে।

সরোজরা সচকিত হয়ে উঠলো—ওরা শত্রু না মিত্র ?

ইতিমধ্যে বর-কনে তাদের দেখেই আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, হাত তুলে তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

সামনের দল থেকে সে চীৎকারের প্রত্যুত্তরও পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই একজন হাবসীকে গর্ত থেকে লাফিয়ে উপরে উঠতে দেখা গেল, তার মাথায় জমকালো মুকুট দেখলে তাকে দলপতি বলে মনে হয়।

লোকটি কাছে এলো, বর তার সঙ্গে সরোজদের পরিচয় করিয়ে দিলে— ইনিই এখানকার 'গ্যারাজম্যাচ্' মানে সৈন্যাধ্যক্ষ। আর এঁরা হচ্ছেন ভারতীয় ভ্রমণকারী।

গ্যারাজ্ম্যাচের ভ্রূদুটি একবার কুঁচকে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো—ভারত-বর্ষের লোক, তবে ইতালিয়ান পোষাক কেন ?

আয়েষা উত্তর দিলে, বললে—ইতালিয়ানরা আমাদের স্পাই বলে ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্ট-মার্শাল করেছিল, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। কাল সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনারা যদি আগে আমাদেরকে কিছু খেতে দেন !

—অবশ্যই দেবো, তবে আপনাদেরকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে তো কিছুই নেই, কাছেই আমাদের গ্রাম।

—বেশ চলুন।

প্রান্তরের এক প্রান্ত ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে, আবার উপর দিকে উঠে গেছে, যেন সাগরের ঢেউয়ের জল সহসা জমে কঠিন মাটি হয়ে গেছে।

সেই ঢালু জমির একপাশে বনের সীমান্ত এসে মিশেছে। সেই সব গাছপালার ছায়ায় কয়েকখানি বাড়ী, গোল গোল খড়ের ছাদগুলি গম্বুজের মত উপর দিকে উঠেছে, দূর থেকে এক একখানি বাড়ীকে এক একটি ধানের গোলা বলে মনে হয়।

গ্রামখানি পরিত্যক্ত, হাবসীরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, এটি এখন সৈনিকদের একটি সেনানিবাসে পরিণত হয়েছে।

গ্যারাজ্‌ম্যাচ একটি বাড়ীতে এনে সবোজদের বসালো। জল এলো হাতমুখ ধোবার জন্য, তারপর এলো এক এক কাপ কফি ও খান কয়েক করে বিস্কুট।

গ্যারাজ্‌ম্যাচ কথায় কথায় বললে—ইতালিয়ানারা খুব কাছে এসে পড়েছে, পরশু থেকে তারা এই অঞ্চলে প্রচুর বোমা ফেলেছে, গ্রামের লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের সৈন্য না এসে পড়া পর্যন্ত, আমাকেই এখন এদিকে ইতালিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—আপনার অধীনে কত লোক আছে?

—প্রায় দু'শো।

—কামান?

—দুটো।

—দু'শো লোক আর দুটো কামান নিয়ে আপনারা ইতালিয়ান সৈন্যদের রুখতে পারবেন?

—কেন পারবো না? ওরা ভাড়াটে সৈন্য, এসেছে আমাদের দেশ লুঠ করতে, আর আমরা লড়ছি আমাদের দেশের জন্যে, আমাদের ছেলে-মেয়ে ভাই-বোনদের জীবন রক্ষা করতে—ওদের চেয়ে কি আমরা বেশী লড়তে পারব না?

সরোজ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু এখনকার লড়াই তো গায়ের জোরে হাতাহাতি নয় যে, বেশী লোক থাকলে ভাল করে লড়লেই জিতবে। এখন হচ্ছে কল-কব্জার লড়াই, দুটি লোক যদি একখানি বোমারু প্লেন নিয়ে উপর থেকে পাঁচশো পাউণ্ডের বোমা ফেলতে স্থরু করে, তাহলে নিচে দু'হাজার সৈন্য যত ভাল লড়িয়েই হোক না কেন এক ঘণ্টাতেই শেষ।

গ্যারাজ্‌ম্যাচের মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে গেল, বললে—আমাদের যে একেবারে উড়ো-জাহাজ নেই তা নয়, আমাদেরও কয়েকটি উড়োজাহাজ আছে।

ইতালির বিমান-বহরের তুলনায়, আবিসিনিয়ার বিমান-বহর কিছুই নয়, সরোজ ও ডেভিড খবরের কাগজেই তা পড়েছিল, কিন্তু এখানে সে-কথার উল্লেখ করে গ্যারাজ্‌ম্যাচের মনে আঘাত দেবার ইচ্ছা সরোজের আদৌ ছিল না,

সে চুপ করে রইল। গ্যারাজ্‌ম্যাচ্‌ তার মুখের পানে তাকিয়ে তার মনের কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারলো, বললে—আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়বোই। একটি হাবসী জোয়ান বেঁচে থাকা পর্যন্ত ইতালিয়ানরা আবিসিনিয়া ভোগ করতে পারবে না। আমরা জীবন দেব, কিন্তু জন্মভূমি দেব না।

ইতিমধ্যে একজন সৈনিক ছুটে এলো, এমন ব্যস্ত ব্যাকুল তার ভাব যে গ্যারাজ্‌ম্যাচ্‌কে প্রথমে যে স্যালুট দেওয়া প্রয়োজন, সে কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল, কাছে এসেই গরগর করে সে অনেক কথাই বলে গেল, যার একটি বর্ণ সরোজ ডেভিড কেউ বুঝলো না।

সব কথা শুনে গ্যারাজ্‌ম্যাচ ফরাসী ভাষায় সরোজদের বললে—নিন্‌ উঠে পড়ুন. আজ আপনাদের বরাতে আর কোন খাবারই জুটবে না—।

—কেন? কি হয়েছে?

—আকাশের গায় ইতালিয়ান প্লেন দেখা দিয়েছে, তারা এদিকে আসার আগেই আমাদের গা-ঢাকা দিতে হবে, না হলে বোমার মুখ থেকে একটি লোকও বাঁচবে না—এই সব বাড়ী ঘর এখনি ভূমিস্যাৎ হয়ে যাবে...।

এর পর আর কথা নেই। সকলে উঠে পড়লো। খান কতক রুটি ভাজার আয়োজন হচ্ছিল, সে-সব সেখানেই পড়ে রইল। এক বেলা না খেলে খাবার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু একবার বোমার নিচে পড়লে আর জীবন ফিরে পাওয়া যাবে না।

বাতাসে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল, অনেকগুলি ভ্রমর যেন মধুর খোঁজে ফুলের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গর্জন ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। যে শব্দকে মধুপিয়াসী অলির গুঞ্জন ভেবে ভুল করা চলতো, দেখা গেল তা ধ্বংস-প্রয়াসী প্লেনের প্রপেলারের হুঙ্কার। আকাশের এক কোণ থেকে ন'খানি করে বোমারু প্লেনের এক একটি ছোট ছোট স্কোয়াড্রন উড়ে আসছে। একটি দলের পিছনে আর একটি, শকুনির মত আকাশের বুকে পাখা ভাসিয়ে দুর্বার বেগে প্লেনগুলি এগিয়ে আসছে। তাদের গতির পানে তাকিয়ে চুপ করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা ছাড়া হাবসীদের করার কিছু নেই।

—স্‌স্‌স্‌স্‌—বুম্‌ম্‌ম্‌, বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ম্‌ম্‌!

প্লেনগুলি মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে বোমা বৃষ্টি সুরু করলো। ছোট বোমাগুলি অজস্র ধারায় পড়তে লাগল। যে ঘরখানিতে সরোজরা আশ্রয় নিয়েছিল, একটি বোমা ফেটে তার চালায় আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে আরো কয়েকটি বোমা চারিপাশের সব ক'খানি চালাঘরকে অগ্নিময় করে তুললো। কিছুই আর নেই তথাপি ফাঁকা মাঠের উপর বোমা পড়ছে অবিরাম। চারিপাশে শুধুই বোমা ফাটছে, মাটিকে উৎক্ষিপ্ত করছে ধুলো ওড়াচ্ছে, ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলছে. শব্দে কান বধির করে তুলছে! এখন যে কোন মুহূর্তে এই ঝোপটির উপর একটি বোমা পড়লেই সব শেষ।

মনে হয়, এক একটি মুহূর্ত যেন মৃত্যুর এক একটি পরিচ্ছেদ। গতিশীল অনন্তকাল সহসা যেন থেমে গেছে।

বিস্ফোরণের পীতাভ ধোঁয়া যখন সরে গেল, তখন তার পশ্চাতে দেখা গেল লেলিহান অগ্নিশিখা পরিত্যক্ত কুটীরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ব্যস্ত। মাথার উপর ইতালিয়ান প্লেন আর নেই, দিগ্বলয়ের মধ্যে তাদের ধূমেল রেশটুকুও আর চোখে পড়ে না, আকাশ মেঘমুক্ত, পরিস্কার। চারিপাশ আবার শান্ত স্তব্ধ।

বোমাহত অসমতল প্রান্তরের পানে তাকিয়ে গ্যারাজ্‌ম্যাচ্‌ বিউগিল্‌এ ফুঁ দিলেন। সমস্ত প্রান্তর ও বনানী প্রধ্বনিত করে শিঙার ধ্বনি উঠলো ভঁপো ভঁপো পোঁ—

ডাক শুনে একে একে হাবসী সৈনিকেরা এলো, সারি দিয়ে যখন তারা দাঁড়ালো গ্যারাজ্‌ম্যাচ্‌ একবার তাদের পর্যবেক্ষণ করে হিসাব করে নিলেন, তারপর সরোজদের পানে ফিরে বললেন—বিয়াল্লিশ জনকে হারিয়েছি। আমার বিউগিল্‌ শুনে তারা আসতে পারেনি, হয় তারা মরেছে, নাহলে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

—আহতদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন ?

—কিছুই না, ওষুধপত্র ডাক্তার কিছুই এখানে নেই, তাছাড়া তাদের যে হেড্‌-কোয়ার্টারে নিয়ে যাব, তারও উপায় নেই। কুড়ি মাইল পথ, তাদের বহে নিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণে আমরা হয়তো আরেকদফা বিমান আক্রমণে প্রাণ হারাবো। বিয়াল্লিশ জনের জন্য দেড়শো সৈনিককে বিপন্ন করতে পারি না !

—তাহলেও...

—কিছুই নয়, আমরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। যারা গেল, তাঁদের পানে তাকাবার ফুরসৎ তো আমরা পাচ্ছি না, প্রচণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে অমন কত বিয়াল্লিশ জন যাবে, প্রাণ-তো আমাদের বড় নয়, প্রাণের চেয়েও দেশ আমাদের কাছে বড়,—বলে গ্যারাজ্‌ম্যাচ সৈনিকদের পানে তাকালেন, আদেশ দিলেন—শ্রেণী ! ডাইনে সাজ্‌—ও !

দু'সারি সৈনিক একে অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে, দুটি সোজা লাইন হয়ে গেল।

আদেশ হলো - বাঁয়ে ফের্‌—ও, রুজেৎ !

সৈনিকের মার্চ স্বরু হলো।

দীর্ঘ মার্চ। কুড়ি মাইল পথ। পুরো চারটি ঘণ্টা বোমাফাটা উঁচু নীচু প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। এতটুকু বিরতি নেই, শুধু—লেফ্‌ট্‌—রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌ ! মার্চ করার অভ্যাস থাকলেও চলতে চলতে পায়ের শিরায় টান ধরে, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বইতে থাকে। প্রচণ্ড

গ্রীষ্মের রোদ উন্মত্ত প্রান্তরের মধ্যে মানুষগুলোকে যেন পুড়িয়ে দিতে চায়, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে ওঠে। রোদের তীব্রতায় চোখ চাওয়া যায় না, মাথার মধ্যে যাতনা হয়। শরীর শুধু 'জল' 'জল' করে উঠে, তথাপি মার্চের বিরতি নেই। শিক্ষিত সৈনিকের দল কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মানে না, শুধু তারা জানে সামনে এগিয়ে যেতে।

সৈনিকের দল মার্চ করে চলে, পিছনে গ্যারাজম্যাচের সঙ্গে সরোজরাও অগ্রসর হয়।

প্রান্তর সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই, মাঝে মাঝে দু'-পাঁচটি আগাছা ছোট-ছোট ঝোপের সৃষ্টি করেছে। এখানে সেখানে দু'-একটা বড় বড় গাছও চোখে পড়ে, গ্রীষ্মের রোদে ও ঝড়ে তার পাতাগুলি ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেছে, শাখা প্রশাখা অনুশাখা আকাশের পানে শুধু তাকিয়ে আছে মাথা তুলে। ওদিকে সেই ছোট নদীটি উপবীতের মত প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে গিয়ে দূরে কোন অজানা সীমায় হারিয়ে গেছে, তার দু' তটে কিসের যেন সারি সারি ক্ষেত দেখা যায়, ঠিক ঠাহর হয় না।

নির্বিকার যন্ত্রের মত সেন্যের দল মার্চ করে চলে, পায়ে জুতো নেই, তালে তালে পা-ফেলার শব্দও হয় না।

হাবসীদের তাঁবু পড়েছে এক বিরাট জঙ্গলের গা-ঘেঁসে, একপাশে ফাঁকা চাষের জমি, আরেকদিকে দীর্ঘ বড় বড় গাছ। একদিকে দৃষ্টি সুদূর সীমান্তে আকাশের গায়ে বাধা পায়, আরেক দিকে মাথার উপর গাছের পাতা ভেদ করে আকাশে দৃষ্টি পৌঁছায় না। এক ধারে ফাঁকা প্রান্তরে সূর্যের আলো ঝলমল করছে, আরেক ধারে বনানীর পাতার ব্যূহ ভেদ করে চির-আবছায়া। এই দুয়ের মাঝে খাকী রংয়ের তাঁবুগুলো একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে।

তাঁবুর পাশে বনের প্রান্তে একটি বড় গাছতলায় কয়েকখানি বেতের মোড়ায় ক'জন লোক বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবও ছিলেন। গ্যারাজম্যাচ এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে কি বললো, সাহেব উঠে এসে সরোজদের বললো গুড মর্ণিং ডিয়ার ফ্রেন্ডস! শুনলুম আপনারা ইণ্ডিয়ানস?

—হ্যাঁ, আপনি?

—বেলজিয়ান।

গ্যারাজম্যাচ পরিচয় দিলে -ক্যাপটেন মোজারিক জনসন, এখানকার অফিসার কম্যানডিং।

সরোজ ডেভিড প্রভৃতি একে একে ক্যাপটেনের সঙ্গে করমর্দন করলো।

ক্যাপটেন জনসন লোক ভাল। তাঁর আদর-আপ্যায়নে, কথায়বার্তায় এমন হৃদ্যতা ও সরলতা আছে যা সহজেই লোককে ঘনিষ্ট করে তোলে। কোথাও এতটুকু সেনাপতির হামবড়া ভাব ফুটে ওঠে না।

ক্যাপ্টেনের অধীনে হাজার পাঁচেক সৈন্য আছে, কয়েকটি মেশিনগানও আছে।

গাছতলায় বসে বসে কফি খেতে খেতে ক্যাপটেন বললেন—আমাদের কাছে এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে, দুনিয়া সম্বন্ধে কথা বলার তবু ক'জন লোক পেলাম। এই অঞ্চলে কথা বলার মত শিক্ষিত হাবসী নেই। নিজেদের অশিক্ষিত করে রেখেই এরা নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। না হলে, আজ কি ইতালিয়ানরা এদেশ আক্রমণ করতে সাহস পেত?

—এই লড়াইয়ের কি ফল হবে বলে, আপনার মনে হয়?—ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো।

—ইতালিয়ানরাই জিতবে। লক্ষ লক্ষ হাবসী প্রাণ দিয়ে লড়ছে, কিন্তু এ লড়াইয়ের কোন মূল্যই নেই। এ এরোপ্লেনের যুগ। দু' হাজার লোককে দু' ঘণ্টার মধ্যে দু'টি লোক বোমা ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, দু' হাজার লোকের গায়ে যত জোরই থাক না কেন, কোন কাজে আসবে না—এরোপ্লেন থেকে বোমা পড়বে আর মরবে।

—আপনাদের কি মোটেই প্লেন নেই?

—আছে কিন্তু সংখ্যায় বড় কম। তার উপর হাবসীরা কেউ এরোপ্লেন চালাতেই জানে না, যে ক'জন বৈমানিক আছেন তাঁরা ডাচ্, আমেরিকান, না হলে রাশিয়ান।

—এরোপ্লেন না থাক্, এরোপ্লেন মারা কামানের ব্যবস্থা করেন নি কেন?

—ব্যবস্থা তো করেছিলাম বিদেশে কতকগুলি কামানের অর্ডারও দিয়েছিলাম। কিন্তু লিগ্-অফ্-নেশন্স্এ জাপান, জার্মান, ইংরেজ ও ফরাসী শান্তির বৈঠক বসিয়ে আমাদের যুদ্ধের উপকরণ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। আফ্রিকার এই একমাত্র স্বাধীন দেশকে পরাধীন করার জন্য তারা সবাই শঠ্ করেছে।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন থেমে গেলেন, উঠে সামনের দিকে ক'পা এগিয়ে গেলেন, সকলে তাঁর অনুসরণ করে দেখলো একটি কালো ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক দিগ্বলয়ের প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে। ইস্প্রিঙের দম দেওয়া পুতুলের মত নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে—কালো ঘোড়ার পিঠে কালো একটি মানুষ।

ঘর্মাক্ত অশ্বারোহী ক্যাপ্টেন জন্সনের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো। স্যালুট্ করে সে একখানি চিঠি দিলে ক্যাপ্টেনের হাতে।

চিঠি পড়ে ক্যাপ্টেনের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, পত্রবাহকের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন।

তারপর তাঁবুর ভিতর থেকে একখানি প্ল্যান এনে সরোজদের সামনে মাটির উপর ছড়িয়ে দিলেন, বললেন—পূর্ব দিকে ইতালিয়ানরা পঁচিশ মাইলের মধ্যে

এগিয়ে এসেছে, আজ রাতেই এখান থেকে সরে যেতে হবে। এই ফাঁকা মাঠে তাদের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না।

সরোজ বললো—কেন, এই জঙ্গলের আড়াল থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালান না ?

—সে তো চালাতেই হবে,—ক্যাপ্টেন বললো,—কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য, বিষ-গ্যাস ছাড়লেই সব ঠাণ্ডা...

—কেন গ্যাস মুখোস ?—ডেভিড বললে।

—আমাদের নেই বলে ক্যাপ্টেন সহযোগীদের ডেকে একটির পর একটি আদেশ দিতে লাগলেন। বিউগিলের সঙ্গে সেই আদেশ তাঁবুর এক দিক থেকে আর-একদিকে পৌঁছে গেল। অসংখ্য সৈনিক চঞ্চল হয়ে উঠলো। চারিপাশে তাড়াহুড়ো...তাঁবুর দড়ির পট্ পট্ শব্দ...কামানের চাকার ঘর্ঘর...সৈনিকদের চঞ্চল সজীবতা আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাব্যতায় চারিপাশের বাতাসকে ভারী করে তুললো।

তাঁবু তুলে, বন্দুক কামান ও আর-সব জিনিষপত্র নিয়ে সৈনিকের দল যাত্রা করার জন্য তৈরী হলো।

আরেকটি ছোট দল গাছের আড়ালে আড়ালে কামান পেতে তৈরী হতে লাগলো, ইতালিয়ানরা যদি আক্রমণ করে, সেখানে তাদের খানিকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে, অপর বাহিনীটি যাতে ততক্ষণে নিরাপদে প্রান্তর পার হয়ে 'দেসি'তে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

হঠাৎ সৈন্যদলের মধ্যে চীৎকার উঠলো।

ক্যাপ্টেন একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। বাইনোকিউলারটা নিয়ে পূর্বদিকের আকাশটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর একজন আরদালীকে ডেকে কি আদেশ করলেন, তখনই বিউগিল বাজলো পোঁ—ভোঁপো—ভোঁ—!

সৈন্যদল বিউগিলের সঙ্কেতে সশস্ত্র হয়ে উঠলো। যেখানকার-যা জিনিষপত্র সব রইল পড়ে, পিঠের ঝোলা আর কাঁধের বন্দুক নিয়ে তাড়াতাড়ি সব এসে ঢুকলো পাশের জঙ্গলে, গাছের আড়ালে, পাতার আবছায়ায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফাঁকা প্রান্তরে আর একটি লোককেও দেখা গেল না।

আকাশের সীমায় একখানির পর একখানি প্লেন দেখা দিল। বাতাসের ঢেউয়ে এলো মৃদু গুঞ্জনের রেশ। প্রতীক্ষমান সৈন্যদলের মাথার উপরে ভেসে এলো এরোপ্লেনের ঝাঁক।

মাথার উপর এসে প্লেনগুলি একবার থমকে দাঁড়ালো, পড়ে-থাকা তাঁবু আর জিনিষপত্রগুলো বুঝি একবার দেখে নিল তারপর আবার এগিয়ে চললো।

রবি দত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক্, এবার তাহলে আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি।

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন—ধুলো ঠিকই দিয়েছেন, তবে ধুলোর সঙ্গে কিছু বালি ছিল, সেগুলো বেচারাদের চোখে পড়ে বড় কর কর করছে, তাই এখনি বোমা ফেলে তারা তার শোধ নেবে।

—ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।

—দেখতে পায়নি বটে কিন্তু আমরা কোথায় আছি তা তারা বুঝেছে। এই অঞ্চলে বিশ মাইলের মধ্যে আর কোথাও সৈন্যদের ছাউনি পড়েনি।

—তবে যে ওরা চলে গেল ?

—একটু এগিয়ে গিয়ে দেখছে আমাদের অবস্থাটা কি, তারপর এসেই বোম্বার্ডমেণ্ট সুরু করবে।

ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছিলেন। ইতালিয়ান প্লেনগুলি দিগ্বলয়ের সীমা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলো। তারপর অরণ্য আর প্রান্তরে সুরু হলো অজস্র বোমাপাত- বুম্ ! বুম্ !! বুম্ !!!

শুধু বোমা আর বোমা। বৃষ্টিধারার মত অজস্র বোমার ধারা। কোনটি মাটিতে পড়ে, কোনটি গাছের ডালের সংঘাতে ফেটে যাচ্ছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। কান বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এপাশে। ওপাশে। মাথার উপর। শুধুই—বুম্-বুম্, বুবুম্-বুম্।

প্রতিটি মুহূর্ত সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

সৈনিকেরা মাথার উপর তাকিয়ে আছে, কখন কোথা দিয়ে মাথার উপর বোমা এসে পড়ে। এদিকে ওদিকে অতর্কিতে বোমা পড়ে তাদের আহত করছে। আহতের আর্ত চীৎকার বনভূমিকে ব্যাথাতুর করে তুলেছে। সে আর্তনাদ আকাশের উড়ন্ত প্লেনগুলিতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কি না, কে জানে। কিন্তু প্লেনগুলি ঘুরে ঘুরে আরো নিচে নেমে আসছে, আরো ঘন বোমা বর্ষণে বনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অসহায় আহত হাবসী-সেনাদের আর্তনাদ তার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। গাছের আশ্রিত পাখীগুলি ভয়ে তীক্ষ্ন কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠছে, ধূমেল বোমায়িত বনভূমির আবছায়ায় সে ডাক প্রেতাত্মার অট্টহাসির মত শোনাচ্ছে।

আর্তনাদ যত করুণ যত তীব্র হয়ে উঠে, বোমার বিস্ফোরণ যত বীভৎস, যত ভয়ঙ্কর হয়ে শোনা যায়, সরোজ ও ডেভিডের দেহের রক্ত ততই চনচন করে ওঠে। তারা পুরাণো সৈনিক। শত্রুর বোমার সামনে এমনি নিশ্চেষ্ট থাকার অভ্যাস তাদের নেই। সরোজ বলে এমনিভাবে আর কতক্ষণ চুপ করে থাকবেন, ক্যাপ্টেন ? কামান চালাবার আদেশ করুন।

বাইনোকিউলারটি হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন এতক্ষণ একবার মাথার উপর আকাশের পানে, একবার দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের পানে তাকিয়ে জেলখানার সঙ্গীহীন সেলে আট্কে-থাকা কয়েদীর মত ছট্পট্ করছিলেন, সরোজের কথা শুনে হাসলেন, বললেন—আদেশ তো দোব, কিন্তু কামান চালাবে কে ? প্লেন-মারা কামান চালাতে পারতো মাত্র দু'জন, কাল তারা মারা গেছে।

'দেসি'-তে খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও তো সেখান থেকে লোক এসে পেঁছালো না।

রবিদত্ত টিপ্পনী কাটলো—লোক দেখানো দুটো কামান রেখেই ভেবেছিলেন বুঝি যে ইতালিয়ানরা ওই দেখেই পালিয়ে যাবে ?

সরোজ বললো—এ কথা আমাদের এতক্ষণ বলেননি কেন ক্যাপটেন্ ? একটা কামান আমাদের ছেড়ে দিন. আমরা একবার দেখি।

—আপনারা কামান চালাতে জানেন ?

—গত যুদ্ধের সময় জার্মান লাইনের কত প্লেন আমাদের এক এক 'সেলে' মাটিতে আছড়ে পড়েছে।

—এতক্ষণ সে কথা আমায় বলতে হয়। আসুন এদিকে—বলে সরোজের একখানি হাত ধরে ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেলেন। বোমা-ফাটার গোলযোগের আর ধোঁয়ার আঁধারের মধ্যে দিয়ে খানিকটা যাবার পর এক গাছের নিচে একটি প্লেনমারা কামান চোখে পড়লো। কামানটিকে ঘিরে ক'জন হাবসী সৈন্য বসে ছিল, ক্যাপ্টেনকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন তাদেরকে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর সরোজের পানে মুখ ফিরিয়ে বললেন—নিন্, আপনারা সুরু করুন, এরা আপনাদেরকে সাহায্য করবে।

সরোজ ও ডেভিড কামানের কাছে এগিয়ে গেল। নেড়েচেড়ে দেখলে সব ঠিক আছে কি না। তারপর 'রেঞ্জ' ঠিক করে একটি গোলা চাড়িয়ে ছুঁড়তে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। যে গাছটির নিচে তারা দাঁড়িয়েছিল তার উপর একটি বোমা পড়ে সশব্দে ফেটে গেল। বোমার কয়েকটা টুকরো ছিট্কে এলো নিচের দিকে, তার আঘাতে রবিদত্ত ও গাইড মূর্ছিত হলো।

গোলা আর ছোঁড়া হলো না, সরোজ ও ডেভিড তাদের দু'জনকে তুলে নিয়ে, একটু তফাতে ফাঁকা মাঠে এনে শুইয়ে দিলে। গাছের নিচে বনের ছায়া তখন আর মোটেই নিরাপদ নয়, ইতালিয়ানদের অবিশ্রান্ত আগুন-জ্বালানো বোমা অসংখ্য গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুড়ে-মড়ার ভয়ে হাবসী সৈন্যেরা আহত সঙ্গীদের নিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে আসছে। চারিদিকে হৈ চৈ, অধৈর্য, বিশৃঙ্খলা।

সরোজ ও ডেভিড, গাইড ও রবি দত্তের আঘাত পরীক্ষা করছিল, ক্যাপ্টেন পাশে এসে দাড়ালো, বললো—আঘাত সামান্য বলেই মনে হচ্ছে, আমি এদের প্রাথমিক চিকিৎসা করছি, আপনারা কামান চালানগে, নাহলে আজকে একটা লোকও আর বাঁচবে না।

ইতিমধ্যে উপর থেকে একঝাঁক মেসিনগানের গোলা এসে পড়লো। ইতালিয়ান এতক্ষণ সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। হাব্সীরা বনের অন্তরাল থেকে ফাঁকা মাঠে আসায় সেই সুযোগ মিলে গেল। বোমা ছেড়ে তারা মেসিন-গান ধরলো। ঝাঁকে ঝাঁকে মেসিনগানের গোলা নিচে নেমে আসতে লাগলো।

বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ফাঁকা মাঠে ছুটে এসেছিল, গোলার আঘাতে তারা রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে দেখে সরোজের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। খৃস্টান হয়ে যীশুর শান্তি ক্ষমা ও প্রীতির নীতি না মেনে ইতালিয়ানরা যদি এমন নিষ্ঠুরভাবে মানুষ খুন করতে পারে, তাহলে খড়্গধারী রক্ত-পাগল ছিন্নমস্তার উপাসকেরা এই অত্যাচার চুপ করে দেখে কি করে! সরোজ তাড়াতাড়ি কামানের কাছে ছুটে গেল, চীৎকার করে বললে—সেল চড়াও!

ডেভিড বললে—সেল দেওয়াই আছে।

—অলরাইট,—বলে মাথার উপর প্লেনগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে সরোজ গোলা ছাড়লো...বুম্‌ম্‌!

শোঁ করে দুরন্ত সাইক্লোনের মত শিষ্ দিতে দিতে গোলাটা ছুটে গেল আকাশের পানে।

মাথার উপরে কাছাকাছি যে প্লেনখানি উড়ছিল, তার উপর দিয়ে আচম্বিতে একটা ঝড় বহে গেল। গোলার আঘাতে একপাশের একখানি পাখা প্লেনচ্যুত হয়ে ছিটকে উপর দিকে উঠে গেল। একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে বোমারু প্লেনখানি কলছেঁড়া ঘুড়ির মত লটপট করতে করতে নিচের দিকে নামতে লাগলো। চারিপাশে হাব্‌সীদের উল্লাস-ধ্বনি শোনা গেল।

দেখতে দেখতে চালক সমেত প্লেনখানি ফাঁকা মাঠের উপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। হাব্‌সীরা উল্লাসে আবার চীৎকার করে উঠলো।

প্রথম সাফল্যের উত্তেজনায় সরোজ ডেভিড উল্লসিত হয়ে উঠলো। বন্ধু ও আত্মীয়, দেশ ও বিদেশ, অতীত ও ভবিষ্যৎ সব তখন তাদের মন থেকে মুছে গেছে, বুকের মাঝে কাঁপছে যোদ্ধার মন, দেহে শত্রু-বিরোধী অদম্য সাহস, মনে হত্যাকারীর নিষ্ঠুর স্পর্ধা। সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে—গোলা, কামান, পাশের কমরেড্ ও মাথার উপরে শত্রু।

ডেভিড আরেকটি সেল চড়ালো। সরোজ কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলে—শাঁ করে গোলাটা ছুটে গেল, বুম্ করে ফেটে পড়লো উড়ন্ত একখানি প্লেনের গায়ে। ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারটা ঘুরতে ঘুরতে ছিট্‌কে গেল, সশব্দে মেশিনটা গেল ফেটে। অগ্নিশিখার লাল্‌চে আভা প্লেনটিকে গ্রাস করলো। প্লেনখানি মাটিতে আছড়ে পড়লো। প্রচণ্ড উল্লাসে হাব্‌সীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। ক্যাপ্‌টেন সরোজের পিঠ চাপড়ে বললেন—ব্রেভো!

ডেভিড আবার সেল্ চড়ালো। কিন্তু এবার আর কোন প্লেন আহত হলো না। প্রতিদানে এক ঝাঁক গোলা এসে পড়লো সরোজের চারিপাশে। ধুলো ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, চোখে আর কিছুই দেখা গেল না, তথাপি সরোজের হাত থামলো না। মাথার উপর কিছু না দেখেই তারা কামান দাগতে লাগলো।

ইতালিয়ান প্লেনগুলি ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে, আত্মরক্ষা করার জন্য এক ঝাঁক গোলা ছুঁড়ে কামানের রেঞ্জের উপরে উঠে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে ধূমের অন্ধকার যখন কেটে গেল, হাবসীরা দেখলে আকাশ ফাঁকা। কিছুক্ষণ আগেও যে কয়েকখানি বোমারু প্লেন মাথার উপর উড়ছিল, তখনকার আকাশ দেখে তা মনেও হয় না।

সন্ধ্যার আবছায়ায় ক্যাপটেন জনসন সৈন্য সমাবেশ করলেন। হাজার পাঁচেক সৈন্যের মধ্যে তখনও হাজার তিনেক সুস্থ ছিল আর দু হাজারের মধ্যে শ'দুয়েক আহতকে মাত্র উদ্ধার করা গেল, বাকী সেই অগ্নিময় জঙ্গলের মধ্যেই নিরুদ্দিষ্ট রয়ে গেল। সময় ছিল অল্প, ইতালিয়ানদের নাগালের বাইরে শীঘ্র সরে পড়া প্রয়োজন, অনুসন্ধানেরও অবসর পাওয়া গেল না।

ক'মিনিটের মধ্যেই ফাইল ঠিক হয়ে গেল। অজগর সাপের মত সৈন্যদলের দীর্ঘ লাইন। পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান, অশ্বতরের পিঠে জিনিষপত্র ও তাঁবুর সরঞ্জাম, এবং সবার শেষে অশ্বতরের পিটে বাঁধা মাচার উপরে আহতেরা।

অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী পিছু হটছে। ইতালিয়ানদের গোলা ও বোমার মুখ তারা দাঁড়াতে পারছে না। ট্রেঞ্চ-কাটার সুবিধা হয়নি। পিছু না হটে উপায় নেই। ক্যাপটেন জনসন বুঝেছেন ইতালিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখতে হলে সমতল প্রান্তরের মাঝে মুখোমুখি দাঁড়ালে চলবে না, বন্ধুর পাহাড়ে পাহাড়ে সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, সুযোগ পেলেই আড়াল আবডাল থেকে চালাতে হবে গেরিলা যুদ্ধ। সেইজন্যই 'দেসির' পাহাড়ী অঞ্চলে তিনি সৈন্য পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে—

সে রাত্রির মার্চ সত্যই স্মরণীয়। সামনে ও পিছনে দিগ্বলয়ের বাঁকা রেখা আবছা হয়ে গেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে মাটির ঢেউ উঠছে নামছে, সামনের প্রান্তরকে পৌঁছে দিয়েছে একেবারে আকাশের গায়। চাঁদের আলোয় গাছপালাগুলো দৈত্যের মতো রহস্যময়। পিছনে বহ্নিমান বনের ধোঁয়ার পানে তাকিয়ে মনে হয় মৃত্যু-দেবতার পূজার আগে কে যেন প্রকাণ্ড একটা ধুনী জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখানে সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য বন্য আগাছার ঝোপ, যেন এক একটি হিংস্র জানোয়ার শীকারের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে এঁকে-বেঁকে পথহীন প্রান্তরের বুক চিরে সৈন্যদল মার্চ করে চলে।

মাঝে মাঝেদমকা হওয়ার এক একটি ঝাপটাস্নেহের পরশদিয়ে তাদের শ্রান্তি মুছে নেবার চেষ্টা করে আকাশে পেঁজা-পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলির পানে তাকিয়ে সেই সীমাহীন তেপান্তরের অন্ধকারে সৈন্যদের বড় একা-একা মনে হয়। মৃত্যুর বিষন্নতা সবাকার মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। শত শত নির্বাক সেনা সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চলে, মন পড়ে থাকে ফেলে-আসা কোন সুদূর কুঁড়ে ঘরে। মা-বাপ ভাই-বোন বউ-ছেলের মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর হয়তো সেই সব আপনজনদের কাছে ফিরে যাওয়া হবে না।

বোমা কি বিষ-গ্যাস মরণের অন্ধকারে তাদেরকে অবলুপ্ত করে দেবে—শান্তিতে পৃথিবীর এক কোণে পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলের পাশে কি নদীর ধারে একটুকরো জমিতে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করার সুবিধা আরেক দেশের মানুষ তাদেরকে দেবে না। এক দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আরেকদল বড় হবে, এটাই নাকি সভ্যতা। বেদের যুগ থেকে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস এই দস্যুতারই ক্রমোন্নতি লিপিবদ্ধ করে গেছে। ইতালিয়ানদের এই আবিসিনিয়া-অভিযানও সেই সভ্যতারই সবচেয়ে আধুনিকতম কাহিনী। বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্য এই দুর্দান্ত সভ্যতা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেননি, তাঁদের বাণী মানুষ শুনেছে—কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করেনি।

সরোজ ভাবে, মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায়ের জন্য। এই দুর্যোগের দিনে আবিসিনিয়ার দুর্গম অরণ্য পাহাড় ও সন্ত্রস্ত জনপদের মধ্যে কোথায় তারা হারিয়ে গেছে, আর কোনদিনই হয়তো সেই দুর্দান্ত কাপালি. র কবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা যাবে না।

সরোজ উন্মনা উদাস হয়ে যায়, মন-হীন মেশিনের মত এগিয়ে চলে।

কোন এক সময় ক্যাপটেন জনসন চিন্তাতুর সরোজকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—দেখুন সরোজবাবু, আপনারা দু'জন আমাদের একটা প্লেন-ধ্বংসী কামান চালাবার ভার নিন। আমার তিনহাজার সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যে ঐ কামান ধরতে জানে, আপনাদের এই ভারটি নিতে হবে।

সরোজ বললো—কিন্তু জানেন তো আমরা দুটি হারাণো বন্ধুকে খুঁজতে বেরিয়েছি, তাদের না পেলে···

—দেখুন,—বাধা দিয়ে ক্যাপটেন বললেন—যেভাবে ইতালিয়ানরা বোমা ফেলছে তাতে বন্ধুদের হয়তো কোনদিনই আর খুঁজে পাবেন না, তার উপর এই যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধান করাও সম্ভব নয়।

—তা জানি,- সরোজ বললে, কিন্তু সেকথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাছাড়া আমরা তো এখানে কামান চালাতে আসিনি।

—আমিও কি এখানে 'অফিসার' হয়ে এসেছিলাম,—জনসন বলেন—কিন্তু যখন দেখলাম আমার সামনে নিরীহ শিশু ও মহিলারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হচ্ছে, পুরাণো সৈনিক হয়ে চুপ করে থাকি কেমন করে? হোক না ওরা কালাআদমি, তাবলে কি ওরা মানুষ নয়; ভগবান যীশুও তো কালাআদমিই ছিলেন।

তথাপি সরোজ আপত্তি তুললো কিন্তু—

জনসন বললেন--কিন্তুর কিছু নেই। বন্ধুদের খুঁজতে খুঁজতে যদি আবার আপনারা ইতালিয়ানদের হাতে পড়েন তাহলে তখনি কোর্টমার্শাল হবে। তাছাড়া উপস্থিত আপনাদের যে দু'জন সঙ্গী বোমার আঘাতে আহত হলো, আপনারা তার শোধ নেবেন না?

ডেভিড বললো—ইতালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের তো কোন শত্রুতা নেই।

জনসন বললেন—বন্ধুত্বই বা কি আছে? শান্তিপূর্ণ শহরের নিরীহ মানুষদের যারা নিষ্ঠুরভাবে বোমা মেরে হত্যা করতে পারে তারা জগতের শত্রু—তাদের সঙ্গে কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো মানুষেরই বন্ধুত্ব থাকতে পারে না, থাকা উচিৎও নয়। আজ তারা এখানে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, কাল তারা আরেক দেশে তার পুনরাবৃত্তি করবে। তাদের বাধা দিতে হবে। এই অসংখ্য শান্তিপ্রিয় নিরীহ নরনারী ও শিশুকে কেন তারা খুন করবে? আপনার হাতে শক্তি আছে, আপনি তাদের বাধা দিন। আপনারা হিন্দু, শুনেছি—দরিদ্র জনগণই আপনাদের ভগবান, দুর্গতসেবাই আপনাদের ধর্ম, আপনারা স্বধর্ম পালন করুন।

সরোজ কোন কথা বললো না।

জনসন তার হাতে একটি ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—কথা বলছেন না কেন? আমি অন্যায় কিছু বলেছি?

সরোজ বললো—বেশ, তবে তাই হোক।

সকাল হলো পূর্বদিকের আকাশে উষার আলো নানান রঙে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের একটা প্রান্ত রঙে রঙীন হয়ে উঠছে। সেই রঙের রেশ আকাশের বুক থেকে পাহাড়ের মাথায়, গাছের সবুজ পাতায়, ধূসর প্রান্তরে ও সেনাবাসের সাদা তাঁবুর গায় নেমে এলো। ঝির-ঝিরে বাতাসে রঙীন পাখীর ডাকে ভোরের আনন্দ যখন ছড়িয়ে পড়লো, সেই সময় সরোজরা দেসিতে এসে পেঁছালো।

সুইডিশ জেনারেল এরিক্ ভার্জিন, বেল্‌জিয়ান্ ক্যাপ্‌টেন মোজারিক্ জনসনকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, সরোজদেরও আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হলো না, ক'দিন পরে আজ আহারাদিও ভাল হলো : প্রচুর দুধ, রুটি, মাখন। 'মধু-মাখনের দেশ' বলে আবিসিনিয়ার যে খ্যাতি এতদিন শোনা গিয়েছে, আজকের আহার্য থেকেই তা বেশ বোঝা গেল।

আহারাদির পর সরোজরা বেরিয়ে পড়লো বন্ধুদের দেখতে।

সৈন্যদের ছাউনি থেকে পোয়াটাক পথ গেলেই হাসপাতাল, তারপর সুরু হয়েছে সহর।

হাসপাতালের ফটকে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা আছে—তাকারী ম্যাকোনেন হাসপাতাল। ভিতরে ঢুকে চোখে না দেখলে আবিসিনিয়ার কোন সহরে এমন একটি হাসপাতাল যে থাকতে পারে এ যেন সহজে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আবিসিনিয়ার অসভ্য কালা-আদ্‌মিদের যে তথ্য এতদিন ইউরোপের লোকেরা কাগজে ছেপে প্রচার করছে, সে-সব যারা পড়েছে তাদের কাছে এমন হাসপাতাল যেন স্বপ্নকথা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দু'সারি বিছানা, ওষুধ-পত্র নার্স-ডাক্তার—কিছুরই অভাব নেই। চারিপাশে একটি মার্জিত শিষ্টতা ও শালীনতার আভাস।

সব ক'জন ডাক্তারই সাহেব—সুইডিশ, আইরিশ, ফরাসী, ইংরেজ ও জার্মান। ইউরোপের বিভিন্নজাতির রেডক্রশ সমিতির যে সব ডাক্তার মানুষের সেবা করাই বড় ধর্ম বলে মনে করেছেন তাঁরাই এখানে ছুটে এসেছেন আহত নরনারীর সেবা করার জন্য। একদল লোকের কাছে মাটির চেয়ে মানুষের দাম কম, মাটির লোভে বোমা ও কামানের আঘাতে তারা সুস্থ ও সবল মানুষগুলোকে হত্যা করে চলেছে, আরেকদল তাদের প্রাণরক্ষা করার জন্য আহত দেহগুলোকে কার্যক্ষম করে তোলার জন্য আপ্রাণ সাধনা করছে। পশু-শ্রেষ্ঠ মানুষের সামাজিক নিয়মকানুন ভারী চমৎকার। একটি লোক খুন হলে হত্যাকারীর ফাঁসী হবে, কিন্তু যখন দলে দলে মানুষ নিহত হবে,—একটা জাতি উজাড় হয়ে যাবে, তখন সেই হত্যাকারী দলের নায়ক হবে দিগ্বিজয়ী বীর : আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস-সিজার, তৈমুরলঙ্, নেপোলিয়ন ; নিহত ও পরাজিতদের সব সম্পত্তি তখন তারা রাজার হালে ভোগ করবে, তারা যে তখন বিজয়ী।

হাসপাতালে সব বেডই ভর্তি, আহত সৈনিকের জন্য হাসপাতালের মেঝেতে পর্যন্ত বিছানা করতে হয়েছে। অস্ফুট গোঙানি ও কাৎরাণি বাতাসকে ভারি করে তুলেছে।

নার্সকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে নার্স একদিকের দুটি বেড দেখিয়ে দিলে : রবি দত্ত ও গাইড পাশপাশি শুয়ে আছে, হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ডাক্তার বললেন—দুর্ভাবনার কিছুই নেই, হাতে ও মাথায় সামান্য চোট লেগেছে, সাত-আট দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন ঘুমোচ্ছে, ডাকবেন না।

সরোজরা হাসপাতাল থেকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরলো।

সারা রাত জেগে দীর্ঘ পথ চলার পরিশ্রমে দুপুরের ঘুমটা একটু গাঢ় হবারই কথা, কিন্তু সহসা বিউগিলের কর্কশ সাইরেন সে সুনিদ্রা ভেঙ্গে দিল। চোখ মেলেই সরোজ দেখে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে, কামান সাজানো হচ্ছে, একদিকে যে খানিকটা ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে সেখানে পদাতিক সৈন্যের দল নিজ নিজ স্থান দখল করতে ব্যস্ত, বাকী সৈন্য ছাউনির পিছনে সহরের ঘরবাড়ীর আড়ালে সরে যাচ্ছে। এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি, চারিদিকে একটি গোলমাল, চেঁচামেচি হৈ-চৈ।

বায়োস্কোপের ছবির পানে লোকে যেমন কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে, সরোজ তেমনি অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল, এমন সময় ক্যাপ্টেন জনসনের ঝাঁকানিতে তার চমক ভাঙলো—কই, মিস্টার সরোজ চলুন—।

—কোথায় ?

—কামান চালাতে, ইতালিয়ান প্লেন আসছে। আপনি কি জেগে ঘুমোচ্ছেন নাকি ?

সরোজ উঠে পড়লো, বললো—অলরাইট, আমি প্রস্তুত !

ক্যাপ্টেন ডাকলেন—মিস্টার ডেভিড !

—ইয়েস, আই এ্যাম রেডি !

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়লো।

কাছেই একটি প্লেনধ্বংসী কামান ছিল। কামানের মুখ ফিরিয়ে বোমারু প্লেনের আগমন প্রতীক্ষায় সরোজ ও ডেভিড অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রপেলারের গর্জন কানে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে দেখা গেল : প্লেনগুলি ধীরে ধীরে পূর্বদিকে দিগ্বলয় থেকে উদয় হয়ে উত্তরের আকাশে অস্ত গেল। আবার তাদের দেখা পাবার প্রত্যাশায় সৈন্যরা কিছুক্ষণ উন্মুখ হয়ে রইল, কিন্তু আর তারা উদয় হলো না।

কালবৈশাখীর ঝড়ো রাতে অন্ধকারে বিদ্যুতের চক্মকি জ্বালিয়ে বজ্রপাত লোককে যেমন সচকিত করে, সেদিন রাত্রির অন্ধকারে অসংখ্য বোমার বিস্ফোরণ ও সন্ধানী আলোর তীব্র ঝল্মলানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হাবসী সেনাদের তেমনি চমকে দিলে। চোখ থেকে ঘুম ছাড়ার আগেই বিউগলের তীব্র ধ্বনি কানকে আহত করলে—ভপো, ভপো, পো—প্রস্তুত হও সৈন্যদল,...শত্রু...!

ঘুম থেকে উঠেই সৈন্যেরা আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মাথার উপর ইতালিয়ান প্লেন থেকে বড় বড় সার্চ-লাইটের জোরালো আলো হাবসী সেনাদের ছাউনির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বারবার ঝল্সে দিতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বোমা আর সেল্ ফাটার শব্দ...আলোর দীপ্তি... মাটির কাঁপন...সৈন্যদের গোলযোগ...আহতের আর্তনাদ...

সাগরের জলরাশি তটের আঘাতে যেমন অবিরাম গর্জন করে, বোমা ও সেলগুলি মাটির আঘাতে তেমনি চারিপাপে ফেটে পড়ছে। শধু একটানা বাতাস-কাঁপানো বুম্ বুম্ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, অন্ধকারে অজস্র ধোঁয়া আর ধুলো। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে, গন্ধকের গন্ধে নিঃশ্বাস হয়ে আসছে রুদ্ধ।

সহসা পাশ থেকে কার চীৎকার সরোজের কানে এসে লাগলো—ওয়াটার —ওয়াটার, ওঃ !

মরণোন্মুক্ত আহত মানুষের একবিন্দু জলের পিপাসা !

আহত বিদেশীকে দেখবার জন্য সরোজ মুখ ফেরালো, কিন্তু ধুলো ও ধোঁয়ার মাঝে কিছুই নজরে পড়লো না। কাছে আর একটি বোমা পড়ে সেই আর্তনাদ চাপা দিয়ে দিলে। তবু সেই কথার সুরটা সরোজের কানে যেন বাজতে লাগলো, তার সারা দেহের সব স্নায়ুগুলোকে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে চঞ্চল করে তুললো। প্লেনধ্বংসী কামানের পাশেই সে শুয়েছিল, ডাকলো —ডেভিড ! ডেভিড !!

—ইয়েস্ !

—সেল !

—ইয়েস্—!

ডেভিড সেল্ এগিয়ে দিলে, সরোজের হাতের কামান মাথার উপর অন্ধকার আকাশের পানে গর্জন করে উঠলো, অনির্দিষ্ট অন্ধকারে জ্বলন্ত গোলাটা শন্‌শন্ করে ছুটতে ছুটতে কোথায় কতদূরে গিয়ে হারিয়ে গেল।

ডেভিড আবার সেল চড়ালো, বলে উঠলো—ঠিক হ্যায়্ চালাও !

মুখ না ফিরিয়েই সরোজ প্রতিধ্বনি তুললে—ঠিক হ্যায় !

রীতিমত যুদ্ধ। মহা মৃত্যুকাণ্ড। কখন নিচের কামান শিষ্ দিচ্ছে, কখন উপর থেকে বোমা ফাটছে, কিছু বোঝার উপায় নেই—শুধু শোঁ-শোঁ, বুম্-বুমের গোলযোগ।

শুধু দৃষ্টি-বিরোধী ধোঁয়া আর ধুলো—

কেবল নিঃশ্বাস-রোধী সালফারের গন্ধ—

অবিরাম আহতের অন্তিম মুহূর্তের শেষ তীব্র আর্তনাদ—

মৃত্যু আর মৃত্যু। যুদ্ধের নামে অসংখ্য মানুষের নির্মম হত্যাকাণ্ড। একদল মানুষকে নিঃশেষ করার জন্য আরেকদলের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাকে কোনও দিন চোখে দেখেনি, যার সঙ্গে বিবাদ হওয়াতো দূরের কথা মুখের একটা কথা পর্যন্ত হয়নি, তাকেই হত্যা করার জন্য পরস্পর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। যে মানুষ জ্ঞানের উন্নতির জন্য, পরস্পরকে সুখী করার জন্য, সুবিধা দেবার জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুগযুগান্তর ধরে সাধনা করে আসছে, সেই মানুষেরই এ আরেক রূপ। এই রণোন্মত্ত হিংস্র মানুষগুলি হায়নার চেয়েও রক্তলোলুপ, সাপের চেয়েও বিষাক্ত। এদের পানে তাকালে বুদ্ধ যীশু চৈতন্য ও গান্ধী যে এদেরই একজন, সে থা আর ভাবা যায় না, শুধু শিয়ালের শঠতা, হায়নার হিংস্রতা, ঈগলের তীক্ষ্ম দৃষ্টি, অক্টোপাশের বীভৎসতা—সব মিশিয়ে এক নিষ্ঠুর ভয়াল রূপ। সভ্য মানুষের ভীষণতা বন্য পশুর পাশবিকতাকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে।

যুদ্ধ চলছে......

কিছুক্ষণ পরে বোমা বর্ষণ কমেছে বলে মনে হলো। বিস্ফোরণের ধোঁয়াও যেন পাতলা হয়ে এলো। আগে সার্চলাইটের আলো ভালো দেখা যাচ্ছিল না, এবার তার দীপ্তি মাঝে মাঝে চোখকে ঝল্‌সে দিচ্ছে। তীরের মত আলোর রশ্মি ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের মাথায়, মাঠের বুকে, দূরে সহরের ঘরবাড়ীর গায়ে।

সহসা সরোজের কানে এসে লাগলো—আগুন ! আগুন !! হাসপাতালে আগুন লেগেছে,—স্বরটা আয়েষার।

সরোজ চমকে উঠলো, বললো—হাসপাতালে আগুন ?

আয়েষা বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ! ইতালিয়ানরা হাসপাতালের উপর বোমা ফেলছে,...

বুম্‌!...বুমুম্‌!!...বুমুম্‌—বুম্‌!!!...

আয়েষার বাকী কথাগুলো বোমার শব্দে শোনা গেল না।

সরোজ ডাকলো—ডেভিড!

ডেভিড উত্তর দিল—রেডি।

—এসো—বলে ডেভিডের একখানি হাত এক হাতে চেপে ধরে আরেক হাতে আয়েষার একখানি হাত ধরে উত্তেজিত সরোজ হাসপাতালের দিকে ছুটলো।

রণভূমি। বোমার বিস্ফোরণে, মাটির উৎক্ষেপণে, ধূমের আবরণে দুর্গম ভয়াল হয়ে উঠেছে। এখানে সেখানে মৃতদেহ ছড়ানো। আহত দেহের উপরেই কখন কখন পা পড়ে যাচ্ছে, মুমূর্ষুরা সে পদাঘাত সইতে পারছে না, আর্তনাদ করে উঠছে। সরোজের সেদিকে লক্ষ্যই নেই, লক্ষ্য করার অবকাশ নেই, সঙ্গীদের হাত ধরে সে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছে, দু' একবার পা পিছলেও পড়েছে, আবার উঠে ছুটেছে—দুটি আহত সঙ্গীর জীবন এখন তাদের গতির উপর নির্ভর করছে, তারা ছুটছে—।

হাসপাতালের দরজায় যখন তারা এসে পৌঁছালো, হাসপাতাল তখন আর আরোগ্যশালা নেই, হয়েছে অগ্নিশালা। ইতালিয়ান প্লেন থেকে আগুন-জ্বালানো বোমা ফেলে হাসপাতালে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের মাথায় লাল ক্রুশ আঁকা বড় বড় শাদা নিশানগুলি বোমার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন। একদিকে জ্বলে উঠেছে লেলিহান অগ্নিশিখা। বহু সাধনায় বহু চেষ্টায় যা একদিন গড়ে উঠেছিল, আজ মানুষ তাকেই অবহেলায় ধ্বংস করে দিচ্ছে। সজ্জনেরা আর্তদের আরোগ্যশালা করেছিল, দুর্জনেরা তা আহতদের দগ্ধশালা করে তুললে।

আগুনের দীপ্তিতে চারিদিক আলোকিত।

শত্রুর বোমা তুচ্ছ করে, মৃত্যুর আতঙ্ক উপেক্ষা করে হাসপাতালের দরজার কাছে বহু লোক জমে গেছে। যাদের আপনার জন আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে তারা ছুটে এসেছে। বাইরে তাদের হা-হুতাশ, ভিতরে আতঙ্কিত আহতের করুণ আর্তনাদ, চোখের সামনে আগুনের দাপাদাপি, মাথার উপরে বোমার বিস্ফোরণ স্থানটিকে প্রলয়ঙ্কর করে তুলেছে। সেই দুষ্প্রবেশ্য জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন।

কারও পানে সরোজ তাকালো না, নর-নারীর বিচার করলো না, ভীড়ের মাঝে দু'পাশে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিল।

হাসপাতালের ভিতরে বাইরের চেয়ে কম ভীড় নয়। চলার পথটা লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। ডাক্তার ও নার্সেরা ছুটোছুটি করছে। আহতদের বাইরে সরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু উৎসুক জনতার ভীড়ে তারা বাধা পাচ্ছে। যে ভাবে কাজ চলছে তাতে বেশী আহতকেই পুড়ে মরতে হবে।

ওয়ার্ডের একদিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। আহতদের চীৎকারে, সুস্থ মানুষের কোলাহলে, নার্স ও ডাক্তারদের ছুটোছুটিতে সে-দিকটায় এমন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে যে কে কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই করতে পারছে না। রবিদত্ত ও গাইড আছে সেই দিকেই, তার মধ্যে আয়েষা যে কি করে এক ধারে দুটি বেডের কাছে তাদের নিয়ে গেল, সে এক অসাধ্য ব্যাপার।

দুটি বেডে রবিদত্ত ও গাইড পড়েছিল, আগুন তখনও তাদের কাছে আসেনি। সরোজ তাড়াতাড়ি রবিদত্তকে কাঁধে তুলে নিলে, তারপর ডাকলো—ডেভিড!

ডেভিড পিছনেই ছিল, 'ইয়েস,' বলে এগিয়ে এসে পাশের বেড থেকে গাইডকে কাঁধের উপর তুলে নিলে।

সামনের ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে দুটি বড় বড় জ্বলন্ত কাঠের কড়ি সেই সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। যারা তার নিচে ছিল তাদের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল। ভীড়ের মধ্যে হেঁচে পড়ে গেল। বাইরে যারা ছিল, তারাও তখন হাসপাতালের সেই ঘরখানির ভিতরে এসে ঢুকতে চায়। তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য সরোজ ও ডেভিড প্রাণপণে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো।

ভীড় পার হয়ে যখন তারা ফাঁকায় এসে দাঁড়ালো, তখন তাদের মনে হলো একটা ঘোরতর দুর্যোগ একটা বড় ঝড় তারা কাটিয়ে এসেছে। বাইরে এসে তারা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল—কোন্ দিকে যাবে? কোথায় যাবে? চারিদিকেই শুধু বুম্ বুম্ করে বোমা ফাটছে, সার্চ লাইটের আলো ঘুরছে। অপঘাত মৃত্যু নীল আকাশের মত সমগ্র প্রান্তরটাকে ঢেকে ফেলেছে। এই মৃত্যুময় প্রান্তরের আড়ালে এখন একটু নিরাপদ আশ্রয় চাই।

গন্ধকের সেই ধূসর ধোঁয়ার মধ্যে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা দিক ঠিক করে এগোবার উদ্যোগ করছে এমন সময় কোথা থেকে একটি মহিলা ছুটে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো, সরোজের জামা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—হাসপাতাল্‌সে আতে হো বাবুজী?

মহিলার মুখে হিন্দি কথা শুনে সরোজ থমকে দাঁড়ালো।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলো—মেরে বাচ্চাকো দেখা বাবুজী,—মেরি লেড়কা? আজ সাত রোজ উস্‌কো চোট লাগা···

কথা বলতে বলতে সরোজ ও ডেভিডের কাধের পানে তাকিয়ে মহিলাটির কি যেন মনে হলো, বলে উঠলো—ইয়ে কি মেরি লেড়কা বাবুজী—মেরি লেড়কা?

তাড়াতাড়ি সরোজ ও ডেভিডের পিছনে গিয়ে আহত রবিদত্ত ও গাইডের মুখ দুখানি তুলে ধরে জ্বলন্ত হাসপাতালের অগ্নিশিখার আভায় একবার দেখে নিলে. তারপর নিরাশ হয়ে আয়েষার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—দেখা বেটী, মেরি লেড়কেকো দেখা?

মায়ের সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে এধারে ওধারে কয়েকটি বোমা ফেটে পড়লো শুধু—বুম্-বুম্-বুম্ম্ !

ফাঁকা মাঠের বুকে নিজেদের অবস্থাটা উপলব্ধি করে সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। এমন সময় কোথা থেকে ক্যাপ্টেন জন্সন্ এসে উপস্থিত, বললেন—আমি তোমাদের খুঁজছি, তোমরা কোথা ছিলে বল ত ?

—হাসপাতালে গিয়েছিলাম বন্ধু দুটিকে নিয়ে আসার জন্যে।

—বেশ করেছ, এখন চল কামান চালাতে হবে।

—আগে একটু নিরাপদ আশ্রয় চাই ক্যাপ্টেন, এই অসুস্থ বন্ধু দুটিকে…

ক্যাপ্টেন হেসে উঠলেন, বললেন—নিরাপদ স্থান পাবে কোথা, কোথাও এতটুকু নিরাপদ জায়গা নেই। যেখান থেকে কামান চালাবে সেটাই হবে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ, শত্রুর বোমা সেইখানেই কম পড়বে।

—আপনাদের কামান কতদূরে ?—সরোজ জিজ্ঞাসা করলো।

ক্যাপ্টেন সামনেই একটা ঝোপ দেখিয়ে দিলেন।

উপরের প্লেন থেকে তখন বড় বড় সার্চলাইটের আলো প্রান্তরের সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে। সরোজদের মাথার উপর দিয়ে সে আলো একবার চলে গেল, চোখ ঝল্সে দিলে। সরোজরা চম্কে উঠলো। ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—ক্যাপটেন, তোমাদের সার্চলাইট আছে ?

—নিশ্চয়ই !

—বেশ, চল—বলে ক'জন অগ্রসর হলো।

কামানটা ছিল শ'খানেক গজ দূরে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শ'খানেক গজ বড় কম পথ নয়। এমন সময় সেই হিন্দুস্থানী মহিলাটি সরোজের জামার হাতাটা টেনে ধরে বললে—বাবুজী, সাচ্ কহো, মেরি লেড়কেকো দেখা ?

সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাশ্লাইটের আলো আরেকবার তাদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল, শঙ্কাতুরা মায়ের মুখখানি সেই আলোয় দীপ্যমান হয়ে উঠলো। নিমেষ মধ্যে বুমম্ করে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সরোজের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ জ্বলে উঠলো, পায়ের নিচের মাটিতে একটি প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে কে যেন সজোরে তাদের ফেলে দিলে। চোখের সামনে সব আলো নিভে গেল।

কপালে ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে সরোজ চোখ চাইল, প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারলো না। কপালটা ভিজে উঠেছে বলে মনে হলো, হাত দিয়ে মুছে দেখে—একহাত টাট্কা তাজা রক্ত ! তবে কি তার মাথা ফেটে গেছে ? সে আহত ? ধড়মড় করে সরোজ উঠে বসলো। হাসপাতালটি দাউ দাউ করে পুড়ছে। লোকজনের সোরগোল ও বেদনার্তের আর্তনাদ। তারই সঙ্গে প্লেনের বন্বন্ শব্দ, বোমার বুমবুম এবং অনুসন্ধানী আলো ছুটে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে।

সরোজ ভাল করে ঠাহর করে দেখলো ইতস্ততঃ ছড়ানো কতকগুলি আহত দেহের মাঝে সে পড়ে আছে। মাথার দিকে একটি রক্তাক্ত দেহ। পিঠের জামাটা ফেঁসে গেছে, কে যেন একটা তলোয়ারের কোপ বসিয়ে তার পিঠটা দুভাগ করে দিয়েছে। রক্ত ঝরে জামাটা কালো হয়ে গেছে, মাটির উপরেও রক্ত জমে কালো হয়ে উঠেছে। তার মাথার অবস্থাটাও অমন হয়নি তো? সরোজ অতি সন্তর্পণে মাথাটা একবার হাত বুলিয়ে দেখলে, ভাল করে হাত বুলালে। নাঃ, সে আহত হয়নি, ওই লোকটির রক্তই তাহলে তার মাথায় লেগেছে। কিন্তু—কে ও?

লোকটির মুখ দেখার জন্য সরোজ সন্তর্পণে দেহটিকে উল্টে দিলে। মুখখানি রক্তাক্ত। তবু চেনা যায়ঃ সে আর্টিস্ট রবিদত্ত। চোখের কোলে, গালের উপর, মাথার চুলে রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। সে-মুখের পানে তাকিয়ে সরোজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন শিথিল হয়ে এলো। পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মত সে কিছুক্ষণ শুধু তাকিয়ে রইল। মনে পড়লো জার্মান যুদ্ধের কথা। এর চেয়েও কত ভীষণ—কত ভয়াবহ ঘটনা তখন তার চোখের সামনে ঘটে গেছে, কিন্তু তখন প্রথম যৌবনের উদ্দাম মনে তার ছায়া পড়েনি। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে মন সে দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে।

রবি দত্তের রক্তাক্ত দেহের পানে সরোজ তাকিয়ে রইল, স্তব্ধ অপলক চোখে, নিথর নিষ্কম্প দৃষ্টিতে।

—বুম্‌ম্‌—ম্‌! কাছেই একটা বোমা ফাটলো, বারুদের একটা ঝাঁঝালো ঝাপ্‌টা দম্‌কা বাতাসের মতো সরোজের মাথার উপর দিয়ে বহে গেল। স্মেলিং সল্‌টের গন্ধ লাগার মতো সরোজের মাথা চন্‌চন্‌ করে উঠলো। এক নিমেষে তার মনের পর্দায় পরপর কয়েকটি মুখ ভেসে উঠলো -ডেভিড···আয়েষা···গাইড্‌ ···ক্যাপ্‌টেন জন্‌সন্‌?'

সরোজ চারিপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরালো। পাশে আরেকটি দেহের উপর চোখ পড়লোঃ মুণ্ড নেই, রক্তের কালো পর্দা ঠেলে কাঁধের একখানি শাদা হাড় ছিট্‌কে উঁচু হয়ে উঠেছে,—বীভৎস, ভয়াবহ!

সরোজ দু'-হাতে চোখ ঢেকে ফেললে।

এমন সময় সরোজের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কে বলে উঠলো—Don't be silly, old boy—বুদ্ধি হারিও না, বন্ধু—!

ডেভিডের গলা শুনে সরোজ ফিরে তাকালো, দেখে—ডেভিড পিছনে মাথা তুলেছে, বললে—আমরা পুরানো সৈনিক বন্ধু, একটু-আধটু রক্ত কি আমাদের ব্যাকুল করতে পারে! চল. কামান চালাই গে!—ডেভিড সরোজকে হাত ধরে উঠালো।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—আয়েষা? ক্যাপ্‌টেন?

—আয়েষা এইখানেই কোথাও পড়ে আছে।

—ক্যাপ্‌টেন ?

—ক্যাপ্‌টেনের পাশেই তো বোমাটা পড়লো। ওই দেখ বেচারার একখানি হাত ওখানে পড়ে আছে, হাতের জামায় স্ট্রাইপ্‌ লাগানো—বলে ডেভিড একখানি হাত দেখিয়ে দিলে। হাসপাতালের আগুনের আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাতের সঙ্গে খাঁকি জামার খানিকটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, তার উপর একটা তারা ও তিনটে স্ট্রাইপ্‌।

ডেভিড বললে—আমাদের অবস্থাও ও-ই হতো, কেবল আমাদের কাঁধের উপর লোক ছিল বলে। আর্টিস্ট ও গাইড্‌ দুজনের জীবনের মূল্যে আমরা দু'জন বেঁচেছি। রবি দত্তকে তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, আর ওই মুণ্ডহীন দেহটাই আমাদের গাইডের। টাকার লোভে আমাদের পথ দেখাতে এসে বেচারা মারা পড়লো। আমাদেরকেও হয়তো ওই পথেই যেতে হবে আর খানিক পরে।

ডেভিডের কথা সমর্থন করে বোমা ফাটলো—বুম্‌ বুম্‌ বুমুম্‌!

ডেভিড সরোজের হাত ধরে টানলো, বললো—চল, কামান চালাবে না? ওদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না?

—কিন্তু আয়েষা?

—জাহান্নমে যাক্‌ আয়েষা! এখনও যদি কামান চালিয়ে এই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে পার, তাহলে আয়েষাকে খুঁজে পাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এভাবে চুপ করে থাকলে এই বোম্বার্ডমেন্টের মধ্যে দশ মিনিট পরে আমাদেরকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—কাম্‌ অন্‌!

ইতিমধ্যে আরেকবার তাদের মাথার উপর দিয়ে সন্ধানী আলোর ঢেউ বহে গেল। এক ঝলক দম্‌কা হাওয়ায় আর্তনাদের ক্ষীণ রেশ ভেসে এলো, সরোজের মনে হলো, কে যেন আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে—'মেরী লেড়কাকো দেখা বাবুজী? চোখের সামনে ভেসে উঠলো সন্তানহারা মায়ের মুখখানি—এমনি কত মা এই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সরোজ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—চল!

কামানের রেঞ্জ ঠিক করে সরোজ হাঁকলো- ডেভিড, সেল!

—ইয়েস্‌!—বলে ডেভিড গোলা চড়িয়ে দিলে।

অন্ধকার আকাশে অনুসন্ধানী আলোর উৎস দেখে জানা যাচ্ছিল প্লেনগুলি কোথা দিয়ে চলেছে। মাথার উপরে কাছাকাছি যেটা নজরে পড়লো সেইটিকে লক্ষ্য করে সরোজ কামানের মুখ ফেরালে, গোলা ছুটে গেল—'শোঁ-ও বুম্‌ম্‌' করে একটা শব্দ, আগুনের একটা ঝিলিক। পরমুহূর্তেই আকাশের বুকে একটা শব্দ শোনা গেল—একটা প্লেন জ্বলে উঠেছে।

উল্লাসে সরোজ চীৎকার করে উঠলো—ঠিক হ্যায়!

ডেভিড বললে -চিয়ারিও!

ঠিক সেই সময় একটা আর্তনাদ শোনা গেল, একটা মানুষের ছায়া তাদের

দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে সে-মূর্তি চীৎকার করে উঠলো—বোমা! বোমা! আবার বোমা!! খুন...রক্ত...

গলার স্বর শুনে ডেভিড ডাকলে—আয়েষা! আয়েষা!!

—না না, আমি সেন্য নই, আমি সেন্য নই! আমায় তোমরা বোমা মেরো না, আমি লড়াই করিনি, আমি কাউকে খুন করিনি!

ডেভিড আবার ডাকলো—আয়েষা!

—না, না আমি লড়াই করিনি, আমি খুন করিনি, তোমরা কেন আমায় গুলি করে মারবে! কেন আমার কোর্টমাশাল হবে!—বলতে বলতে আয়েষা ছুটে চলে যাচ্ছিল ডেভিড এগিয়ে গিয়ে তার একখানি হাতে ধরে, একটা ঝাকানি দিয়ে বললে—যাচ্ছ কোথায়? আমরা তো এখানেই রয়েছি।

আয়েষা এবার চোখ তুলে চাইলে, ডেভিড ও সরোজকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। আতঙ্কিত দৃষ্টি তাদের মুখের উপর রেখে আয়েষা বলে উঠলো—আপনারা··· আপনারা··· আমায় বন্দী করবেন? খুন করবেন? গুলি করবেন? ওঃ! আমার বড় ভয় করছে—বড় ভয় করছে! আমি মরতে পারবো না!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আয়েষা সেইখানেই বসে পড়লো

সরোজের মধ্যে তখন বিশ বছর আগের জার্মানযুদ্ধের সৈনিক-মন জেগে উঠেছে, আয়েষার পানে একবার কৃপার চোখে তাকিয়ে বললো—ও ওইখানেই পড়ে থাক্ ডেভিড, তুমি সেল্ চড়াও! বোটা ফেটে ওর ব্রেণে শক লেগেছে।

ডেভিড সেল্ চড়ালো।

সরোজ আকাশের পানে চোখ তুললো। বিমান-ধ্বংসী কামান গর্জে উঠলো, আকাশের দিকে গোলা ছুটে গেল—শোঁ ও-ও-প—বুম্!

ডেভিড উৎসাহে বলে উঠলো—ঠিক হ্যায়!

সরোজের মাথার মধ্যে তখন যুদ্ধের দামামা বাজছে, রক্তের মধ্যে নাচছে খুনের নেশা। কামানের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে সে চীৎকার করে উঠলো—ঠিক্ হ্যায়!

পিছনে আরেকজন প্রতিধ্বনি করলো—ঠিক হ্যায়!

সরোজ ও ডেভিড ফিরে তাকালো। মাথায় পাগড়ী-বাঁধা একটি লোক তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখখানি চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছে।

তা' যেখানেই দেখুক না কেন, মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তারা নিজেদের কাজে মন দিল। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠলো শিকারী বাজের মতো, মেশিনের মতো চললো হাত, কানে শুনতে লাগলো প্লেনের গর্জন, মনের সব একাগ্রতা হারিয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে শত্রুর প্লেনের গতির মাঝে। বিমান-ধ্বংসী কামান অবিরাম আকাশের পানে গোলা উদগার করতে লাগলো—শোঁ-ও-ও-বুম্‌ম্!

কিছুক্ষণের মধ্যে গোলা নিঃশেষ হয়ে গেল।

ডেভিড বললে —গোলা ফুরিয়ে গেছে।

—ফুরিয়ে গেছে! তাহলে?

—এই কামানের পাশেই বসে থাকি, মরতে হয় তো এই কামানের পাশেই মরবো।

হতাশভাবে দু'জনে কামানের পাশে বসে পড়লো।

এতক্ষণ যে লোকটি পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এবার সে সহসা চীৎকার করে উঠলো—রুখা হ্যায় কেঁও?

ডেভিড বললে—সেল্ নেই।

—সেল্ নেই! লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো—ওরা আমাদের হাসপাতাল পুড়িয়ে দিলে, আমাদের বাড়ীঘর উড়িয়ে দিলে, নিরীহ ছেলেমেয়েদের খুন করলে, আর তোমাদের গোলা নেই। এতো লোক যে মরে পড়ে আছে, ওদের মুণ্ডগুলোকে সেল কর, করে কামান চালাও!

সরোজ ও ডেভিড স্তব্ধ হয়ে লোকটির মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

লোকটি ক' সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললে—কী, তোমরা আমার কথা শুনবে না? জানো, আমি এখানকার ইস্কুলের হেড্মাস্টার, আমার আদেশ তোমরা মানবে না? বল, মান্‌বে কি না?

খানিকক্ষণ সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার বলতে সুরু করলো—তোমরা আমার আদেশ শুনবে না, আচ্ছা! তোমাদেরকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। তোমাদেরকে আমি চিনেছি, তোমরা ইতালিয়ান আর্মি! তোমরা আমার বন্ধু জয়চাঁদকে খুন করেছ,* হাসপাতালে তোমরাই আগুন লাগিয়েছ, 'দেসী' সহর তোমরাই বোম্বার্ড করেছ —লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যার জন্য তোমরাই দায়ী। আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করলাম। চল! আমি তোমাদের এখুনি নিয়ে যাব সম্রাট হেইলে সেলাসীর কাছে. তোমাদের এখুনি বিচার চাই! নিরীহ দুর্বল নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করে তোমরা কালা-আদ্মিদের সভ্য করবে? ইতালিয়ান হত্যাকারীর দল, এই তোমাদের খৃষ্ট-ধর্ম? তোমরা খৃশ্চান্!

চারিপাশের ধুলো আর ধোঁয়ায় হাসপাতালের আগুনের দীপ্ত আভা ক্ষীণ হয়ে গেছে, সে আলোয় বক্তার মুখখানি ভাল করে দেখা যায় না, শুধু তার কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে কানের পর্দায় এসে আঘাত করতে থাকে: আমার কথা তোমরা শুনবে না, যাবে না হেইলে-সেলাসী-রাস-তাফারীর কাছে, তা আমি জানি। কিন্তু একদিন তোমাদের বিচার হবেই, এই দুনিয়ার হেইলে

* শ্রীযুক্ত জয়চাঁদ ও এম-কে-জানি নামে দু'জন ভারতীয় 'দিরে-দাওয়া'র 'মহাজন-গুজরাটী ইস্কুলের' শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের কাজ দেখে ১৯৩৫ সালে সম্রাট হেইলে-সেলাসী তাঁদেরকে পুরস্কৃত করেন।

সেনাসীকে ফাঁকি দিতে পারবে না, এই হত্যাকাণ্ডের কৈফিয়ৎ না দিয়ে তোমরা যাবে কোথা? তোমাদেরও একদিন মরতে হবে!

শোঁ-ও-ও! বম্-বম্-বম্ম!—শুধু গোলা আর গোলা!

ওদিকে কয়েকটি গোলা ফাটলো, সেই দীপ্তিতে বক্তার ঠোঁট দু'খানি কাঁপতে দেখা গেল। কথা শোনা গেল গোলা ফাটার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি থামলে: তোমরা আমার মুখের পানে অমন করে তাকিয়ে দেখছ কি? ভেবেছ আমায় খুন করবে? আমি পাঞ্জাবী, আমি কি মরণকে ভয় করি? কই দাও, তোমাদের কামানের মুখ ঘুরিয়ে দাও আমার দিকে, দেখ আমি বুক পেতে দোব! মরতে আমরা ভয় পাই না, আমরা পাঞ্জাবী!

কাছাকাছি কোথা থেকে বাঁশীর সুরের মতো একটা আর্তনাদের করুণ রেশ ভেসে এলো। কয়েক লহমা বক্তা চুপ করে কান পেতে শুনলো, তারপরেই ছুটে চলে গেল সেইদিকে।

বিদীর্ণমান বোমা ও সেলের ঝলকানিতে যতক্ষণ সেই লোকটিকে দেখা যায়, সরোজ ও ডেভিড তাকিয়ে রইল।...

সকাল হতে তখন অনেক দেরী।

তারায় ঘেরা আকাশের ঘন অন্ধকারের সীমান্তে একটি বিবর্ণ আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, এ যেন পেঁজা-পেঁজা শিথিল তুলোর বুকে সরু সুতোর ধারালো আভাস। ওই আলোই ক্রমে ক্রমে সমগ্র আকাশ ব্যাপ্ত করে দেবে, তার পিছনে আসবে লাল সূর্যের রক্তিমা। সেই আলোর সামনে এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড জগতের সামনে আকাশের পানে মুখ তুলে চাইবে, অন্ধকারের ঘোমটায় আর ঢাকা থাকবে না।

ইতালিয়ান প্লেনগুলির নীল আলো আকাশে আর দেখা যায় না, মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটা লেগে হাসপাতালের জ্বলন্ত আগুন ধক্ ধক্ করে উঠে অন্ধকারকে চমকে দিচ্ছে।

কামানের পাশে সরোজ ও ডেভিড বসে আছে। দেহে ও মনে অবসাদ। গন্ধকের ধোঁয়ায় মাথাটি তখনও গুম্ হয়ে আছে। সামনে দিগন্ত-বিস্তারি অন্ধকারের পানে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দু'জনে বসে আছে। মুখে কথা নেই। কথা বলার ইচ্ছাও নেই। মাথার মধ্যে চিন্তার ট্রেন চলে যাচ্ছে। তাশিগ্রকের হাত থেকে বিনয়বাবু ও ডাক্তার রায়কে উদ্ধার করতে এসে রবি দত্তকে তারা হারালো, নিজেরাও বিপন্ন। সকালের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয় তো ইতালিয়ানরা তাদের বন্দী করবে, তারপরেই হবে কোর্ট মার্শাল। নয় তো কবে কোথায় কোন্ এক সময় ইতালিয়ান মেশিনগানের গোলা শ্যেনপাখীর মত শিষ দিতে দিতে মৃত্যুর আকাশে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

একটা দমকা হাওয়ার মতো কে এসে পিছনে হোঁচট খেয়ে পড়লো, সরোজ ও ডেভিড চমকে উঠলো। লোকটি ধীরে ধীরে উঠে বসলো, কতক্ষণ হাঁটুতে

হাত বুলালো। সরোজদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো—বলতে পার আর কতক্ষণ বোমা পড়বে। মুসোলিনী আর কত বোমা ফেলবে? দেশ যে উজাড় হয়ে গেল, কাকে নিয়ে ইতালিয়ানরা রাজ্য করবে?

সরোজ তার গলা শুনেই চিনলো—ইনি সেই পাঞ্জাবী হেডমাস্টার, বললো—বোমা পড়া তো বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একবার চাইলো আকাশের পানে, একবার চাইলো সামনে যুদ্ধ-ক্ষত প্রান্তরের পানে, তার পর সহসা জোর গলায় চীৎকার করে উঠলো—ঠিক বলেছেন, ঠিক! ওরা বোমা ফেলা বন্ধ করেছে, মেশিনগানও আর চালাচ্ছে না, এখন শুধু গ্যাস ছাড়ছে, না?

সেই সময় আয়েষার ঘোর কেটে গেল, তার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল… বোমা! মেশিনগান! এখনও ওরা মেশিনগান চালাচ্ছে? কেন ওরা আমার উপর মেশিনগান চালাবে? আমি তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি!

আয়েষার পানে ফিরে সরোজ বললো—বোমা পড়া, মেশিনগান চালানো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে আয়েষা, তোমার ভয় নেই! লড়াই থেমে গেছে।

আয়েষা যেন একটু আশ্বস্ত হলো, বললো—আমি কোথায়?

—তুমি আমাদের কাছে রয়েছ, আমি সরোজ!

—সরোজ! কে সরোজ? সরোজ কে?—

বিভ্রান্তের মত আয়েষা ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

পাঞ্জাবীটি সরোজের কথাগুলি কান পেতে শুনলো। একটু কাছে সরে এলো। বড় বড় চোখ করে সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলো। তারপর আরো কাছে সরে এসে সরোজের হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো—তোমরা ইণ্ডিয়ান ভাষায় কথা বলছ, না? তোমরা হিন্দুস্থানের লোক? গেছ কখনো হিন্দুস্থানে? দেখেছ আমাদের ভারতবর্ষ? জান হিন্দু-তান্ত্রিকেরা একশো-আট শবের উপর বসে শক্তি সাধনা করে। য়ুরোপেও আজকাল সেই সাধনা সুরু হয়েছে। এ-যুগের য়ুরোপেও তিনজন মস্তবড় তান্ত্রিক জন্মেছে তারা কে-কে জান?—কাইজার, মুসোলিনী আর হিটলার! কাইজার সাধনা করেছিল পাঁচ বছর ধরে, কিন্তু বেচারার প্রাণায়ামে ভুল হয়েছিল, তাই সিদ্ধি মেলেনি, তাঁর অসমাপ্ত সাধনা শেষ করার ভার পড়েছে হিটলারের উপর। আর এই তো দেখছ মুসোলিনীর সাধনা, অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, আর দিন কতক এই অসভ্য কালো হাবসীদের এমনিভাবে মারতে পারলেই সিদ্ধি মিলে যাবে, কি বল?

পাঞ্জাবীটি কিছুক্ষণ সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে রইল একটা উত্তর শোনার আশায়।

কাছাকাছি কোথায় একটা বোমা এতক্ষণ পড়েছিল এবার কোন একটা তুচ্ছ কারণে সেটা বুম্ করে ফেটে গেল। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি চমকে

উঠলো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো—ওঃ তোমরা ! ইতালিয়ান নরঘাতক, হত্যাকারী ! মনে রেখো মরবার পরে জবাবদিহি করতে হবে—ভগবান আছে !

তারপরেই ছিট্‌কে গেল তেপান্তরের অন্ধকারে !

ডেভিড বললে—লোকটা পাগল !

সরোজ বললে—যে-কোন দুর্বলচিত্তের লোক এমন অবস্থায় পাগল হয়ে যাবারই কথা।

যুদ্ধশেষের রণক্ষেত্র :

একটি শান্ত সুদৃশ্য জনপদের মাঝে একটা দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকম্প ঘটে গেছে। সুনিবিড় শ্যামল বনভূমির বুকে প্রকাণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। সুনীল সমতল সাগরের বুকে একটা উত্তাল টাইফুন ঘটে গেছে বুঝি। লাঙল দিয়ে চষার পর ক্ষেতের মাটি যেমন হয়ে থাকে, অবিরাম বোমা ও গোলা ফেটে চারপাশের পাহাড়ী প্রান্তরকে ঠিক তেমনি করে ফেলেছে। এখানে সেখানে কাঁটা তারের জট, তেরপলের টুকরো, ছেঁড়া বালির বস্তা, সৈনিকের পেয়ালা, মাথার টুপী, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বুট, রাইফেল, মৃতদেহ ! শান্ত সুশ্রী উপত্যকা বীভৎস ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দমকা বাতাস বহে যাচ্ছে মাটি-মায়ের দীর্ঘশ্বাসের মতো।

সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট শোনা গেল—আমার আদেশ মনে আছে ?

—আছে।

—এইমাত্র চতুর্দশী তিথি পড়লো, রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই, এরই মধ্যে তোমাদের একশো আটটি নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে হবে, বুঝেছ ?

—বুঝেছি।

—এই নাও দুজনে দুখানি ছোরা। মৃতদেহ দেখবে আর মুণ্ড কেটে নিয়ে থলির মধ্যে রাখবে। তুমি চুয়ান্ন আর তুমি চুয়ান্ন, বুঝেছ ?

—বুঝেছি।

—যাও, আর দেরী করো না।

দেখা গেল দুটি লোকের ছায়া সেই ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে বসছে, উঠছে, তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে এলো।

ছায়া দুটিও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সরোজ কিছুক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল, বললো—দূরে ওই লোক দুটো কি করছে বল ত ডেভিড ?

ডেভিডও তাদের দেখছিল, বললো—লুঠ করছে। সৈনিকদের পকেটে কি ব্যাগে মূল্যবান যদি কিছু থাকে, তাই লুঠ করছে।

—কি নীচ মন। মড়ার দেহ থেকেও লুঠ করবে!

—কেন, এতো নতুন কিছু নয়, সব যুদ্ধক্ষেত্রেই একদল এই ধরণের লোক ঘুরে বেড়ায়, ওতে অন্যায় ত কিছু নেই। একদল লোক সর্বস্ব লুঠ করার

চেষ্টায় ওদের খুন করেছে, সেটি যদি নীচতা না হয়, তাহলে দু' পাচটা লোক কোন ক্ষতি না করে মৃত্যুর পর ওদের অ-দরকারী কোন-কিছু নিয়ে যদি নিজের অভাব মেটায়-তা আর নীচতা কি হলো?

ইতিমধ্যে তৃতীয় একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল প্রথম দু'জনের পিছনে। কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ কতগুলি সংগ্রহ হলো?

আমার ছাব্বিশ।

—আমার বত্রিশ।

একটা ধারালো অট্টহাসি শোনা গেল, তারপর শোনা গেল কথা ঃ এতক্ষণে মাত্র আটান্নটা! তাড়াতাড়ি কর, রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর মধ্যে একশো-আটটা জোগাড় করতেই হবে—কালকের অমাবস্যা যেন ব্যর্থ না হয়!

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সহসা একজন পায়ে আঘাত লেগে পড়ে গেল।

প্রশ্ন হলো ঃ কি হলো?

—পড়ে গেছি সাধুজী।

—সাধুজী!! বল্—গুরুদেব।

গুরুদেব এগিয়ে গিয়ে শিষ্যকে হাত ধরে তুললেন, বললেন– নে-ওঠ, সংগ্রহ কর।

শিষ্যটি দু-এক পা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো বললো—চলতে পারছি না, গুরুদেব।

—কি হলো ?

—পায়ে বড় লাগছে।

গুরুদেব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন—নে ওঠ, কিছু হয়নি—।

শিষ্য যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়ালো।

গুরু বললেন,—নে চল্।

শিষ্য চললো।

গুরু বললেন—পায়ে আর কোন ব্যথা আছে ?

—না।

—এবার পারবি ?

—হ্যাঁ, পারবো।

শিষ্য আবার নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে সুরু করলো।

সরোজ ও ডেভিড তন্ময় হয়ে দেখছিল।

কোন এক সময় ডেভিডের যেন চমক ভাঙলো, সরোজকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো—সেই তান্ত্রিক। অশ্বত্থামা।

কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ডেভিড গুলি করলো।

গুলি কাকে লাগলো ঠিক বোঝা গেল না, তবে চীৎকার করে একজন মাটিতে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই অপর দু'জন ছুটে এলো সরোজদের পানে।

তারা কাছে আসতেই তাদের হাতের দু'খানি ছোরা ঝক্‌মক্ করে উঠলো। ডেভিড তাড়াতাড়ি সরোজের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কামানের পিছনে।

লোক দু'টি বড়ের বেগে ছুটে এলো! সামনেই বসেছিল আয়েষা তার মাথার উপর দু'খানি ছোরা ঝকমক্ করে উঠলো। সরোজ সঙীন উঁচিয়ে গুলি চালাতে যাচ্ছিল, ডেভিড চীৎকার করে উঠলো—গুলি করো না, গুলি করো না, ও বিনয়দা আর ডক্‌টর রায়···

সরোজ থমকে গেল।

লোক দুটি চীৎকার শুনে চমকে উঠলো, তারপরেই দু'জনের তীব্র হাসি রণক্ষেত্রকে সচকিত করে তুললো—হি হি হি ঃ!

আয়েষাকে বাঁচাবার জন্য সরোজ ও ডেভিড তাদের সামনে লাফিয়ে পড়লো। বিনয়বাবুর হাতের ছোরাখানি এক নিমেষে সরোজ কেড়ে নিলে। বিনয়বাবু বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো সরোজের ঘাড়ে। সরোজ টুপ করে সরে গেল বিনয়বাবু নিজের বেগেই আছড়ে পড়লেন মাটির উপরে।

ডেভিড ডক্‌টর রায়ের ছোরা শুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরেছিল, নিমেষে হাত

ছাড়িয়ে নিয়ে ডক্‌টর রায় আমূল ছোরাখানি ডেভিডের পিঠে বসিয়ে দেবার জন্য হাত তুললো। ডেভিড তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে ডান পা হুকের মতো আটকে বাঁ পায়ে ডক্টর রায়ের হাঁটুতে সজোরে এক লাথি মারলো, যুযুৎসুর সে প্যাঁচ ডক্টর রায় সইতে পারলো না, ঠিকরে গিয়ে পড়লো।

ভয়ে ও উত্তেজনায় আয়েষা আর্তনাদ করে উঠলো।

এদিকে বিনয়বাবু ও ডক্টর রায় আর মাটি থেকে ওঠে না। মারামারিটা যখন প্রবল হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছিল, সরোজরা মনে মনে তৈরী হচ্ছিল, এহেন সময় বিনয়বাবু ও ডক্টর রায়ের মাটি থেকে না ওঠা বিস্ময়কর বলে মনে হলো। বিশেষ কোন আঘাত করা হয়নি অথচ তারা ওঠে না কেন, ভাণ করে সুযোগের প্রতীক্ষা করছে নাকি!

কিন্তু যখন একই ভাবে ক'মিনিট কেটে গেল, তখন সরোজ ও ডেভিড কাছে গিয়ে সন্তর্পণে দেখে দু'জনেই অচেতন।

ডেভিড সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে হেসে বললো—খুব বন্ধু যা হোক, যাদের জন্য আমরা এই হাবসী মুলুক পর্যন্ত ছুটে এলাম, তারা আমাদের দেখেই ছুরী নিয়ে তেড়ে এলো—চমৎকার বন্ধুত্ব!

সরোজ বললো—তুমি কি ভাবো, ওরা সুস্থ মনে আমাদেরকে ছুরী মারতে এসেছিল? আমার মনে সন্দেহ হয় ও দু'জনেই হিপ্‌নোটাইজ্‌ড।

—সন্দেহ নয়, নিশ্চয়ই। না হলে দু'জন সুস্থ লোক অকারণে এমনভাবে কখনও অজ্ঞান হয়ে যায়? শুনেছি সম্মোহিত লোকের মনে পূর্ণচেতনা থাকে না, সামান্য উত্তেজনাতেও তারা জ্ঞান হারায়। তাছাড়া বোম্বায়ের নিশির ডাক' থেকে সুরু করে এই যুদ্ধক্ষেত্রে নরমুণ্ড সংগ্রহের ব্যাপার পর্যন্ত ভাল করে ভেবে দেখ দিকি, কোন সুস্থ চিত্তের লোক বন্ধুবান্ধব ও আপনার-জনদের ভুলে কোন সাধুকে এমন কুকুরের মত অনুসরণ করতে পারে, না আমাদের মত অতি অন্তরঙ্গ দু'জন বন্ধুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, বল? ওদের দু'জনকেই সন্ন্যাসী হিপ্‌নোটাইজ্‌ করেছে।

সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়তেই ডেভিড সচকিত হয়ে উঠলো, বললো—সন্ন্যাসীটাকে তো ধরা হলো না, ব্যাটা গুলি খেয়ে ওখানে পড়ে আছে।

—তুমি এদের দেখ, আমি দেখে আসি—সরোজ এগোলো।

ডেভিড বললো একা যাওয়া ঠিক হবে না, দু'জনে যাই।

দু'জনেই গেল। যেখানে সন্ন্যাসী পড়ে গিয়েছিল, সেখানে একটি মৃত ঘোড়া ও একজন হাবসী সৈন্য পড়ে আছে, সন্ন্যাসী নেই। স্থান ভুল হয়েছে মনে করে চারিপাশে অনেকখানি জায়গা তারা সন্ধান করলো কিন্তু সেই প্রভাতী আলোয় সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

সরোজ বললো—আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

ডেভিড বললো - যে সময় বিনয়দা ও ডক্টর রায়কে নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম সেই অবসরে সরে পড়েছে। কিন্তু গুলি খেয়েও পালিয়ে গেল!

সরোজ বললে—গুলি লাগে নি হয়ত। আমাদের ঠকাবার জন্য গুলি লাগার ভাণ করে পড়ে গিয়েছিল। নাহলে কোন আহত লোক এতো তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারে না।

দু'জনে ফিরলো।

কিছুক্ষণ পরে বিনয়বাবু ও ডক্টর রায়ের জ্ঞান হ'লো।

চোখ মেলে সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা কে?

—আমরা সরোজ···ডেভিড···।

—সরোজ···ডেভিড···সরোজ···ডেভিড···সরোজ···ডেভিড···

জপমালার মত বিনয়বাবু কিছুক্ষণ নাম দুটি জপ করলেন। তারপর সহসা চমকে উঠলেন—ওঃ, বুঝেছি, সরোজ আর ডেভিড, না?

—হ্যাঁ।

—এ কোন জায়গা?

—আবিসিনিয়া।

—আবিসিনিয়া···আবিসিনিয়া···আবিসিনিয়া কোথায়?

– আফ্রিকায়।

—আফ্রিকায়? আমি আফ্রিকায় কেন?

—আপনাদের গুরুদেব আপনাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—আমাদের গুরুদেব? গুরু কে?

—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, যে আপনাদেরকে এখানে ধরে এনেছে।

—আমাদেরকে ধরে এনেছে, আর আমরা জানি না? তোমরা বাজে কথা বলছ।

সরোজ ও ডেভিডের মুখে হাসি খেলে গেল, বললে—যদি জানতেই পারবেন, তাহলে আর হিপ্‌নোটাইজ্ করবে কেন?

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ অবিশ্বাস ও বিস্ময়ে সরোজদের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর উঠে বসতে গিয়ে কাৎরে উঠলেন—উঃ!

—কি হলো—সরোজ ও ডেভিড একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো।

বিনয়বাবু হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, ডান পায়ে হাতে বুলাতে বুলাতে বললেন—বড় লেগেছে, পা-টায় বড় ব্যথা।

সরোজ দেখলো বিনয়বাবুর ডান পায়ে হাঁটুর নিচে খানিকটা কেটে গেছে। বেশ ফুলে উঠেছে। বললো—ও কিছু না, আমরা এখনি ওটা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।

ডেভিড বললো—কি দিয়ে বাঁধবে?

সরোজ বললো—সে ঠিক আছে, আয়েষার মাথায় যে রুমালখানি বাঁধা আছে ওইতেই হবে।

ডেভিড বিনয়বাবুর পা-খানি পরীক্ষা করলো। সরোজ আয়েষার কাছ থেকে রুমালখানি চেয়ে নিলে, কিন্তু বাঁধতে গিয়ে দেখা গেল রুমালখানি যথেষ্ট নয়। ডেভিড বললে—আরো কাপড় চাই।

—আমার জামা ছিঁড়ে দিচ্ছি।

—আফ্রিকার এই মশা মাছির দেশে, গায়ের ওই একমাত্র জামাটা ছিঁড়ে ফেলা কি ঠিক হবে?

—তাছাড়া আর উপায় কি?—বলে সরোজ জামা খুলতে যাচ্ছিল আয়েষার বিভ্রান্তি তখন আর নেই, সে বাধা দিয়ে বললো—না না, আপনাকে জামা ছিঁড়তে হবে না, এই নিন্ আমার আঙরাখাটা।

আয়েষা নার্সের 'এপ্রনটা' খুলে দিলে, তার পরণে তখনও পুরোদস্তুর সৈনিকের ইউনিফর্ম।

সেই আঙরাখাটি ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় পিছন থেকে আদেশ শোনা গেল—Hands up!

সকলে চমকে উঠলো। ফিরে দেখে সঙীন উঁচিয়ে গোটা দশ-বারো ইতালিয়ান তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সরোজ ও ডেভিড ইতস্ততঃ করছে।

আবার আদেশ হলো—হাত তোল!

সকলে মাথার উপর হাত তুললো।

ইতালিয়ান সৈনিকেরা এগিয়ে এসে তাদের বন্দুক কেড়ে নিলে। পূর্বদিকের আকাশ তখন সূর্যোদয়ের আভাসে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে।

ইতালিয়ান তাঁবুগুলির সামনের মাঠে সামরিক আদালত বসেছে।

ছ'জন ব্রিটিশ স্পাইয়ের বিচার হচ্ছে।

সামনে তিনজন ইতালিয়ান এলো, সরোজরা দেখেই চিনলো, ইনি সেই এড্‌জুটেণ্ট যার ছাউনি থেকে ক'দিন আগে তারা পালিয়ে এসেছিল। সাক্ষী হিসাবে এড্‌জুটেণ্ট বললে—এদের প্রত্যেককেই আমি চিনি। এরা বৃটিশ স্পাই। ক'দিন আগে ট্রেনে করে এরা আদ্দিস্-আবাবায় যাচ্ছিল তখন আমি এদের আটক করি। এরা বৃটিশ গুপ্তচর জানতে পেরে সামরিক আদালতে এদের গুলি করে মারার আদেশ দিই। সেই রাত্রে রক্ষীদের খুন করে এরা পালিয়ে যায়।

এড্‌জুটেণ্ট থামতেই সরোজ বললে—আমাদের নামে কি কথা উনি বললেন আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। আমরা কেউ ইতালিয়ান ভাষা জানি না, ইংরাজীতে আমাদের বিচার হোক।

সরোজের ইংরাজী কথা বিচারকদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারলো কি না কে জানে, তবে তাদের চোখের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠলো, রুদ্র হয়ে উঠলো

কুণ্ঠিত। তারপর বিচারকদের মধ্যে প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলে উঠলো—তোমাদের বিরুদ্ধে তিনদফা অভিযোগ—গুপ্তচরবৃত্তি, খুন, পলায়ন।

ডেভিড প্রতিবাদ করলো—মিথ্যা কথা, আমরা গুপ্তচর নই, আমরা খুন করি নি।

পাশের এক সৈনিক ডেভিডের পাঁজরে বন্দুকের নলের একটা খোঁচা দিয়ে চাপা গলায় গর্জে উঠলো—সাইলেণ্ট!

এবার এডজুটেণ্টের পানে তাকিয়ে বিচারক বলে উঠলো—তিনদফা অপরাধ: গুপ্তচর, খুনী, পলাতক?

এডজুটেণ্ট মাথা নেড়ে বললে,—ইযেস্ স্যার।

বিচারক প্রথম বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নাম?

—আমার নাম ডকটর জানি, আমি একজন হিন্দু ডাক্তার।

সরোজ ও ডেভিড চিনলো, ইনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

বিচারক বললে—হিন্দু, ইণ্ডিয়ান?

ডাক্তার জানি চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি বললো—না না, আমি হিন্দু—ইণ্ডিয়ান নই, আমি যীশুখৃস্ট—আমি আবিসিনিয়ার যীশু। তোমরা আমায় ক্রুশবিদ্ধ করবে বলে তোমাদের হাতে আমি ধরা দিয়েছি। পরম পিতার কাছে তোমাদের জন্য আমি কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের মুসোলিনী দীর্ঘায়ু হোন, তিনি যুগে যুগে নব নব রোম সাম্রাজ্য গড়ে তুলুন। রেডক্রশ সোসাইটীর উপর বোমা ফেলে, হাসপাতাল সুদ্ধ মুমূর্ষু ও আহতদের পুড়িয়ে মেরে, অসভ্য নির্বাহ কালা আদমিদের বিষ গ্যাসে হত্যা করে, তোমাদের ফ্যাসিস্ত বাহিনী অজেয় হয়ে উঠুক—দিকে দিকে রোমক সভ্যতা প্রচার করুক।

ডাক্তার জানির ইংরাজী কথা সবাই বুঝতে পারুক আর নাই পারুক বিচারক মণ্ডলী চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং পরস্পরের মুখের পানে তাকালো।

কয়েক লহমা চুপ করে থেকে ডাক্তার জানি বলে উঠলো—কই? তোমরা চুপ করে আছ কেন? আমার মৃত্যুদণ্ড দাও। এই সাজানো আদালতের সামনে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? কতক্ষণ আর এই বিচারের অভিনয় দেখবো? আমায় গুলি করে মারার আদেশ দাও!

কি ভেবে প্রথম বিচারক প্রশ্ন করলো—যদি তোমায় গুলি করে মারার আদেশ না দিই?

ডাক্তার জানি চমকে উঠলো, বক্তার মুখের পানে একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো, তারপরেই বলে উঠলো ঠিক কথা গুলি করে তো আমায় মারা হবে না, আমি যে যীশু! আমায় ক্রুশে বিঁধে মারবে তো? বেশ!

বিচারক-মণ্ডলী বুঝলো লোকটার মাথা বিকৃত হয়েছে।

প্রথম বিচারক বললে—তোমাকে আমরা মুক্তি দেব।

—মুক্তি? প্রাণভিক্ষা। নিষ্ঠুর ইতালিয়ান সেনার কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা নেব! যারা মুখোমুখি যুদ্ধ করতে ভয় পায়, নিরস্ত্র নগরবাসী, নিরীহ নর-নারী ও শিশুর উপর রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে বোমা মারে, বিষ-গ্যাস ফেলে—তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা! আমরা পাঞ্জাবী, আমরা বীরপুরুষের কাছে মাথা নোয়াই, কাপুরুষের কাছে—খুনীর কাছে আমরা প্রাণভিক্ষা চাই না। ন্যায়ের নামে, সত্যের নামে, ধর্মের নামে তোমাদের কাছ থেকে আমি কৈফিয়ৎ চাই। এমনভাবে হত্যা করার অধিকার তোমাদের কে দিলে? কামান, বোমা, এরোপ্লেন আর বিষগ্যাসই কি সব? মনুষ্যত্ব নেই? ভগবান নেই? একদিন তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না? শাদা আদমি বলে জগদীশ্বর কি তোমাদের রেহাই দেবেন? বল, আমার কথার জবাব দাও?

রাগে বিচারকদের চোখ লাল হয়ে উঠলো। প্রথম বিচারকটি এবার গর্জন করে উঠলো—তোমার জগদীশ্বর জাহান্নমে যাক্!

ডাক্তার জানি হা হা করে হেসে উঠলো, বললো—ভগবানকে ভুলে গেছ কম্যাণ্ডার? শয়তানের পূজো করছ—বেশ, বেশ!

বিচারক বললো—তোমার মত রাসকেলের হাসি কি করে থামাতে হয় আমি জানি।

—আমায় ভয় দেখাচ্ছ কম্যাণ্ডার? পাঞ্জাবীরা মরতে ভয় পায় না, আমরা ইতালিয়ান নই, হাঃ হাঃ—ডাক্তার জানি আরো জোরে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বিচারক একজন সৈনিককে ইসারা করলো, সে এগিয়ে এসে ডাক্তার জানিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ডাক্তার জানির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিনয়বাবু। বিচারক কম্যাণ্ডার এবার তাঁর পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো—তুমি ভারতীয়?

বিনয়বাবুর পাশে ছিল ডাক্তার রায়, তাঁকেও প্রশ্ন করা হলো—তুমিও ভারতীয়?

—হ্যাঁ।

তার পাশে সরোজ, ডেভিড ও আয়েষা—সকলকে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই উত্তর।

শুধু আয়েষার বেলা বিচারকদের মধ্যে একজন পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলো—এই পাঁচজন বন্দীর মধ্যে তোমার আপনার-লোক আছে?

—আছে, আমার দুই ভাই।

—কে কে?

আয়েষা সরোজ ও ডেভিডকে দেখিয়ে দিলে।

বিচারকটি অপর দু'জন বিচারককে কি বললো, তারা মৃদু মাথা নাড়লো। তারপর প্রথম বিচারক উঠে দাঁড়ালো, বন্দীদের পানে তাকিয়ে বললো—তোমাদের অপরাধ তিন দফা। প্রথমতঃ, তোমরা ইংরেজের গুপ্তচর, দ্বিতীয়তঃ,

তোমরা পলাতক আসামী। এর যে কোন একটা অপরাধের সাজা হচ্ছে মৃত্যু। তোমাদেরও আমি সেই মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করলাম। কাল সকালে তোমাদেরকে গুলি করে মারা হবে।

ফস্ করে সরোজ বলে ফেললো -মহামান্য ইতালিয়ান বিচারক, আপনার ন্যায়-বিচারের জন্য ধন্যবাদ!

সরোজ জানে সামরিক আদালতের এই বিচারের আড়ম্বর একটা অভিনয় মাত্র। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। মরতেই যখন হবে তখন কিসের ভয় ' ইতালিয়ানদের উপহাস করার লোভটুকু তাই সরোজ সামলাতে পারে নি।

সরোজের উপহাসে বিচারকের মুখ লাল হয়ে উঠলো। অন্য সময় হলে সে নিজেই লোকটিকে গুলি করে মারতো। এড্‌জুটেণ্টকে ডেকে সে কি আদেশ করলো। এড্‌জুটেণ্ট স্যালুট দিয়ে ফিরে গেল। তখনি বিউগিল বাজলো। এড্‌জুটেণ্টের আদেশে সরোজ, ডেভিড ও আয়েষাকে সৈনিকেরা একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। বিচারকদের সামনে মাঠের মাঝে বিনয়বাবু ডাক্তার রায় ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে হাঁটু পেতে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপরেই এড্‌জুটেণ্টের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আদেশ শোনা গেল—শ্রেণী, সার দাও—!

ক'জন সৈনিক এগিয়ে এসে এক সারিতে দাঁড়ালো।

—বন্দুক কাঁধে নাও!

—লক্ষ্য ঠিক রাখো!

কাঁধ থেকে নামিয়ে সৈনিকেরা বন্দুক ডান বাহুতে চেপে ধরলো, ট্রিগারে তর্জনী রেখে নলের মাছি তাগ্ করে ধরলো বিনয়বাবুদের দিকে।

আর একটি মুহূর্ত, তারপরেই সব শেষ। সরোজ ও ডেভিডের মাথার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। মনে হলো চোখের নিমেষে ওদের বন্দুকের সামনে থেকে বিনয়দা ও ডাক্তার রায়কে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। সরোজ ও ডেভিড লাফিয়ে উঠলো। দু'জন করে জোয়ান সৈনিক তাদের দুটো করে হাত ধরেছিল, সজোরে এক ঝট্‌কা মেরে তারা সরোজ ও ডেভিডকে ঠাণ্ডা করে দিল। ঠিক সেই সেকেণ্ডেই তাদের কানে বাজলো শেষ আদেশ—ফায়ার!

কট্ কট্ কট্ কট্ করে একসঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের ট্রিগার টেপার শব্দ হলো, ফট্ ফট্ ফট্ করে কয়েকটি গুলি ছুটে গেল। চোখের সামনে তিনটি সরল প্রাণবন্ত দেহ অবশ হয়ে ধুপ্ ধুপ্ করে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

আবার আদেশ শোনা গেল - শ্রেণী, পিছু ফেরো, ব্র-জেৎ!

সৈনিকের সারি পিছু ফিরলো। তারপর তাদের অনেকগুলি ভারী বুটের সমতালে পা ফেলার শব্দ কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

সরোজ ও ডেভিড স্তম্ভিত হয়ে নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মত তাকিয়ে রইল তিনটি গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহের পানে।

আয়েষার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, থর থর করে কেঁপে একটা আর্তনাদ করে উঠেই সে ঢলে পড়লো। সেই আর্তনাদে সরোজ ও ডেভিডের চমক ভাঙলো।

তিনটি পৃথক তাঁবুতে তিনজনকে রাখা হয়েছে। তিনজনেরই মাথার মধ্যে ঝড় বইছে। সরোজ এক সেকেণ্ড সুস্থির হতে পারছে না। যাদের জন্য এতো কষ্ট সহে এখানে আসা, তাদেরকেই বাঁচানো গেল না। চোখের উপর তাদের কোর্টমার্শাল হয়ে গেল, তারা কিছুই করতে পারলো না। এই না পারার দুঃখটাই সরোজের মনের মধ্যে আলোড়ন তুললো, মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। সে কিছুই ভাবতে পারছে না। খাঁচায় বদ্ধ বাঘের মত সে ছটফট করতে লাগলো। এককোণে বসে একটু সুস্থির হয়ে সব ঘটনাটি চিন্তা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সর্বাঙ্গে কিসের যেন একটা বেদনাবোধ, একটা জ্বালা তাকে চুপ করে বসে থাকতে দিলে না। উঠে পড়ে, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে, সে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে সুরু করলো।

ডেভিডের অবস্থাও সরোজের মতো। একা একা তাঁবুর মধ্যে সেও ছট্‌ফট্ করছে। বিনয়বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজ এই মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এক একটি দিনের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মাথার মধ্যে সব যেন তাল পাকিয়ে যাচ্ছে। সব অনুভূতিকে কে যেন আগুনে ঝল্‌সে একাকার করে দিচ্ছে।

আয়েষার নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে। তাঁবুর একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সে বসে আছে। মৃত্যুর বীভৎসতা তার মনের আকাশকে ঢেকে দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারের মতই তার মন ভয়ে আতঙ্কে আচ্ছন্ন, এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ঝাপ্‌টা সে আর সইতে পারছে না। কেন সে স্বজাতির মায়ায় স্বদেশের মোহে আরবী পিতার আশ্রয় ছেড়ে চলে এলো বেশ শান্তিতে ছিল সেখানে। পরস্পরকে খুনোখুনি করার এমন রক্তাক্ত রূপ কোনদিন চোখে পড়েনি। তার আজ মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বিনয়বাবুদের মতো তার দেহটাও গুলি খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। আয়েষা আর ভাবতে পারলো না। তার জীবনে এমন দুর্যোগের দিন এমন নিশ্চিত মৃত্যুর বারতা নিয়ে কখনও আসেনি।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। রাত প্রায় আটটা হবে। চাঁদের আলোয় ইতালিয়ান সেনাদের তাঁবুগুলি পিরামিডের মত দেখাচ্ছে। দু' একটি তাঁবুর মাথায় ইতালিয়ান পতাকা উড়ছে। তাঁবুর মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে হাসি ও হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। বাহিরে সব স্তব্ধ। এদিকে কালো কালো

মেসিনগান আর ট্যাঙ্কগুলির পানে তাকালে মনে হয়, হিংস্র একদল পশু যেন শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে আছে। ওদিকের মাঠে রূপালী প্লেনগুলি যেন এক-একটি বক পাখা মেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে চারিপাশের জীবন ঢাকা পড়ে গেছে, শুধু আকাশের গায় মিটমিটে তারাগুলি আর দূরে সোমালি প্রহরীদের চলমান ছায়া।

একটি তাঁবুর মধ্যে একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে একজন সেনানায়ক বসে আছে। বয়স কম। সৈনিকের নিষ্ঠুরতা তখনও সে মুখ কঠোর করে তোলেনি। সুপুরুষ, লম্বা চেহারা, বয়সের তুলনায় যেন বেশী জোয়ান মনে হয়। জয়ের আনন্দে তার মুখে হাসির আভাষ, মন উৎফুল্ল। সামনে একটা টেবিলের উপর লাল নীল দাগ দেওয়া একখানি বড় আবিসিনিয়ার ম্যাপ খোলা পড়ে আছে। নিবিষ্ট মনে সে সেইটি দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে বাইরের অন্ধকারের পানে, কখনও বা সামনে ঝুলানো হ্যারিকেন লণ্ঠনটির পানে, কখন বা তাঁবুর পর্দা-ঝুলানো দবজার পানে। কোন এক সময় মানচিত্রখানি টেবিলের উপর রেখে সে অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সৈনিক পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কুর্ণিশ করলো, তার সঙ্গে একটি মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখতে চমৎকার, সরস্বতী প্রতিমার মত লাবণ্যময়ী, ফুলের পাঁপড়ির মত কমনীয়, সকালের শিশিরের মত স্নিগ্ধ। পরণে তার সৈনিকের খাঁকি পোষাক। দেখলে মনে হয় যেন ফরাসী ইতিহাসের পাতায় দেখা 'জোয়ান-দ্য-আর্কের' ছবিখানি হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেনানায়ক মেয়েটির পানে তাকিয়ে বাতাসে মাথা ঠুকে বললে— গুড্ ইভ্নিং!

মেয়েটিও প্রতি-অভিবাদন করলো—গুড্ ইভ্নিং!

—আপনার নাম কি?

—আয়েষা দেবী।

—আপনি ভারতবাসী?

—আগে ভারতবাসী ছিলাম বটে, এখন আবিসিনিয়াবাসী।

—ভারতের লোকেরা যে দেখতে এত সুন্দর হয় তা আগে জানতাম না, শুনেছিলাম তারা কালা আদমি, অসভ্য!

—লোকের মুখে শোনা আর নিজের চোখে দেখা তো এক কথা নয়।

—খুব সত্যি কথা। কিন্তু আমি তো ভারতবাসী দেখেছি। যে সব ভারতীয় ছাত্র য়ুরোপে পড়তে আসে তারা ধনীর ছেলে, সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছু সভ্য হয়। নাহলে শুনেছি শতকরা পঁচানব্বই জন ভারতবাসী অশিক্ষিত, ভাল করে কাপড়টা পর্যন্ত পরতে জানে না। জার্মানির এক সার্কাসওয়ালা ক'জন ভারতীয়কে এনে ইউরোপে দেখিয়েছিল: কালো, সারা দেহ নগ্ন, অসভ্যের মত ছোট একটুকরো কাপড় পরে আছে। জানোয়ারের

মত মাটির উপরেই ভাত খায়!* তোমাদের গান্ধীজীও তো শুনি ছঁইহাত কাপড় পরেন।

আয়েষা সোমালী আরবের ঘরে মানুষ, ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সে জানতো না, তথাপি ভারতের প্রতি তার মনের টান ছিল জন্মগত। বললো—গান্ধীজী ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে কোন বিদেশীর মুখ থেকে কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমার দেশকে আমার চেয়ে ভাল করে তো কোন বাইরের লোক জানে না। ও-সব কথা রেখে আপনি আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই বলুন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল, আসল কথাই বলি, তুমি বস—বলে সেনানায়ক পাশের একখানি ডেক-চেয়ার আয়েষার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—তুমি আমায় চিনতে পারছ? আজ সকালে তোমাদের যে কোর্টমার্শাল হলো, আমি তার একজন জজ ছিলাম। আমার নাম জান?—লেফটেন্যাণ্ট লিওনার্ডো। একটু বসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

আয়েষা বসলো না।

লিওনার্ডো মৃদু হেসে বললে—তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে, তুমি সৈনিক হলে লেফটেন্যাণ্টের আদেশ অমান্য করার কি সাজা হতো জান? তোমার সৌভাগ্য তুমি আমাদের সৈন্য নও। বসো—।

—না।

—আমার সামনে বসতে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে? তা হবারই কথা, যে নিষ্ঠুরভাবে এখানে আমরা মানুষ খুন করে চলেছি, তাতে কেউ আমাদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো নিজের ইচ্ছায় এ কাজ করিনি, আমাদের হুকুম মেনে চলতে হয়েছে। এই যে এত লোকের উপর বিষ-গ্যাস আর বোমা ফেললাম, মেশিনগান চালালাম, এদের কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া ছিল না, কাউকে আমরা চিনতাম না, জানতাম না, এরা কোনদিন আমাদের কোন ক্ষতি করেনি, অথচ এদের আমরা খুন করলাম। ওদের আর্তনাদ আমার কানে বাজছে,...বলে তরুণ লেফটেন্যাণ্ট তাঁবুর জানালা দিয়ে সুদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের পানে তাকালো। তার মনের কোণায় তখনও সৈনিকের নির্মমতা পুরোদস্তুর উপচে ওঠেনি, মনুষ্যত্বের দুর্বলতা মাঝে মাঝে সে মনকে চঞ্চল করে তোলে।

---

* বিদেশে ভারতীয়দের হীন ও অসভ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য জার্মানির হেগেনবেক্ সার্কাস অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে কয়েকজন গরীব সাঁওতালকে খাঁচায় পুরে রেখে দর্শকদের দেখাত। তাদের গায়ে পরার জামা দিত না, খাবার জন্য থালা দিত না। নিরুপায় হয়ে বেচারাদের সব সইতে হত। শেষে তা নিয়ে এদেশে আন্দোলন সুরু হলে তবে সেই প্রদর্শনী বন্ধ হয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লিওনার্ডো বললো—আজ কোর্টমার্শালে তোমাদের সকলের প্রাণদণ্ড হয়েছে।

আয়েষা বললো—জানি।

—কাল সকালেই তোমাদের তিনজনকে গুলি করে মারা হবে।

—জানি।

—কমাণ্ডারের কাছ থেকে আমি তোমার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।

—কেন?

—তোমায় দেখেই আমার বড় ভাল লাগলো। মনে হলো যেন এই অসভ্য কালো হাবসী দৈত্যগুলোকে মেরে এই তেপান্তরের মাঠে আমি এক রাজকন্যার দেখা পেলাম। তাই তোমাকে আমি মরতে দিইনি। তোমায় আমি রাণীর সিংহাসনে বসাবো।

আয়েষার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো, ক্ষণেকের জন্য তার ভ্রু-দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, কিন্তু তখনি সে ভাব গোপন করে হেসে উঠলো, বললো—রাণী যে হবো, রাজ্য কই?

—রাজ্যের ভাবনা? আবিসিনিয়া আমরা জয় করেছি। সম্রাট হেইলে-সেলাসী যুদ্ধে হেরে, ইংরেজদের জাহাজ 'এণ্টার প্রাইজে' চড়ে পালিয়ে গেছে, এখানে আমাদেরই এখন জয়জয়কার। জেনারেল দেল্‌বানো হবেন এদেশের সর্বময় কর্তা, একটি প্রদেশের শাসনভার থাকবে আমারই উপর—রাণীর রাজত্বের অভাব হবে না।

আয়েষা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো, বললো—বেশ হবে তাহলে, বেশ হবে! আমি তখন যা বলবো, তাই সবাই শুনবে তো?

—নিশ্চয়ই!

সহসা বিষণ্ণ সুরে আয়েষা বললো—আমি তো রাণী হব, আর আমার দুটি ভাই কাল সকালে তোমাদের হাতে খুন হবে?

—বন্দী লোক দুটি তোমার ভাই!

—হ্যাঁ,—বলে আয়েষা লেফ্‌টেন্যাণ্টের একটি হাত ধরে বললো—আচ্ছা, তুমি কি তাদের বাঁচাতে পার না?

—কমাণ্ডারকে একবার বলে দেখতে পারি, তবে তিনি কি আর আমার কথা রাখবেন? একবার তোমার জন্য বলেছি, আবার এখন তাদের জন্য··· দেখি, কাল ভোরে একবার দেখা করবো।

—এখন দেখা হয় না?

—একটু আগেই প্লেন নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন তা জানি না।

—যদি কাল তিনি তাদের ক্ষমা না করেন,—বলে আয়েষা চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—আচ্ছা, এখন একবার তাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি না,—যদি আর দেখা না হয়!

—নিশ্চয়ই। এখনি আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,—বলে লেফ্‌টেন্যান্ট ডাকলো—আরদালি—!

আরদালি ভিতরে এসে সেলাম দিল।

লেফ্‌টেন্যান্ট বললো—কাল সকালে যাদের কোর্টমার্শাল হবে তাদের তাঁবুতে একে নিয়ে যাও।

বাধা দিয়ে আয়েষা বললো—আরদালি নয়, তুমি চল।

অল্‌রাইট,—বলে আয়েষার হাত ধরে লেফ্‌টেন্যান্ট তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো।

সরোজ ও ডেভিডের চোখে ঘুম নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর আগের রাত্রে ঘুমানো শক্ত। নানা চিন্তা তাদের মনকে বিভ্রান্ত করে ফেলছে। তারা শান্তি পাচ্ছে না।

পাশাপাশি দুটি তাঁবুতে দু'জনে আছে, তবু কথা বলার এতটুকু সুবিধা নেই।

লেফ্‌টেন্যান্ট বন্দী-শিবিরের সামনে আসতেই সান্ত্রী স্যালুট করলো, লেফ্‌টেন্যান্ট বললো—এই দুটি তাঁবুতে তোমার দুই ভাই বন্দী আছে।

—বেশ তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি দেখা করে আসি—বলে আয়েষা তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো।

অন্ধকার তাঁবুর এক কোণে সরোজ বসেছিল, আয়েষা ভিতরে ঢুকতেই চমকে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—আমি।

—আমি কে?

—আমি আয়েষা।

—আয়েষা এখানে এলো কেমন করে?

—এসেছি তোমাকে মুক্তি দিতে।

—তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

সরোজ তীক্ষ্ণচোখে আয়েষার মুখের পানে তাকালো, অন্ধকারে সে মুখখানি ভাল করে চেনার চেষ্টা করলো।

আয়েষা বললো—পালাতে চাও? বাঁচতে চাও?

এতক্ষণে সরোজ যেন সচেতন হলো, বললো—নিশ্চয়ই। কি করতে হবে বল?

—পাশের তাঁবুতে ডেভিড আছে, তাকে নিয়ে আমার পিছু পিছু এসো।

—এই অবস্থায়?—বলে সরোজ হাতকড়ি লাগানো দুটি হাত আয়েষার সামনে তুলে ধরলো।

—ওঃ, হাতে হাতকড়ি লাগানো আছে, আচ্ছা, আমি এখনি খুলে দিচ্ছি,—বলে আয়েষা বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট সামনে পায়চারী করছিল, জিজ্ঞাসা করলো—দেখা হলো ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে লেফ্‌টেন্যাণ্ট !

—কী ?

—আমার ভাইয়ের বড় কষ্ট হচ্ছে, হাতকড়ির চাবিটা একবার দাও ওদের হাতকড়িটা খুলে দিয়ে আসি।

—তারপর যদি পালিয়ে যায় ?

—আমি তো আছি। তাছাড়া তোমাদের এত সিপাইসান্ত্রী......

লেফ্‌টেন্যাণ্ট হেসে সান্ত্রীকে আদেশ করলো—হাতকড়ির চাবিটা এঁকে দাও।

রক্ষীর হাত থেকে চাবি নিয়ে আয়েষা আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। সরোজের হাতের হাতকড়িটা খুলে দিয়ে বললো—তাঁবুর পিছন দিকে কোন পাহারা নেই। পিছন দিকের পর্দা তুলে চুপি চুপি বেরিয়ে, পাশে ডেভিডের তাঁবুতে যাবে, তার হাতকড়ি আমি খুলে দিতে যাচ্ছি। দু'জনে নিঃশব্দে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমার অনুসরণ করবে, নাও বেরিয়ে পড়—বলে আয়েষা চাবিটা হাতে নিয়ে সরোজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাশে ডেভিডের তাঁবুতে ঢুকলো।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আয়েষা ডেভিডের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। চাবিটি রক্ষীকে ফেরৎ দিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্টের সঙ্গে অগ্রসর হলো। সামনের মাঠে কয়েকটি বোমারু প্লেন রয়েছে। দু'দিক থেকে দুটি বড় বড় ফ্ল্যাশ্‌ লাইট্‌ সেই মাঠকে আলোয় আলো করে রেখেছে। অ্যালুমিনিয়ামের প্লেনগুলির রূপালী দেহে আলো পড়ে ঝিলমিল করছে।

দু'জনে চুপ করে এগোচ্ছিল, আয়েষা কথা সুরু করলে—আচ্ছা, লেফ্‌টেন্যাণ্ট, যদি হাব্‌সীরা আজ রাত্তিরে তোমাদের আক্রমণ করে, কি করবে ?

—তারা তো সব হেরে পালিয়ে গেছে, আবার আক্রমণ করবে কি ?

-যদি আক্রমণ করে, কি করবে ?

—লড়বো। যতক্ষণ রাইফেল হাতে আছে ততক্ষণ কোন ভয় করি না।

আয়েষার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—লেফ্‌টেন্যাণ্ট, তুমি ভাল গুলি চালাতে পার ?

—নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা, এখান থেকে এক গুলিতে ওই ফ্ল্যাশ্‌ লাইটের কাঁচটা ভেঙে দিতে পার ?

—ওঃ, এই কথা ! আমাদের দেশে একটা দশ বছরের ইস্কুলের ছেলেও ওই লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।

—আচ্ছা কর না দেখি ?

—বেশ—বলে হাসতে হাসতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট রাইফেল্‌ বাগিয়ে ধরে, একটি ফ্লাশ্‌ লাইট্‌ লক্ষ্য করে গ্‌লি ছ্‌ড়লো। লাইট্‌টা বেশী দ্‌রে ছিল না। লেফ্‌টেন্যাণ্টের গ্‌লি লেগে তার কাঁচখানা ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভেঙে গেল, সে দিকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

দ্‌'জন সৈনিক ছ্‌টে এলো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাহা করে হেসে উঠে বললো—যাও, নতুন লাইট্‌ বসাওগে।

সৈনিকেরা স্যাল্‌ট দিয়ে চলে গেল।

আয়েষা বললো লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ওই লাইট্‌টাকেও ভেঙে ফেল দিকি, সমস্ত মাঠটা অন্ধকার হয়ে যাবে—ভারী মজা হবে।

—কিন্তু...

—কিন্তু কেন? নতুন লাইট্‌ তো ওরা এখনি আবার বসাবে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট আবার রাইফেল তুলে নিলে। এই ফ্ল্যাশ-লাইট্‌টি ছিল দ্‌রে। টি্‌গার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে সেটিও ভাঙলো—চারিদিক অন্ধকার। সৈনিকদের মধ্যে সোরগোল উঠলো। আয়েষা খিল্‌খিল করে হেসে উঠলো, লেফ্‌টেন্যাণ্টও সে হাসিতে যোগ দিলে।

হাসি থামিয়ে আয়েষা পিছনে তাকালো, চাঁদের আলোয় গাছের আড়ালে দ্‌টি ছায়াম্‌র্তি দেখা গেল। সেদিকে একবার তীক্ষ্‌দ্‌ষ্টিতে তাকিয়ে আয়েষা লেফ্‌টেন্যাণ্টের হাত ধরে আব্দারের সুরে বললে—লেফ্‌টেন্যাণ্ট, এবার আমি একটা গ্‌লি ছ্‌ড়বো।

—দাঁড়াও, তাহলে একটা গ্‌লি এতে ভরে দিই,—বলে লেফ্‌টেন্যাণ্ট একটি গ্‌লি ভরে রাইফেলটি আয়েষার হাতে দিলে। আয়েষা একবার কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে, চোখের নিমেষে মাটির উপর শ্‌য়ে পড়ে, লেফ্‌টেন্যাণ্টের দিকে বন্দ্‌কের নল ফিরিয়ে ট্রিগার টিপলো। গ্‌লি খেয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ধপাস্‌ করে পড়ে গেল, ম্‌খ দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বের্‌লো না।

আয়েষার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠলো, সে আর এক সেকেণ্ড সেখানে দাঁড়ালো না। পিছনে যে দ্‌টি ছায়াম্‌র্তি দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে ছ্‌টলো।

ছায়াম্‌র্তি দ্‌টি—সরোজ ও ডেভিড। আয়েষার কথামত অন্ধকারে তারা পিছ্‌পিছ্‌ আস্‌ছিল। আয়েষা তাদের কাছে এসে বললো—আর এক মিনিট দেরী করা চলবে না, ছ্‌টে এসো।

তিনজনে ছ্‌টলো।

তাঁব্‌গ্‌লিকে পিছনে ফেলে তারা এসে পড়লো প্লেনগ্‌লির কাছে। ক'জন সেনা ভাঙা লাইট দ্‌টিকে মেরামত করতে ব্যস্ত। চারিপাশের অন্ধকারে চাঁদের আলোটুকুই একমাত্র সম্বল। সেই আলোছায়ার মধ্যে তারা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলো একখানি প্লেনের দিকে।

ওদিকে প্রহরীর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল—কে যায় ওখানে?

আয়েষা উত্তর দিলে—বন্ধু! তারপর সরোজ ও ডেভিডকে লক্ষ্য করে বললে—শীগ্‌গীর একখানা প্লেনে উঠে পড়, নাহলে এখনি প্রাণ হারাতে হবে।

রক্ষী জিজ্ঞাসা করলো—কী চাই?

—প্লেন।

—হুকুম-নামা?

—সঙ্গে আছে।

—দিয়ে যাও।

—নিয়ে যাও।

ব্যাপার ভাল মনে না হওয়ায়, রক্ষী সরোজদের দিকে অগ্রসর হলো।

আয়েষা ততক্ষণে ডেভিডের হাত ধরে একখানি প্লেনের মধ্যে উঠে বসেছে। রক্ষী কাছে এসে পড়ার আগেই সরোজ সজোরে প্রপেলারটি ঘুরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো। ঘস্‌ঘস্‌ করে গর্জন তুলে বোঁ করে সামনের মাঠে খানিকটা ছুটে গিয়েই প্লেনখানি লাফিয়ে উঠলো শূন্যে।

প্রহরী চীৎকার করে উঠলো। নিচে সোরগোল পড়ে গেল।

তির্যক গতিতে সন্ধানী-আলো এসে পড়লো প্লেনখানির উপরে। শট্‌শট্‌ করে কয়েকটি গুলি ছুটে গেল এদিক ওদিকে দু-একটি এসে প্লেনের পাখায় ফুটো করে দিলে। ডেভিড সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করলো. স্পিডোমিটারের লাল কাঁটাটা থর থর করে কেঁপে উঠলো —পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর—আশী—নব্বুই—একশো—একশো দশ—বিশ—পঁচিশ—পঞ্চাশ—দুশো—

সার্চলাইটের আলো পিছনে কোথায় ফুরিয়ে গেল, ইতালিয়ান সেনার ছাউনি নিচে কতদূরে পড়ে রইল. চাঁদের আলোয় রূপালী পাখা মেলে সরোজদের প্লেন ছুটলো।

পিছনে দুটি ফড়িংয়ের মত দুখানি ইতালিয়ান প্লেন দেখা গেল। আত্মগোপন করার জন্য ডেভিড পেঁজা তুলার মত একখানি শাদা মেঘের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, প্লেনের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে।

মেঘ পার হয়ে যখন আবার তারা মুক্ত আকাশে এসে পড়লো, চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। পিছনের অনুসরণকারী প্লেন দুখানি আর দেখা যায় না, অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। নীচের অন্ধকার মাটির বুকে জমাট বেঁধেছে উপরের অন্ধকারে একরাশ তারা মিট্‌মিট্‌ করে হাস্‌ছে। যেন এক বিরাট অন্ধকার-দৈত্য রাহুর মত পৃথিবীকে গ্রাস করে বসে আছে। চারিপাশে শুধু অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের মত সরোজদের প্লেন ছুটে চলেছে তীব্র বেগে নিরুদ্দেশের সন্ধানে—ইতালিয়ান সীমান্ত পার হয়ে যাবার জন্য। তিনজন যাত্রীর কানে এসে লাগছে প্রপেলারের বনবন শব্দ, গায়ে লাগছে বাতাসের ঝড়ো ঝাপ্‌টা, দুর দুর করে বুক কাঁপছে মুক্তির আনন্দে।